বিজ্ঞান

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

অনুসন্ধানী পাঠ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিজয় উল্লাস : ১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক মা-বোনের ত্যাগ এবং ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বিজ্ঞান | অনুসন্ধানী পাঠ

দাখিল
অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান
রনি বসাক
ড. তাহমিনা ইসলাম
মোঃ ইশহাদ সাদেক
সাইফা সুলতানা
নাসরীন সুলতানা মিতু
শিহাব শাহরিয়ার নির্ঝর
মোঃ রোকনুজ্জামান শিকদার
ড. মানস কান্তি বিশ্বাস
মোঃ মাহমুদ হোসেন
ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ
নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ
সব্যসাচী চাকমা
মেহেদী হক

প্রচ্ছদ
মেহেদী হক

গ্রাফিক্স ডিজাইন
নাসরীন সুলতানা মিতু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১ : গতির কথা	০১
অধ্যায় ২ : শক্তি	১৬
অধ্যায় ৩ : পরমাণুর গঠন	২৬
অধ্যায় ৪ : কোষ বিভাজন ও তার রকমভেদ	৩৯
অধ্যায় ৫ : উদ্ভিদের কোষ, টিস্যু ও তাদের বিশেষত্ব	৫২
অধ্যায় ৬ : তরঙ্গ ও শব্দ	৬৫
অধ্যায় ৭ : সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ	৭৬
অধ্যায় ৮ : রাসায়নিক বিক্রিয়া	৮৮

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৯ : অম্ল, ক্ষার ও লবণ ১০০

অধ্যায় ১০ : জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি ১০৮

অধ্যায় ১১ : ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ ১২৯

অধ্যায় ১২ : চুম্বক ১৪৪

অধ্যায় ১৩ : মানবদেহের অঙ্গ ও তন্ত্র ১৫৪

অধ্যায় ১৪ : দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের ব্যবহার ১৬৪

অধ্যায় ১৫ : নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ ১৭৫

অধ্যায় ১৬ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ১৮৬

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই? অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের স্বাগতম!

দেখতেই পাচ্ছ, এতদিন তোমরা যেভাবে পড়াশোনা করে এসেছ, তাতে একটা বড়ো পরিবর্তন এসেছে! তোমাদের সকল বিষয়ের বইগুলোও তাই এখন একটু অন্যরকম। এই বছরে বিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দুইটি বই হাতে পেয়েছ! এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বইটির সঙ্গে তোমাদের আরেকটা 'অনুশীলন বই'ও দেওয়া হয়েছে। এই অনুসন্ধানী পাঠ বইটির সঙ্গে অনুশীলন বইয়ের বড়ো ধরনের পার্থক্য রয়েছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, নতুন নতুন কিছু সমস্যার সমাধান করবে। এই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো আর সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো সব বিস্তারিতভাবে তোমাদের অনুশীলন বইটিতে দেওয়া আছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে নানা ধাপে তোমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার প্রয়োজন পড়বে, সেজন্য তোমাদের সাহায্য করবে এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বই। স্কুলে বা বাড়িতে, যখন যেখানেই থাকো, তোমরা এই বইটির সাহায্য নিয়ে দরকার হলে নিজে নিজেই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবে!

অষ্টম শ্রেণিতে তোমাদের বিজ্ঞানের যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হবে সেগুলো এই বইয়ে মোট ষোলটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা যে অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর দিয়ে যাবে, তাতে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে তোমাদের কাজে আসবে।

তাহলে শুরু করা যাক, কী বলো?

অধ্যায় ১

গতির কথা

অধ্যায় ১ গতির কথা

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ সরণের ধারণা
- ☑ বেগের ধারণা
- ☑ ত্বরণের ধারণা
- ☑ সরল ও বক্র রেখায় গতি
- ☑ গতির সমীকরণ
- ☑ গতির লেখচিত্র

1.1 দূরত্ব ও সরণ (Distance and Displacement) :

কোনো বস্তুর গতি বলতে আমরা সময়ের সাথে বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন বুঝিয়ে থাকি। নানাভাবে অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে—দ্রুত কিংবা ধীর, সরল অথবা বক্র, সম বা অসম ইত্যাদি। গতি যেরকমই হয়ে থাকুক, সেটি ব্যাখ্যা করতে হলে সময়ের সঙ্গে আমাদের বস্তুটির অবস্থান (position) সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করতে হয়। সেটি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি স্থির বিন্দুর, যার সাপেক্ষে আমরা অবস্থান পরিমাপ করব। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ প্রকৃত স্থিরবিন্দু পাওয়া সহজ নয়, পৃথিবীতে একটি বিন্দুকে আমরা স্থির ধরে নিতে পারি কিন্তু পৃথিবীটা শুধু যে নিজের অক্ষে ঘুরছে তা নয়, সেটি সূর্যকে ঘিরেও ঘুরছে। আমাদের পুরো সৌরজগৎ আবার আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র ঘিরে ঘুরছে এবং পুরো গ্যালাক্সিটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের কারণে ছুটে চলছে। তবে আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য আমরা আমাদের আশপাশের কোনো একটি বিন্দুকে স্থির ধরে নিয়ে তার সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান পরিমাপ করতে পারি। এই বিন্দুটিকে বলা হয় প্রসঙ্গ বিন্দু, এবং এই প্রসঙ্গ বিন্দুটি যে কাঠামোর অংশ তাকে বলা হয় প্রসঙ্গ কাঠামো। শুধু তাই নয় প্রয়োজনে আমরা চলমান একটি কাঠামোকেও প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তোমরা নবম শ্রেণিতে আপেক্ষিক সূত্র পড়ার সময় সেটি দেখতে পাবে।

প্রসঙ্গ বিন্দু নির্দিষ্ট করা হলে আমরা তার সাপেক্ষে একটি বস্তুর অবস্থান পরিমাপ করতে পারব। ধরা যাক একটা মাঠে একটা খুঁটির সঙ্গে একটা ছাগল বেঁধে রাখা আছে, এখানে খুঁটিটি হচ্ছে প্রসঙ্গ বিন্দু। যদি বলা হয় ছাগলটি খুঁটি থেকে দুই মিটার দূরে বসে আছে তাহলে কিন্তু ছাগলটি ঠিক কোথায় আছে তুমি বলতে পারবে না। কারণ ছাগলটি খুঁটি থেকে দুই মিটার দূরে যে কোনো দিকে থাকতে পারে! যদি

বলা হয় ছাগলটি খুঁটি থেকে দক্ষিণ দিকে দুই মিটার দূরে বসে আছে তাহলে প্রসঙ্গ বিন্দুর সাপেক্ষে ছাগলটি কোথায় আছে তুমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবে। অর্থাৎ একটি বস্তুর অবস্থান জানতে হলে বস্তুটি প্রসঙ্গ বিন্দুর সাপেক্ষে একই সঙ্গে কোন 'দিকে' এবং কত 'দূরে' আছে দুটিই জানতে হবে।

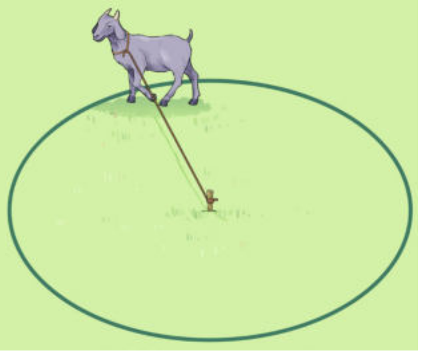

ছাগলের অবস্থান জানতে হলে প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে সেটির দূরত্ব ও দিক দুটিই জানতে হবে।

একটি বস্তুর গতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বস্তুর অবস্থান ছাড়াও দূরত্ব (Distance) ও সরণ (Displacement) এই দুটি রাশি বলতে কী বোঝানো হয় সেটি বুঝতে হবে। চলমান বস্তুর বেলায় একটি বস্তু যেটুকু জায়গা অতিক্রম করে তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ হচ্ছে দূরত্ব। সেটি সরল রেখায় হতে পারে আবার আঁকাবাঁকাও হতে পারে। দূরত্বের একটা পরিমাণ আছে কিন্তু কোনো দিক নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞানের ভাষায় সরণ হচ্ছে একটি বস্তু আগের অবস্থান থেকে নতুন অবস্থানে মোট কতটুকু সরে গেছে তার পরিমাপ। তুমি যদি উত্তর দিকে 10 কিলোমিটার গিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে 5 কিলোমিটার ফিরে আস তাহলে সব মিলিয়ে তুমি 15 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছ কিন্তু তোমার সরণ হয়েছে উত্তর দিকে মাত্র 5 কিলোমিটার। সরণের বেলায় সব সময় দিক নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। নিচের ছবিতে কয়েকটা দূরত্ব এবং সেই একই দূরত্বে জন্য সরণের পরিমাপের উদাহরণ দেওয়া হলো।

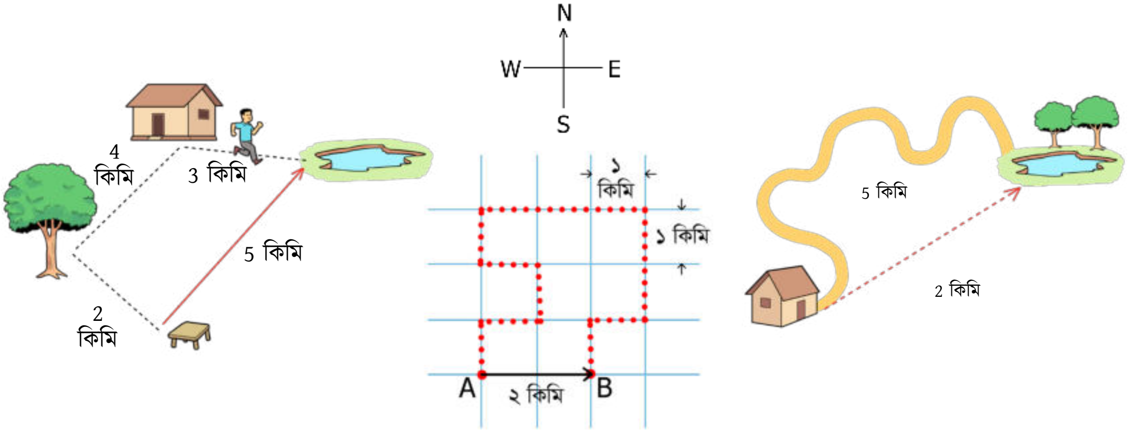

(a) বাম দিকের ছবিতে একটি ছেলে তার শুরুর অবস্থান থেকে রওনা দিয়ে 2 কিমি হেঁটে একটি গাছের কাছে গিয়ে দিক পরিবর্তন করে 4 কিমি হেঁটে একটি ঘরের কাছে গিয়েছে। সেখানে আবার দিক পরিবর্তন করে 3 কিমি হেঁটে একটি জলাশয়ের কাছে গিয়েছে। সব মিলিয়ে সে (2 + 4 + 3 =) 9 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। তার শুরুর অবস্থান থেকে জলাশয়ের সরণ তীর চিহ্নিত দিকে 5 কিমি। (b) এই ছবিটিতে একটি শহরের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম বরাবর উভয় দিকে 1 কিমি দূরে দূরে অবস্থিত সমান্তরাল রাস্তা দেখানো হয়েছে। একজন সেই রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে A থেকে B আসতে 12 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করেছে, সরণ হয়েছে পূর্ব দিকে 2 কিমি। (c) বাসা থেকে জলাশয়ের পথের দূরত্ব 5 কিমি। সরণ তীর চিহ্নিত দিকে 2 কিমি।

ভাবনার খোরাক : সরণের পরিমাণ হচ্ছে দূরত্ব, কথাটি সঠিক না ভুল? কথাটির পক্ষে, না হয় বিপক্ষে উদাহরণ দাও।

1.2 দ্রুতি ও বেগ (Speed and Velocity)

তোমার আশপাশে তাকালেই দেখবে পথে-ঘাটে গাড়ি, বাস, সাইকেল কিংবা পথচারী চলছে। সবাই কিন্তু একইভাবে চলছে না, কেউ অনেক দ্রুত, কেউ একটু ধীরে, যেটি বোঝানোর জন্য আমরা বলে থাকি কারও বেগ বেশি কিংবা কারও বেগ কম। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় বেগ কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে এবং বেগ ছাড়া দ্রুতি নামেও একটি রাশি রয়েছে। প্রথমে দ্রুতি বলতে কী বোঝানো হয় সেটি বলা যাক। আমরা এইমাত্র দূরত্ব এবং সরণ এই দুটি রাশির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে দ্রুতি। অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি t সময়ে d দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তার দ্রুতি হচ্ছে :

$$v=d/t$$

যেহেতু দূরত্বের কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই তাই দ্রুতিরও কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, শুধু পরিমাণ আছে।

» একটি বস্তু কতটুকু জায়গা অতিক্রম করল, তাকে বলে 'দূরত্ব'। দূরত্ব মাপতে আমরা ব্যবহার করি ইঞ্চি, ফুট, সেন্টিমিটার, মিটার ইত্যাদি।

» একটি বস্তু কোন দিকে কতদূর গেল, তাকে বলে 'সরণ'। সরণ বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি, উত্তর দিকে দুই কিলোমিটার, ডানদিকে পাঁচ ফুট, ওপরদিকে তিন সেন্টিমিটার, সামনের দিকে সাত মিটার ইত্যাদি।

উদাহরণ : আমাদের আগের ছবিতে দেওয়া উদাহরণে দূরত্বগুলো অতিক্রম করতে কত সময় লেগেছে সেটি বলা হয়নি। যদি ধরে নেওয়া যায় (a), (b) এবং (c) দূরত্ব অতিক্রম করতে যথাক্রমে 2 ঘণ্টা, 30 মিনিট এবং 1 ঘণ্টা সময় লেগেছে তাহলে কোনটির জন্য দ্রুতি কত হয়েছে?

উত্তর : (a) 2 ঘণ্টা সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব 9 km, কাজেই দ্রুতি :

$$v = \frac{9\ km}{2\ hour} = 4.5\ km/h$$

(b) 30 মিনিট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব 12 km, কাজেই দ্রুতি :

$$v = \frac{12\ km}{30\ minutes} = \frac{12\ km}{0.5\ hour} = 24\ km/h$$

(c) 1 ঘণ্টা সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব 5 km, কাজেই দ্রুতি : 5 km/h

তোমরা দেখতেই পারছ কোনো বস্তুর দ্রুতি বের করার সময় আমরা সেটা কোনদিকে যাচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে এই দ্রুতিটি হচ্ছে পুরো সময়ের একটি গড় দ্রুতি, আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিক দ্রুতি জানি না। বিশেষ অবস্থায় বস্তুটি যদি সম-দ্রুতিতে যায় শুধু তাহলে তার গড় দ্রুতির পরিমাণ আর তাৎক্ষণিক দ্রুতির মান সমান হবে।

আমরা যদি দ্রুতির ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝে থাকি তাহলে এবারে খুব সহজেই বেগ বলতে কী বোঝায় সেটি বুঝে যাব। একটা চলন্ত বস্তুর দ্রুতির সাথে সঙ্গে সঙ্গে যদি তার দিকটাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বলে বেগ। অর্থাৎ 'একটি নির্দিষ্ট দিকে' একক সময়ে একটা বস্তু যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে তার বেগ। কাজেই কোনো কিছুর বেগ বের করতে হলে তার পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে দিকটাও বের করে নিতে হয়। যদি আমরা শুধু সরল রেখায় গতি নিয়ে মাথা ঘামাই তাহলে বেগ আর দ্রুতির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, তখন বেগের পরিমাণটাকে আমরা বলব দ্রুতি।

মনে রেখ দ্রুতির বেলায় যেরকম বলেছিলাম, আমরা যদি অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করে যে দ্রুতি বের করি সেটা হচ্ছে ঐ সময়ের গড় দ্রুতি, বেগের বেলাতেও সেটা সত্যি। আমরা যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে ধাবমান একটি বস্তুর সরণকে সময় দিয়ে বেগ বের করি তাহলে আমরা কিন্তু বস্তুটির তাৎক্ষণিক বেগ বের করি না, আমরা তার ওই সময়ের গড় বেগ বের করি। শুধু বস্তুটি যদি সমবেগে যায় তাহলে তার তাৎক্ষণিক বেগ আর গড় বেগের মান সমান হবে।

মনে রেখো কোন বস্তু যখন গতিশীল অবস্থায় দিক পরিবর্তন করে তখন তার গড় নেওয়া হলে সেটির পরিমাণ আমাদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দিতে পারে। ধরা যাক একটি বস্তু চলমান থেকে যেখান থেকে শুরু করেছিল ঠিক সেখানে ফিরে এসেছে, তাহলে বস্তুটির মোট সরণের মান শূন্য। কাজেই মোট সরণকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করে গড় বেগ বের করা হলে তার পরিমাণ হবে শূন্য, যদিও চলমান অবস্থায় বস্তুটির বেগ কখনোই শূন্য ছিল না!

2.3 ত্বরণ ও মন্দন (Acceleration and Deceleration)

তোমরা তোমাদের চারপাশে অনেক ধরনের গতি দেখেছ, কোনটা সোজা যাচ্ছে, কোনটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, কোনটা বৃত্তাকারে ঘুরছে আবার কোনটা সামনে পিছনে কিংবা উপরে নিচে দুলছে। আপাতত এদের ভেতরে সবচেয়ে সহজ যে গতি—যেখানে কিছু একটা সরল রেখায় যাচ্ছে—আমরা তার মাঝে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ এই সরল রেখার গতিতে দ্রুতি আর বেগের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, এবং যেহেতু সরল রেখায় যাচ্ছে তাই দিকটিও একেবারে সুনির্দিষ্ট, সেজন্য আমরা যখন বেগের কথা বলব তখন আলাদাভাবে আর আমাদের বেগের দিকটি উল্লেখ করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

গতিশীল বস্তুর বেগ বেড়ে যাওয়া কিংবা কমে যাওয়া একটি অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। তোমরা নিশ্চিতভাবেই সাইকেল, গাড়ি, বাস কিংবা ট্রেনে উঠেছ যেখানে স্থির অবস্থা থেকে বেগ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, কিংবা উল্টোটা ঘটেছে, অর্থাৎ বেগ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগ বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে ত্বরণ এবং কমে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে মন্দন।

অবস্থানের পরিবর্তন মাপতে আমরা 'সরণ' ব্যবহার করেছি। আবার সেই সরণ দ্রুত না ধীরে ঘটছে, সেটি মাপতে গিয়ে আমরা 'বেগ' পেয়েছি। ঠিক একইভাবে বেগের পরিবর্তন কি দ্রুত হচ্ছে না ধীরে হচ্ছে, এটি পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা ত্বরণ এবং মন্দন পেয়েছি। অর্থাৎ একক সময়ে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে ত্বরণ। যদি প্রথমে কোনো একটা বস্তুর বেগ থাকে u এবং t সময় পরে তার বেগ হয় v তাহলে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে v-u এবং তার ত্বরণ a হবে,

$$a = \frac{v - u}{t}$$

বেগ সম্পর্কে বলতে হলে যেরকম তার পরিমাণ এবং দিক দুটিই নির্দিষ্ট করে দিতে হয় ঠিক সেরকম ত্বরণের বেলাতেও তার পরিমাণ এবং দিক দুটিই নির্দিষ্ট করে দিতে হয়।

» একক সময়ে একটি বস্তুর বেগ কতটুকু পরিবর্তিত হলো তাকে বলে 'ত্বরণ'। ত্বরণ প্রকাশে আমরা ব্যবহার করি পূর্ব দিকে $2\ m/s^2$ (পড়া হয় দুই-মিটার-পার-সেকেন্ড-স্কয়ার) কিংবা নিচের দিকে $9.8\ m/s^2$ ইত্যাদি। শুরুর চেয়ে শেষের বেগ বেশি হলে বেগ বৃদ্ধি পায় বা পজিটিভ পরিবর্তন ঘটে, তখন হয় পজিটিভ ত্বরণ। শুরুর চেয়ে শেষের বেগ কম হলে বেগ হ্রাস পায় বা নেগেটিভ পরিবর্তন ঘটে, তখন হয় নেগেটিভ ত্বরণ। নেগেটিভ ত্বরণকে অনেক সময় 'মন্দন' বলা হয়।

1.3.1 ত্বরণ কেমন করে হয়?

আমরা এইমাত্র দেখেছি নির্দিষ্ট সময়ে বেগের বেড়ে যাওয়া আর কমে যাওয়ার পরিমাপ করে আমরা তার নাম দিয়েছি ত্বরণ আর মন্দন। কিন্তু আমরা এখনো বলিনি ত্বরণ বিষয়টি কেন ঘটে কিংবা কেমন করে ঘটে—এক কথায় কেন বেগের পরিবর্তন হয়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু নিয়মিতভাবে বেগের বেড়ে যাওয়া কিংবা কমে যাওয়ার ব্যাপারটি দেখছি। তুমি স্থির অবস্থা থেকে হাঁটতে শুরু করলে, তোমার বেগের পরিবর্তন হলো। থেমে থাকা বাস কিংবা ট্রেনে বসে আছো এক সময় সেটা চলতে শুরু করলো, আবার বেগের পরিবর্তন হলো। একটা সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিয়ে তুমি সেটা চালাতে শুরু করলে, তুমি তোমার বেগের পরিবর্তন করলে কিংবা একজন বেপরোয়া মোটরবাইক চালক তার চলন্ত বাইক দিয়ে লাইটপোস্টে ধাক্কা দিয়ে বাইকসহ নিচে পড়ে থেমে গেল—আবার তার বেগের পরিবর্তন হলো।

একটুখানি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে কখনো নিজের থেকে বেগের পরিবর্তন হয় না, সব সময়েই তার পিছনে কোনো একটা কারণ থাকতে হয়, সোজা ভাষায় বেগের পরিবর্তন করার জন্য কিছু একটা করতে হয়। বেগের পরিবর্তন করার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে বল প্রয়োগ। বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করে কখনো কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তন করা যায় না। সাইকেল চালানোর জন্য প্যাডেলে চাপ দিয়ে বল প্রয়োগ করা হয়েছে, বাস বা ট্রেন চালানোর জন্য সেগুলোর ইঞ্জিন চালু হয়ে বল প্রয়োগ করেছে, রাস্তার লাইটপোস্ট বেপরোয়া বাইকচালকের উপর বল প্রয়োগ করে তাকে থামিয়েছে।

এবারে বল (Force) বলতে কী বোঝায় সেটা জানার চেষ্টা করি। বল প্রয়োগের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া কিংবা টেনে আনা। আবার কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে সেটি নিচের দিকে পড়তে থাকে, এটিও ঘটে আরেকটি বলের কারণে, যার নাম মহাকর্ষ। তোমরা যারা চুম্বক নিয়ে খেলেছ তারা নিশ্চয়ই সেটা দিয়ে লোহাকে আকর্ষণ করা টের পেয়েছ, সেটি এক ধরনের বল তার নাম চৌম্বকীয় বল। শীতের দিনে চুলে চিরুনি ঘষে সেটা দিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে দেখেছ, সেটা এক ধরনের বল, সেটি হচ্ছে স্থির বিদ্যুতের বল, বিজ্ঞানী কুলম্বের নাম অনুসারে তাকে বলে কুলম্বের বল। তুমি যখন কিছু একটা গড়িয়ে দাও চলতে চলতে সেটা থেমে যায়, যে বলের জন্য সেটা থেমে যায় তার নাম হচ্ছে ঘর্ষণ বল। কাজেই চোখ-কান খোলা রাখলে তোমরা এরকম অনেক ধরনের বলের খোঁজ পাবে।

তবে বলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে, যদি কখনো কোনো কিছুর বেগের পরিবর্তন করতে হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে বল প্রয়োগ করতে হবে। বল প্রয়োগ না করে কখনোই তোমরা বেগের পরিবর্তন করতে পারবে না, বেগ বাড়াতেও পারবে, না কমাতেও পারবে না। এর উল্টোটাও কিন্তু সত্যি, যদি কখনো দেখ কোনো কিছুর বেগের পরিবর্তন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে যে নিশ্চয়ই সেখানে কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে।

এবারে তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা যাক। বেগের মান কিংবা দ্রুতির পরিবর্তন হলে অবশ্যই বেগের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বল প্রয়োগ না করে বেগের মান কিংবা দ্রুতির পরিবর্তন করা যাবে

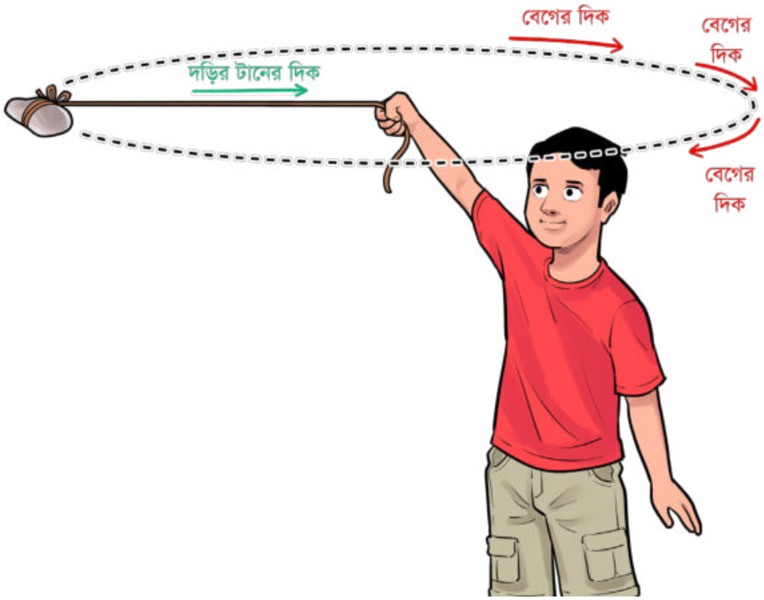

না। দ্রুতির কোনো সুনির্দিষ্ট দিক থাকে না কিন্তু বেগের সুনির্দিষ্ট দিক থাকে। কাজেই কোনো গতিশীল বস্তুর দ্রুতির পরিবর্তন না করে শুধু দিক পরিবর্তন হলে কী তার বেগের পরিবর্তন হয়? সেটাকে কী আমরা ত্বরণ বলতে পারি? আমরা এখন সেটি আলোচনা করব।

বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান বস্তুর ত্বরণ কেন্দ্রের দিকে

1.3.2 বক্র রেখায় ত্বরণ

আমরা একটি বস্তুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে যদি ছবিতে দেখানো উপায়ে মাথার উপরে ঘুরাতে থাকি তাহলে সেই বস্তুটির কি কোনো ত্বরণ হয়? যদি ত্বরণ হয়ে থাকে তাহলে তার মান কত?

সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার হচ্ছে ত্বরণ। বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকা একটি বস্তুর বেগের 'দিক' প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, যার অর্থ এর বেগটিও প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। কাজেই বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকা একটি বস্তু হচ্ছে একটি চমকপ্রদ উদাহরণ যেখানে একটি বস্তুর দ্রুতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু বেগের পরিবর্তন হচ্ছে, কাজেই এখানে অবশ্যই একটি ত্বরণ রয়েছে। আমরা জানি ত্বরণ সৃষ্টি করা সম্ভব বস্তুটির উপরে কোনো এক ধরনের বল প্রয়োগ করে। তোমরা যারা ছবিতে দেখানো উপায়ে একটি বস্তুকে দড়িতে বেঁধে মাথার উপরে ঘোরাতে চেষ্টা করেছ তারা সবাই জান তোমাকেই হাত দিয়ে টেনে ধরে রেখে বস্তুটিকে ঘোরাতে হয় বা বস্তুটির উপর কেন্দ্রমুখী একটা বল প্রয়োগ করতে হয় যেটি কেন্দ্রমুখী একটি ত্বরণের সৃষ্টি করে।

এই ঘুরন্ত বস্তুটির গতি ব্যাখ্যা করতে শুধু দুটি রাশির প্রয়োজন, দড়ির দৈর্ঘ্য (যা আসলে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব) এবং পাথরের বেগ। কাজেই ত্বরণটিও নিশ্চয়ই এই দুটি রাশি দিয়েই গঠিত। একটুখানি ক্যালকুলাস জানলে আমরা খুব সহজেই এই ত্বরণের রূপটি বের করে ফেলা যায় কিন্তু যেহেতু সেটি তোমাদের এখনো জানার সৌভাগ্য হয়নি তাই তোমাদের সরাসরি ত্বরণটি জানিয়ে দেওয়া যাক। বেগের মান যদি v আর দড়ির দৈর্ঘ্য যদি r হয় তাহলে কেন্দ্রমুখী ত্বরণ a হচ্ছে,

$$a = \frac{v^2}{r}$$

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমরা এই সহজ সম্পর্কটা যদি জেনে রাখি তাহলে দেখবে এটি ব্যবহার করে আমরা বিজ্ঞানের কত চমকপ্রদ বিষয় বের করে ফেলতে পারব। তোমরা দেখবে শুধু এই সূত্রটা ব্যবহার করে অন্য কোনো কিছু না জেনেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে কত উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা তুমি বের করে ফেলতে পারবে!

1.৫ গতির সমীকরণ (Equations of Motion)

আগের শ্রেণিতে তোমাদের 'সরল সমীকরণ' সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে সরণ, বেগ ও ত্বরণকে ব্যবহার করে কয়েকটি গতির সমীকরণ গঠন করা হবে। এবারেও আমরা শুধু সরল রেখায় গতি নিয়ে আলোচনা করব।

1.৫.1 বেগের সমীকরণ

মনে করো কোনো গতিশীল বস্তুর বেগ শুরুতে ছিল u, a ত্বরণ থাকার কারণে t সময় পার হওয়ার পর বস্তুটির বেগ বেড়ে হয়েছে v, আমরা একটু আগেই দেখেছি তাহলে বস্তুর ত্বরণটির জন্য লিখতে পারি :

$$a = \frac{v - u}{t}$$

যত সহজ সরলই হয়ে থাকুক না কেন এটি একটি সমীকরণ। এর বামপক্ষ আর ডানপক্ষের মান যেহেতু সমান, তাই আমরা চাইলেই বামপক্ষ ডানদিকে আর ডানপক্ষ বামদিকে লিখতে পারি :

$$\frac{v - u}{t} = a$$

এবারে এর দুই পাশেই t দিয়ে গুণ করি :

$$\frac{v - u}{t} \times t = a \times t$$

তাহলে সমীকরণটি হয়ে যাবে : $v - u = at$

এবার, দুই পাশেই u যোগ করি : $v = u + at$

এটি হচ্ছে গতির প্রথম একটি সমীকরণ। তুমি যদি কোনো বস্তুর শুরুর বেগ (u) এবং ত্বরণ (a) জানো তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় (t) পরে তার বেগ (v) কত হবে এই সমীকরণটির দিয়ে তুমি সেটি বের করে ফেলতে পারবে। এখন আমরা এটি ব্যবহার করে হিসাবপত্র করতে পারব।

উদাহরণ : একটি গাড়ির ইঞ্জিন 2 m/s^2 ত্বরণ সৃষ্টি করে, তুমি গাড়িটিকে 3 m/s বেগে গতিশীল দেখলে। 4 s পরে এটির বেগের মান কত হবে?

উত্তর: এখানে প্রথমেই আমরা দেখে নেব, কী কী তথ্য জানা আছে। গাড়ির ত্বরণ 2 m/s^2 যা a এর মান। শুরুতে এটি 3 m/s বেগে গতিশীল, অর্থাৎ এটি হল u, 4 s হল সময়ের পরিমাণ যা t, আর এই সময় পরে পরিবর্তিত বেগের মান অর্থাৎ v জানতে চাওয়া হয়েছে।

তাহলে, আমরা শিখেছি $v = u + at$

$$v = 3 + 2 \times 4 = 11 \ m/s$$

অর্থাৎ, হিসেব বলছে 4 s পরে গাড়িটি 11 m/s বেগে গতিশীল থাকবে।

1.৭.2 দূরত্বের সমীকরণ

গতিশীল বস্তু সম্পর্কে কিছু জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জানার কৌতূহল হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে। একটি বস্তু যদি সমবেগে যায় তাহলে বিষয়টা খুবই সোজা, বেগকে সময় দিয়ে গুণ দিলেই অতিক্রান্ত দূরত্ব পেয়ে যাই। অর্থাৎ বস্তুর বেগ যদি হয় V, সেটি যদি t সময় ধরে গতিশীল থাকে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব বা সরণ S হচ্ছে :

$$S = Vt$$

কিন্তু বস্তুটির যদি একটা ত্বরণ থাকে তাহলে এটি সমবেগ নয়, প্রতি মুহূর্তেই বেগের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তখন আর এই সোজা সূত্রটা ব্যবহার করতে পারব না। কিন্তু বস্তুটি যদি সমত্বরণে গতিশীল হয় অর্থাৎ বস্তুটির ত্বরণের কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে আমরা উপরের সূত্রে বেগের পরিবর্তে গড়বেগ ব্যবহার করতে পারি। প্রথমে গড়বেগ V বের করে নিই :

$$V = \frac{u + v}{2}$$

কিন্তু আমরা একটু আগেই v-এর জন্য একটা সমীকরণ লিখেছিলাম, সেটা এখানে ব্যবহার করা যাক :

$$V = \frac{u + (u + at)}{2}$$

কাজেই গড়বেগ V হচ্ছে :

$$V = u + \frac{1}{2}at$$

যেহেতু অতিক্রান্ত দূরত্ব $S = Vt$, কাজেই আমরা লিখতে পারি :

$$S = (u + \frac{1}{2}at) \times t$$

কিংবা :

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

আমরা গতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ বের করে ফেলেছি। এটিকে ব্যবহার করে হিসাবপত্র করে দেখা যেতে পারে।

উদাহরণ : আগের উদাহরণের গাড়িটি 4 s পরে কত দূর যাবে?

উত্তর : আগের মতোই গাড়ির ত্বরণ a = 2 m/s^2, শুরুর বেগ u = 3 m/s, সময়ের পরিমাণ t = 4 s হিসেব করে বের করতে হবে সরণ অর্থাৎ S কত।

তাহলে, আমরা শিখেছি,

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$S = 3 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 42$$

$$= 12 + 16 = 28\ m$$

অর্থাৎ, হিসাব বলছে 4 s পরে গাড়িটি 28 m দূরত্ব অতিক্রম করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

1.৭.3 গতির তৃতীয় সমীকরণ

আগের দুইটি সমীকরণেই কিন্তু, সময় বা t রাশিটি আছে। আমরা চাইলে দুটি সমীকরণ একত্র করে তৃতীয় একটি সমীকরণ গঠন করতে পারি যেখানে সময় বা t রাশিটি থাকবে না। আমরা $v = u + at$ থেকে শুরু করতে পারি, এর ডানপক্ষে t আছে। আবার,

$$S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

এই সমীকরণের ডানপক্ষে আছে t^2, কাজেই $v = u + at$ সমীকরণটিকে বর্গ করে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারি।

প্রথমে সমীকরণের দুপাশেই বর্গ করে দেখি : $v^2 = (u + at)^2$

বা, $v^2 = u^2 + 2uat + a^2t^2$

বা, $v^2 = u^2 + 2a . ut + 2a . ½ at^2$

বা, $v^2 = u^2 + 2a (ut + ½ at^2)$

যেহেতু $S = ut + ½ at^2$, এটি ব্যবহার করে এবারে আমরা t-বিহীন গতির একটি সমীকরণ পেয়ে যেতে পারি :

$$v^2 = u^2 + 2aS$$

সহজ সরল এই সমীকরণটি মনে রেখো, কারণ এর মাঝে কিছু চমকপ্রদ বিজ্ঞান বের হওয়ার অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে!

এবার $v^2 = u^2 + 2aS$ সমীকরণটি একটি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

উদাহরণ: একটি পাথরের টুকরো 10 m/s^2 ত্বরণে নিচে পড়ছে। শুরুতে 2 m/s বেগ নিয়ে শুরু করে 3 m দূরত্ব অতিক্রম করার পরে এর বেগ কত?

উত্তর: এখানে পাথরের ত্বরণ $a = 10\ m/s^2$, শুরুর বেগ $u = 2\ m/s$, সরণের পরিমাণ $s = 3\ m$, হিসাব করে বের করতে হবে শেষের বেগ অর্থাৎ 'v' কত?

আমরা শিখেছি $v^2 = u^2 + 2aS$

$$v^2 = 2 \times 2 + 2 \times 10 \times 3 = 4 + 60 = 64 = 8^2$$

$$v = 8\ m/s$$

অর্থাৎ, হিসাব অনুযায়ী 3 m দূরত্ব অতিক্রম করার পরে পাথরের বেগ 8 m/s হবে।

ভাবনার খোরাক : $v = u + at$ সমীকরণ থেকে t-এর জন্য একটি সূত্র বের করে সেটি $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ সমীকরণে ব্যবহার করে কী $v^2 = u^2 + 2aS$ এই সমীকরণটি বের করা সম্ভব?

1.4.5 গতির সমীকরণের লেখচিত্র :

আমরা তিনটি সমীকরণ বের করে সেগুলোর সাহায্যে একটু সত্যিকারের হিসাবপত্র পর্যন্ত করে দেখেছি। এই বেলা আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখে নিই, সেটি হচ্ছে সমীকরণকে লেখচিত্র দিয়ে প্রকাশ করা। লেখচিত্র কীভাবে আঁকতে হয় সেটি তোমাদের অনুশীলনী বইটিতে শিখিয়ে দেওয়া হবে, তখন তোমরা বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের নতুন আরেকটি পদ্ধতি জেনে যাবে। এই অধ্যায়ে আমরা গতির যে তিনটি সমীকরণ বের করেছি সেগুলোর জন্য এখানে তোমাদের তিনটি লেখচিত্র দেখানো হয়েছে। তোমরা এখান থেকে অনেক তথ্য বের করে আনতে পারবে।

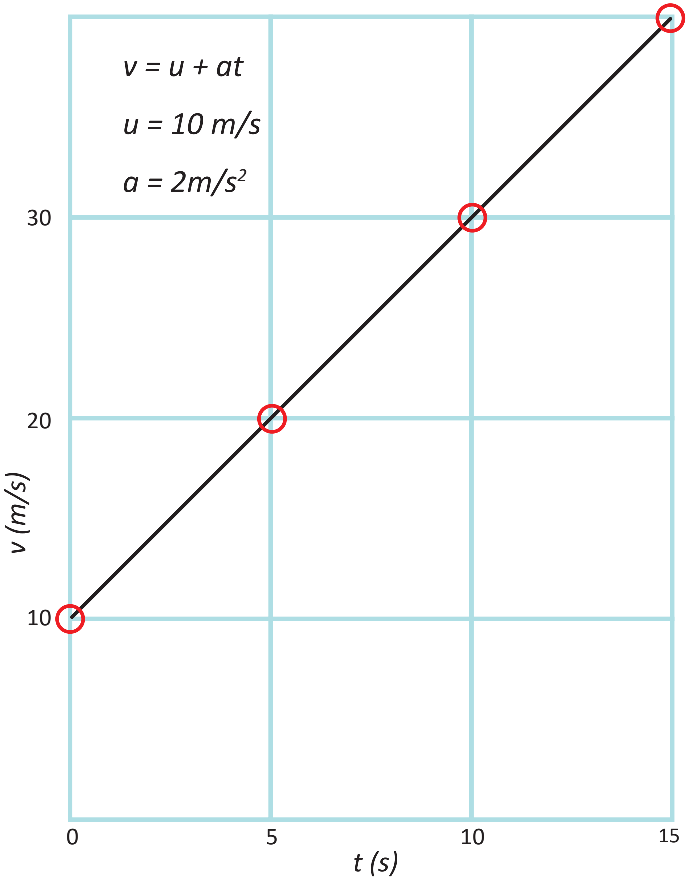

এই লেখচিত্রে সময়ের (t) সাপেক্ষে বেগের (v) মান দেখানো হয়েছে।

প্রথম লেখচিত্রটিতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বস্তুর বেগ সময়ের সাথে সরল রেখায় পরিবর্তিত হয়। লেখচিত্রে শুরুর বেগ (u) এবং ত্বরণের (a) মান উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে। যদি দেওয়া না-ও থাকত আমরা এই লেখচিত্র থেকে সেগুলো বের করে ফেলতে পারতাম। যেমন আমরা লেখচিত্রে দেখতে পাচ্ছি সময়ের মান যখন শূন্য তখন বেগের মান 10 m/s অর্থাৎ এটি হচ্ছে শুরুর বেগ (u)। ঠিক সেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি 15 সেকেন্ডে বেগের মান 10 m/s থেকে বেড়ে 40 m/s হয়েছে। কাজেই ত্বরণ a হবে:

$$a = \frac{40 - 10}{15} = 2m/s^2$$

গতির অন্য দুটো সমীকরণ পরের পৃষ্ঠায় দুটি লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করছ অতিক্রান্ত দূরত্ব যখন সময়ের সাপেক্ষে দেখানো হয় তখন সেটি সরল রেখায় বৃদ্ধি না পেয়ে বর্গের আনুপাতিক হয়ে বৃদ্ধি পায়।

তোমরা গতির সমীকরণগুলো ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য কোনো একটি রাশির মান হিসাব করে বের করেছিলে। লেখচিত্র থেকে তোমাকে শুধু একটি নির্দিষ্ট মানে সন্তুষ্ট থাকতে হবে না। তোমরা নিচের অক্ষের যে কোনো মানের জন্য একটা আনুমানিক মান বের করে ফেলতে পারবে!

ভাবনার খোরাক : তুমি কি প্রথম লেখচিত্র থেকে 7.5 সেকেন্ডে বেগের মান কত হবে অনুমান করতে পারবে? দ্বিতীয় লেখচিত্র থেকে 3.5 সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে অনুমান করতে পারবে? তৃতীয় লেখচিত্র থেকে 25 m দূরত্ব অতিক্রম করার সময় বস্তুটির বেগ কত ছিল অনুমান করতে পারবে? বুঝতেই পারছ তুমি একেবারে সত্যিকারের মান বের করতে না পারলেও কাছাকাছি একটা মান বের করে ফেলতে পারবে।

জেনে রাখো, বিজ্ঞান শেখার সময় বিভিন্ন রাশির কাছাকাছি একটা মান অনুমান করতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দক্ষতা।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ডানদিকের লেখচিত্রে সময়ের (t) সাপেক্ষে অতিক্রান্ত দূরত্ব (S)

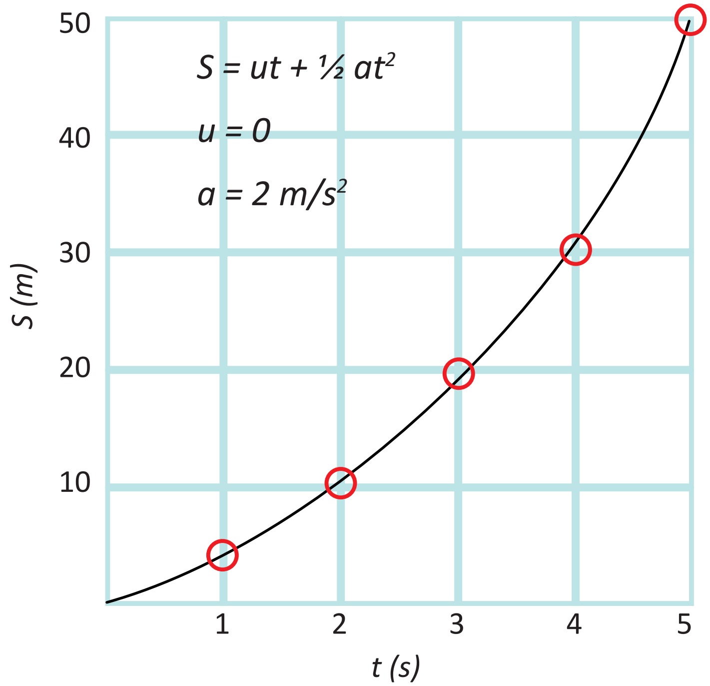

এবং

নিচের ডানদিকের লেখচিত্রে অতিক্রান্ত দূরত্বের (S) সাপেক্ষে বেগের বর্গের (v^2) মান দেখানো হয়েছে।

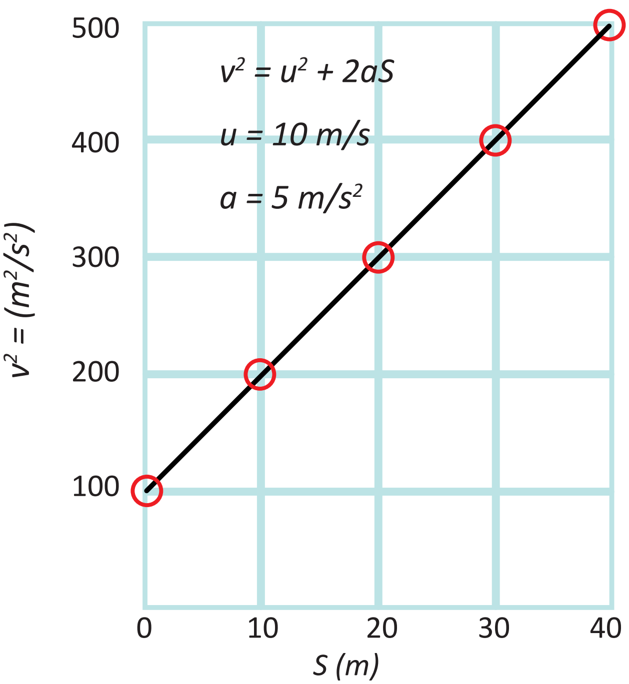

অধ্যায় ২

শক্তি

অধ্যায় ২ শক্তি

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ কাজ ও শক্তি
- ☑ বিভবশক্তির ধারণা
- ☑ গতিশক্তির ধারণা
- ☑ ভর ও শক্তির সম্পর্ক
- ☑ ক্ষমতার ধারণা

2.1 কাজ ও শক্তি (Work and Energy)

আমরা সবাই দেখেছি বল প্রয়োগ করে একটি বস্তুকে ঠেলে সরিয়ে নেয়া যায়। কতটুকু বল প্রয়োগ করে কতটুকু সরানো হয়েছে তার উপর নির্ভর করে কতটুকু কাজ করা হয়েছে। 'কাজ' শব্দটি আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় সব সময় ব্যবহার করি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ শব্দটির একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। বল প্রয়োগ করে যদি বলের দিকে একটা বস্তুকে ঠেলে নেওয়া যায় শুধু তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে কাজ করা হয়েছে। মনে করো তুমি একটি ইঁট ধাক্কা দিয়ে 5 মিটার দূরে সরিয়ে নিয়েছ, তোমার বন্ধু সেই একই ইঁট একই পরিমাণ ধাক্কা দিয়ে 10 মিটার দূরে সরিয়ে নিয়েছে। দুজনেই একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করেছে, কিন্তু দুজনেই 'ইঁট সরিয়েছে' ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে, কাজেই দুজনের 'কাজ' হয়েছে দুরকম। একইভাবে দুজনেই যদি ধাক্কা দিয়ে ইটটিকে সমান দূরত্বে সরাতে কিন্তু সরানোর জন্য ভিন্ন পরিমাণ বল প্রয়োগ করাতে তাহলেও কিন্তু কাজের পরিমাণ ভিন্ন হতো। অন্যভাবে বলা যায় কাজের পরিমাণ বের করার জন্য বল এবং সরণ এই দুটি রাশি প্রয়োজন। প্রথমত, একটি বস্তুতে 'বল' প্রয়োগ করতে হবে, এবং সেই বল প্রয়োগ করে বস্তুটির 'সরণ' ঘটতে হবে। অর্থাৎ, গাণিতিকভাবে বলা যায় বল ও সরণের গুণফলই হলো কাজ।

কাজ = বল × বলের দিক বরাবর সরণ

বা, $W = F \times S$

কাজের একক হলো জুল (Joule), একে J দ্বারা লেখা হয়।

কাজ করতে প্রয়োজন হয় শক্তির। আমরা সবাই শক্তি শব্দটির সাথে পরিচিত, দৈনন্দিন কথায় আমাদের শক্তি প্রয়োগ বা বল প্রয়োগ বলতে একই বিষয় বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি (Energy) শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। কাজ করার সামর্থ্যকে বলা হয় শক্তি। শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, এক ধরনের শক্তি কেবল অন্য ধরনের শক্তিতে বদলে যেতে পারে। বইয়ের ভাষায় একে বলে শক্তির নিত্যতা। আর এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে বদলে যাওয়াকে বলে শক্তির রূপান্তর।

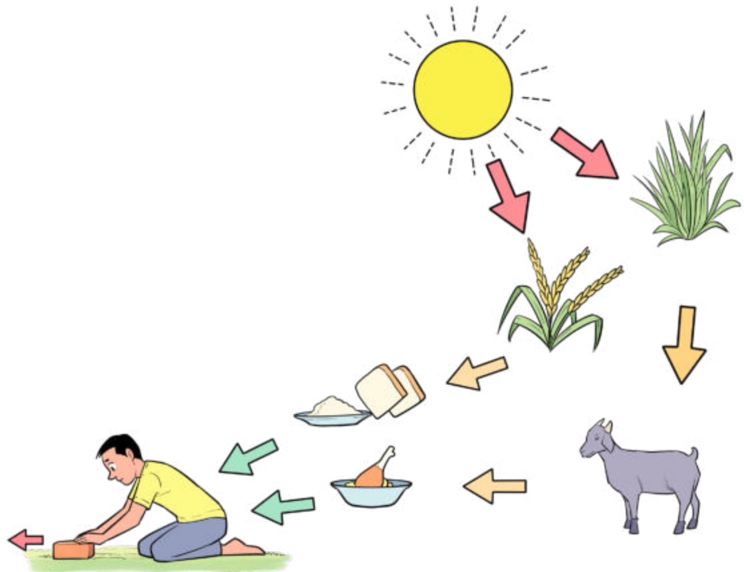

শক্তির ক্রম রূপান্তর

একটু আগে তোমাদের বল প্রয়োগ করে একটি ইট সরিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এই কাজের সামর্থ্য এসেছে তোমার হাত থেকে। তোমার হাতে এই শক্তি এসেছে তোমার দেহে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি থেকে। তোমার দেহে রাসায়নিক শক্তি এসেছে তোমার খাবার থেকে। খাবার হিসেবে তুমি ভাত বা রুটি খেয়ে থাকলে সেটি এসেছে ধানগাছ কিংবা গমগাছ থেকে। মাংস হলে এসেছে হাঁস, মুরগি কিংবা গরু-ছাগলের মতো কোনো প্রাণী থেকে। প্রাণীরাও বড়ো হয়েছে ঘাস, পাতা বা বিচালি খেয়ে। ঘাস, পাতা কিংবা অন্যান্য গাছের শক্তি এসেছে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় আলো, সেটি আসে সূর্য থেকে। সূর্য তার এই শক্তি পেয়ে থাকে ক্রমাগত চলমান ফিউশান নামের নিউক্লিয় বিক্রিয়া থেকে। এভাবে এক শক্তি থেকে অন্য শক্তির রূপান্তর হতেই থাকে।

শক্তি যেহেতু কাজেরই পরিমাণ, তাই এর এককও জুল।

2.2 বিভবশক্তি (Potential Energy)

আমরা ইতোমধ্যে শক্তির বিভিন্ন উদাহরণ দেখেছি। আমরা এটাও জেনেছি যে কাজ করার সামর্থ্যই হচ্ছে শক্তি। কিছু শক্তি আছে যা কাজের মাধ্যমে সঞ্চয় করে রাখা যায়। একটা ইলাস্টিক কিংবা রাবার ব্যান্ড টেনে লম্বা করে ছেড়ে দিয়ে সেটা দিয়ে কিছু ছুড়ে দেওয়া যায়, গুলতিতে যা করা হয়। স্প্রিং দিয়েও একই ধরনের কাজ করা যায়, তাকে টেনে লম্বা কিংবা চেপে সংকুচিত করে তার ভেতর শক্তি সঞ্চয়

ধনুকে যে বিভব শক্তি জমা থাকে সেটি তীরকে ছুড়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশের মানুষ আধুনিক অস্ত্রের পাশাপাশি তীর-ধনুক দিয়েও যুদ্ধ করেছিল। (ফটোসাংবাদিক: জালাল উদ্দিন হায়দার)

করে রাখা যায়। একটা স্প্রিং কিংবা রাবার ব্যান্ড নিজে নিজে লম্বা হয় না, বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে একে লম্বা করতে হয়। এই লম্বা করার প্রক্রিয়ায় যে কাজ করা হয় সেটি রাবার ব্যান্ড কিংবা স্প্রিঙের ভেতরে শক্তি হিসেবে জমা হয়ে থাকে।

কোনো একটা বস্তুকে তুমি যদি একটা টেবিলের উপর তুলে রাখতে চাও তবে তোমাকে সেটাকে টেনে উপরে তুলতে হবে, অর্থাৎ বস্তুটির ওপর বল প্রয়োগ করে সেটিকে টেবিলের উপরে তুলতে হবে। আমরা কাজের সংজ্ঞা থেকে জানি উপরের দিকে বল প্রয়োগ করে একটা বস্তুকে যখন উপরে নেওয়া হয় তখন সেখানে কাজ করা হয়। এই বস্তুটাকে টেবিলের উপর তোলার পর তুমি যদি সেটাকে কিনারায় এনে ছেড়ে দাও তখন বস্তুটি নিজ থেকেই নিচে পড়ে যাবে, সেটিকে টেনে নামাতে হবে না। বস্তুটা যদি একটা স্প্রিঙের ওপর পড়ে তাহলে স্প্রিংটা চেপে ছোট হয়ে যাবে, একটু আগেই আমরা জেনেছি, স্প্রিং ছোট করতে (কিংবা লম্বা করতে) বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ, উপর থেকে নিচে পড়ার সময় সময় বস্তুটির মাঝে কাজ করার মতো একটি সক্ষমতা বা শক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এই শক্তি কোথা থেকে এসেছে? শুরুতে বস্তুটার উপর 'কাজ করে' যখন উপরে তোলা হয়েছিল, তখন ঐ কাজটুকুই বস্তুটিতে শক্তি হিসেবে জমা হয়েছে। বস্তুটিকে টেবিলের কিনারায় এনে ছেড়ে দিলে সেটি অভিকর্ষ বলের কারণে নিচে এসে পড়বে। তোমরা জান অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বলের উৎস হলো পৃথিবী, সেটি সবকিছুকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে।

তাহলে, আমরা কিছু কিছু উদাহরণ থেকে জানতে পারলাম যে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর ওপরে বল প্রয়োগ করে কাজ করলে, সেই কাজটুকু শক্তি হিসেবে জমিয়ে রাখা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্তির সাধারণ নাম 'বিভবশক্তি'। স্প্রিঙের ক্ষেত্রে এই শক্তি এসেছে বস্তুর 'স্থিতিস্থাপক' ধর্মের বিরুদ্ধে করা কাজ থেকে। তাই এর নাম 'স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি'। আবার, টেবিলে উঠিয়ে রাখা বস্তুর মাঝে শক্তি এসেছে 'অভিকর্ষ' বলের বিরুদ্ধে করা কাজ থেকে। তাই এর নাম 'অভিকর্ষজ বিভব শক্তি'।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কিছুকে উপরে তোলা হলে তার মাঝে বিভবশক্তি জমা হয়, কিন্তু কতটুকু বিভবশক্তি জমা হয় সেটি কি বের করা সম্ভব? সেটা খুব কঠিন নয়, বস্তুটার উপরে যেটুকু কাজ করা হয় সেই কাজটুকুই বিভব শক্তি হিসেবে জমা হয়ে যায়। কাজের পরিমাপ কীভাবে করতে হয় এখন সেটাও আমরা জানি। যেটুকু বল প্রয়োগ করেছি তার সঙ্গে যেটুকু উপরে তুলেছি সেই দুটো গুণ দিলেই কাজের পরিমাণ বের হয়ে যাবে।

প্রথমে বলের পরিমাণটা বের করা যাক। বস্তুর ওজন আছে বলেই সবকিছু নিচে পড়তে থাকে, কাজেই বস্তুটার যেটুকু ওজন আমাদের ঠিক সেই পরিমাণ বল উপরের দিকে প্রয়োগ করা না হলে বস্তুটাকে উপরে তোলা যাবে না। আগের শ্রেণিতে ভর সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে তোমাদের বলা হয়েছিল যে বস্তুর ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষণটাই হচ্ছে ওজন অর্থাৎ যার ভর যত বেশি, তার ওজনও তত বেশি। তোমরা যখন মহাকর্ষ বল নিয়ে পড়বে তখন দেখবে বস্তুর ভর যদি হয় m kg, তাহলে তাকে $9.8\ m/s^2$ দিয়ে গুণ করা হলে সেই ভরের ওজনটা বের হয়ে যায়। শুধু তাই নয় তোমরা দেখবে এই $9.8\ m/s^2$ সংখ্যাটি হঠাৎ করে চলে আসেনি, এই সংখ্যাটি হচ্ছে মহাকর্ষ বলের কারণে সৃষ্ট হওয়া ত্বরণ। এই ত্বরণটিকে বলে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ এবং সংক্ষেপে এটাকে g দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

এবারে আমরা অভিকর্ষজ বিভব শক্তিটুকু বের করে ফেলতে পারব :

অভিকর্ষজ বিভব শক্তি = অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে করা কাজ

= অভিকর্ষ বল × সরণ

= ওজন × সরণ

= ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ × সরণ

এখন, অভিকর্ষজ বিভব শক্তিকে E, ভরকে m, অভিকর্ষজ ত্বরণকে g আর সরণকে h দ্বারা প্রকাশ করলে লেখা যায় : $E = mgh$

অর্থাৎ m ভরের একটা বস্তুকে h উচ্চতায় তোলা হলে সেটিতে mgh বিভব শক্তি জমা হবে।

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইঁটকে আমরা যত ওপরে তুলব, তত বেশি কাজ হবে অর্থাৎ ততই বেশি 'বিভবশক্তি' জমা হবে।

2.3 গতিশক্তি (Keinetic Energy)

আমরা বল প্রয়োগ করে ইট ঠেলে সরিয়ে নেওয়ার উদাহরণে আরও একবার ফিরে যাই। কল্পনা করে নাও মেঝেতে m ভরের একটা ইট রয়েছে এবং F বল প্রয়োগ করে তুমি সেটাকে বলের দিকে S দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছ। কাজেই বলতি $W = FS$ পরিমাণ কাজ করেছে। কিন্তু আমরা এতক্ষণে জেনে গেছি যদি কোনো বস্তুর উপরে কাজ করা হয় তাহলে সেখানে কাজটা শক্তি হিসেবে জমা হয়ে থাকে। কিন্তু ইটটাকে ঠেলে সরিয়ে নেওয়ার পর আমরা কিন্তু কোথাও শক্তি জমা হয়ে থাকার নিশানা দেখতে পাচ্ছি না! যদি মেঝেতে ঠেলে না নিয়ে h উচ্চতায় তুলে নিতাম তাহলে W কাজটা অন্তত mgh পরিমাণ অভিকর্ষজ বিভব শক্তি হিসেবে জমা হয়ে যেত।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে কাজটা আসলে বৃথা যায়নি, তুমি যখন ইটটাকে মেঝেতে ঘষে নিয়ে গেছ তখন ঘর্ষণের কারণে তাপ সৃষ্টি হয়েছে, হয়তো খানিকটা শব্দও তৈরি হয়েছে। কাজেই তুমি যে কাজ করেছ সেটি তাপ শক্তি কিংবা শব্দ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। শক্তির নিত্যতার কারণে সেটি কোনো না কোনো রূপে রূপান্তরিত হতেই হবে। এবারে তুমি কল্পনা করে নাও কোনো একটি উপায়ে তুমি পুরোপুরি ঘর্ষণমুক্ত একটি মেঝে তৈরি করেছ, যে মেঝেতে একটা ইটকে ঠেলে নিতে কোনো ঘর্ষণ হয় না। এবারে তুমি যদি F বল প্রয়োগ করে m ভরের ইটটাকে S দূরত্বে নিয়ে যাও তাহলে তো তোমার করা কাজ কোনো তাপ কিংবা শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে না, তাহলে কাজ যে শক্তিটি তৈরি করবে সেটি আমরা কোথায় খুঁজে পাব? একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তুমি যখন বল প্রয়োগ করবে, তখন বস্তুটির ত্বরণ হবে এবং তার বেগ বাড়তে থাকবে। তুমি যখন ইটটাকে ছেড়ে দেবে সেটি থেমে না গিয়ে এই বেগে চলতে থাকবে।

একটি বস্তুর বেগের জন্য তার ভেতরে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে বলে গতিশক্তি এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে শক্তিটি সবচেয়ে বেশি দেখে অভ্যস্ত, সেটি সম্ভবত এই গতিশক্তি। যেমন- একটা ইটের উপর একটা হাতুড়ি রেখে দিলে ইটটার কিছুই হয় না। কিন্তু তুমি যদি হাতুড়িটা প্রবল বেগে নিচে নামিয়ে আন তাহলে ইটটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। স্থির হাতুড়ির মাঝে কোনো শক্তিই নেই কিন্তু গতিশীল হাতুড়ির মাঝে অনেক শক্তি। আমরা ইচ্ছে করলে বেগের জন্য যে গতিশক্তি তৈরি হয় তার পরিমাণটাও বের করে ফেলতে পারি। তার জন্য আমাদের জানতে হবে একটি ভরের উপর বল প্রয়োগ করা হলে তার কত ত্বরণ হয়। আমরা যখন অভিকর্ষজ বিভব শক্তি বের করেছি তখন দেখেছি ওজন বা অভিকর্ষ বলের পরিমাণ হচ্ছে mg, যেখানে m হচ্ছে ভর এবং g হচ্ছে অভিকর্ষজ ত্বরণ। এটি শুধু অভিকর্ষ বল কিংবা অভিকর্ষ ত্বরণের জন্য সত্যি নয়, এটি সকল বল এবং সকল ত্বরণের জন্য সত্য। কাজেই যদি m ভরের একটা বস্তুর উপরে F বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার ত্বরণ a আমরা নিচের সূত্র দিয়ে বের করতে পারি :

$$F = ma$$

এবারে আমরা কাজ W-এর জন্য বস্তুটির ভেতরে সৃষ্ট গতিশক্তি E কত সেটা বের করতে পারি।

গতিশক্তি = বস্তুটির উপর করা কাজ

কিংবা $E = W$

F বল প্রয়োগ করাকালীন বস্তুটি S দূরত্ব অতিক্রম করে থাকলে কাজের পরিমাণ $W = FS$

কাজেই $E = FS$

$F = ma$ বসিয়ে, $E = maS$

আমরা গতি বিষয়ে তৃতীয় সমীকরণে দেখেছি : $v^2 = u^2 + 2aS$ এবং উল্লেখ করা হয়েছিল এই সমীকরণের ভেতরে কিছু চমকপ্রদ বিজ্ঞান বের হওয়ার অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে। এবারে সেটি বের হয়ে আসবে!

স্থির অবস্থা থেকে শুরু করলে $u = 0$

কাজেই $v^2 = 2aS$

কিংবা : $aS = \frac{1}{2} v^2$

$E = maS$ এ $aS = \frac{1}{2} v^2$ বসিয়ে আমরা পাই, $E = \frac{1}{2} mv^2$

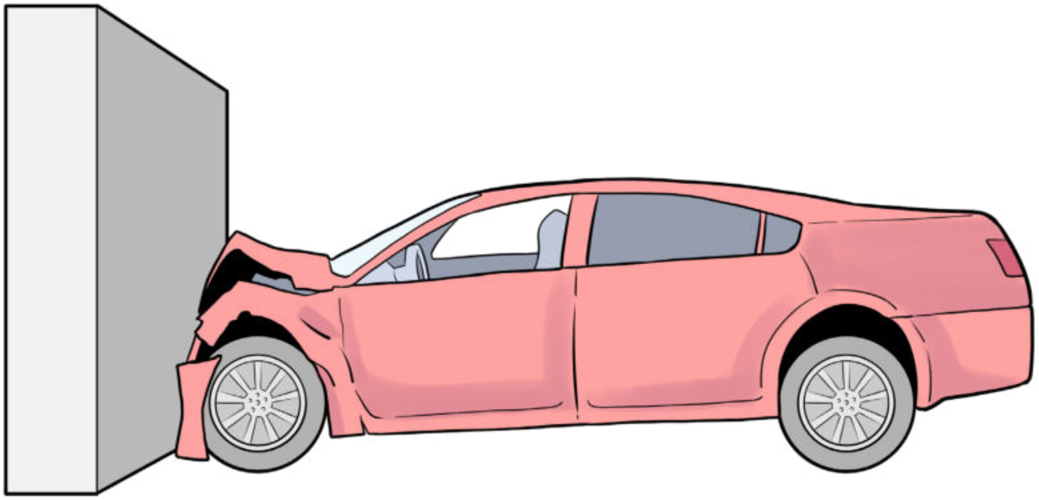

গাড়ি নির্মাতারা নিয়মিতভাবে গতি শক্তির কারণে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি পরীক্ষা করে দেখে।

অর্থাৎ W কাজটুকু m ভরের বস্তুর ভেতরে ½ mv^2 পরিমাণ গতিশক্তি সৃষ্টি করেছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাজ করা হলে শক্তি নষ্ট হয় না, সেটি শক্তি সৃষ্টি করে!

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ গতিশক্তি বেগের বর্গের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ বেগ যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে তার গতিশক্তি বেড়ে যায় চারগুণ। এজন্য বেশি বেগে যানবাহন চালালে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

উদাহরণ : একজন 60 kg ভরের মানুষ 3 m/s বেগে দৌড়াচ্ছে, তার গতিশক্তি কত?

উত্তর : এখানে প্রথমেই আমরা দেখে নেব, কী কী তথ্য জানা আছে। মানুষটির ভর 60 kg যা m-এর মান। মানুষটি 3 m/s বেগে গতিশীল, এটি হলো v, আর জানতে চাওয়া হয়েছে গতিশক্তি অর্থাৎ E কত হবে।

তাহলে, আমরা শিখেছি $E = \frac{1}{2} mv^2$

$$E = \frac{1}{2} \times 60 \times 3^2 = 270 \text{ J}$$

অর্থাৎ, হিসাব বলছে মানুষটির গতিশক্তি 270 J।

আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতেই শক্তির ধারণার সাথে ‘শক্তির নিত্যতা’ নামের একটি ব্যাপার শিখেছি, অনেকভাবেই শক্তির নিত্যতার সূত্র দেখানো যায়, আমরা অভিকর্ষজ বল এবং গতিশক্তির মাঝে এই নিত্যতা কীভাবে কাজ করে সেটা দেখার চেষ্টা করি।

আমরা আরও কিছু চমকপ্রদ বিজ্ঞান বের করার জন্য আবার গতিবিষয়ক তৃতীয় সমীকরণ $v^2 = u^2 + 2aS$ টি ব্যবহার করি। মনে করো একটি m, ভরের স্থির অবস্থা থেকে (অর্থাৎ, u = 0) অভিকর্ষের টানে h দূরত্বে নামার পর বস্তুটির বেগ হলো v, অর্থাৎ এখানে a = g এবং S = h লেখা যায়। তাহলে, গতির সমীকরণে এই মানগুলো বসিয়ে পাই

$v^2 = 0^2 + 2gh$

বা, $v^2 = 2gh$

বা, $\frac{1}{2}v^2 = gh$ (দুইদিকেই 2 দ্বারা ভাগ করে)

বা, $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ (দুইদিকেই m দ্বারা গুণ করে)

অর্থাৎ, বামপক্ষে পেলাম গতিশক্তি আর ডানপক্ষে পেলাম বিভবশক্তি। সমীকরণটি আরও জানাচ্ছে যেটুকু বিভবশক্তি খরচ হয়েছে, ঠিক সেটুকু গতিশক্তিই অর্জিত হয়েছে। এটিই হচ্ছে শক্তির নিত্যতা!

২.৫ ভর ও শক্তির সম্পর্ক

পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য। এটি প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বৎসর থেকে আমাদের সৌরজগৎে আলো, তাপ এবং কখনো কখনো শক্তিশালী আয়ন কণা বিকিরণ করে এসেছে এবং আরও পাঁচ বিলিয়ন বৎসর এভাবে শক্তি বিকিরণ করে যাবে। এই শক্তির উৎস যদি রাসায়নিক বিক্রিয়া হতো তাহলে বহু আগেই সূর্যের সব জ্বালানি ফুরিয়ে যেত। কিন্তু সূর্যের শক্তির উৎস হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সে কারণে এত দীর্ঘ সময় আমরা সূর্য থেকে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি পেয়ে আসছি এবং ভবিষ্যতেও শক্তি পেতে থাকব।

সাধারণভাবে 1 গ্রাম কয়লা পোড়ালে রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যায় আনুমানিক 3000 জুল, তার অনেকখানি আবার বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সে তুলনায় 1 গ্রাম পদার্থ থেকে নিউক্লিয় শক্তি আসে 9,00,00,00,00,00,000 জুল (নয়ের পরে 13টা শূন্য)। তার কারণ নিউক্লিয় শক্তি আসে আইনস্টাইনের অতি বিখ্যাত $E = mc^2$ এই সমীকরণ দিয়ে। এখানে E হলো গিয়ে শক্তি, m হলো ভর আর c হলো আলোর বেগ। এই সহজ সমীকরণে c সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখে কারণ এর মান 30,00,00,000 মিটার/সেকেন্ড। আর বর্গ করলে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় 90,00,00,00,00,00,00,000 এ (নয়ের পরে 16টা শূন্য) যা মোটেই ছেলেখেলা নয়। রূপপুরে দেশের প্রথম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল শক্তি আসবে $E = mc^2$ থেকেই।

ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা হলে $E = mc^2$ হিসেবে অচিন্তনীয় পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় কথাটি সত্যি, কিন্তু তাই কাজটি খুব সহজ নয় কিংবা যে কোনো ভরকেই যখন খুশি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না। এর প্রযুক্তিটি অনেক কঠিন, এবং শুধু অল্প কিছু বিশেষ মৌলিক পদার্থ থেকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমেই এখন পর্যন্ত এই শক্তি বের করে আনা সম্ভব হয়েছে।

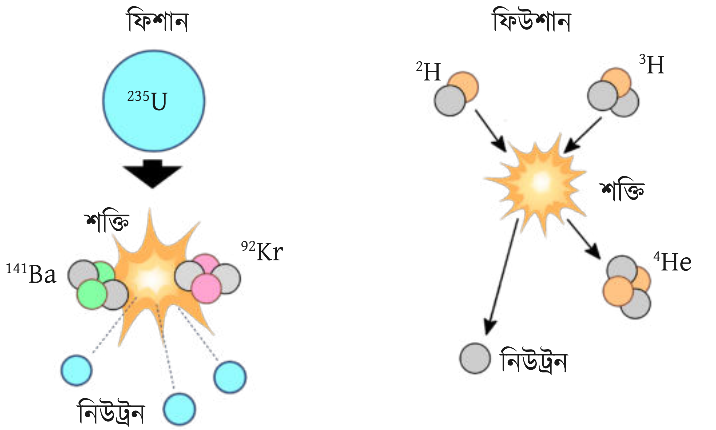

ফিশানের সময় বড়ো নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ছোটোছোটোনিউক্লিয়াস তৈরি হয়, ফিউশানে ছোটোছোটোনিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে বড়ো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়।

দুই রকম নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় শক্তি পাওয়া যায়, যার একটি হচ্ছে ফিশান অন্যটি ফিউশান। ফিশান পদ্ধতিতে একটি বড়ো নিউক্লিয়াস ভেঙে দুটি ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় যেটুকু ভর কমে যায় সেটি $E = mc^2$ হিসেবে শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। আমাদের রূপপুর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রে এই প্রক্রিয়ায় শক্তি সৃষ্টি করা হবে। ফিউশান প্রক্রিয়ায় দুইটি ছোট নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে একটি বড়ো নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং যেটুকু ভর কমে যায় সেইটুকু $E = mc^2$ হিসেবে শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। সূর্যে এই প্রক্রিয়ায় শক্তি

সৃষ্টি হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে ফিউশান প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ধারাবাহিকভাবে শক্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে সাফল্য পাওয়া গেলে পৃথিবীর শক্তির প্রয়োজন পুরোপুরি মিটে যাবে বলে আশা করা যায়।

আমরা গোড়া থেকেই শক্তির রূপান্তরের কথা বলে আসছি, কাজেই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভরকে যদি শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাহলে উল্টোটা কি সত্যি? শক্তিকে কি ভরে রূপান্তর করা যায়? তোমরা জেনে নিঃসন্দেহে চমৎকৃত হবে যে শক্তিকেও বিশেষ অবস্থায় ভরে রূপান্তর করা যায়।

2.5 ক্ষমতার (Power) ধারণা

আমাদের চারপাশে আমরা নানা ধরনের কাজ হতে দেখি, মানুষ কিংবা যন্ত্র এই কাজগুলো করে থাকে। একই কাজ করতে একেক মানুষের (কিংবা যন্ত্রের) একেক রকম সময়ের প্রয়োজন হয়। কিছু কাজ 'দ্রুত' হয়ে থাকে এবং কিছু কাজ 'ধীরে' করা হয়। দ্রুত কাজের অর্থ, কাজ করতে কম সময় লাগছে। ধীরে কাজের অর্থ, একই কাজ করতে বেশি সময় লাগছে। এর উল্টোটাও সত্যি, একই সময়ে কতটুকু কাজ হলো সেটিও পরিমাপ করে কাজ করার দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় সেজন্য কাজ করার ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য ক্ষমতা (Power) নামে একটি রাশি ব্যবহার করা হয়। মোট কাজকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলেই ক্ষমতা পাওয়া যাবে। কাজের পরিমাণই যেহেতু শক্তি, তাই শক্তি দিয়েও কাজ মাপা যায়। একক সময়ে পাওয়া শক্তির পরিমাণই হচ্ছে ক্ষমতা।

ক্ষমতা = কাজ/সময়   অথবা,   ক্ষমতা = শক্তি/সময়

ক্ষমতার একক ওয়াট (Watt) যাকে W দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বৈদ্যুতিক বাতিতে তোমরা নিশ্চয় 15 W কিংবা 30 W ইত্যাদি লেখা দেখেছ। আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতেই বিভিন্ন শক্তির রূপান্তরের কথা জেনেছি। একটি বাতিতে 15 W লেখার অর্থ, বাতিটি প্রতি সেকেন্ডে 15 J বিদ্যুৎ শক্তি গ্রহণ করে তা থেকে আলোক শক্তি দেবে। বৈদ্যুতিক বাতিতে আলোক শক্তির পাশাপাশি কিছু পরিমাণ শক্তি তাপ হিসেবে অপচয় হয়ে থাকে। ফিলামেন্টের বৈদ্যুতিক বাতির তুলনায় টিউব লাইটে কম তাপ শক্তির অপচয় হয় এবং এলইডি বৈদ্যুতিক বাতিতে তার চাইতেও কম তাপশক্তির অপচয় হয়ে থাকে।

60 ওয়াটের ফিলামেন্ট লাইট বাল্ব যে পরিমাণ আলো দেয়, 15 ওয়াটের টিউব লাইট কিংবা 6 ওয়াটের এলইডি লাইট বাল্ব প্রায় কাছাকাছি পরিমাণ আলো দেয়

অধ্যায় ৩

পরমাণুর গঠন

অধ্যায় ৩ পরমাণুর গঠন

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ পরমাণুর গঠন, পারমাণবিক সংখ্যা, ভর সংখ্যা
- ☑ পরমাণুতে ইলেকট্রনের ধারণা
- ☑ আয়ন কীভাবে গঠিত হয়
- ☑ ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের পার্থক্য
- ☑ ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের সাহায্যে রাসায়নিক সংকেত নির্ধারণ
- ☑ আইসোটোপের ধারণা ও আমাদের জীবনে আইসোটোপের গুরুত্ব

3.1 পরমাণুর গঠন

চারপাশে তোমরা যা কিছু দেখো অথবা যেগুলো দেখতে পাও না তার সবকিছুই পরমাণু (atom) নামক অতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। পরমাণু এত ক্ষুদ্রাকার এটি শুধু যে খালি চোখে দেখা যায় না তা নয়, সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে পরমাণু কীভাবে গঠিত হয় কিংবা পরমাণুতে আসলে কী থাকে? এর উত্তরে সহজ করে বলা যায় পরমাণুর দুটি অংশ : (1) পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াস ও (2) নিউক্লিয়াসের বাইরে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন। ইলেকট্রন হচ্ছে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং নিউট্রন হচ্ছে চার্জবিহীন। একটি পরমাণুতে যখন সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে, তখন তার মোট চার্জ শূন্য বলে পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ বলে। নিউট্রন ও প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের ভর থেকে প্রায় দুই হাজার গুণ বেশি, কাজেই পরমাণুর ভর মূলত তার নিউক্লিয়াসের ভর। ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর গঠন ভিন্ন হয় কারণ, তাদের প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক প্রোটন এবং ইলেকট্রন থাকে। মূলত এটাই বিভিন্ন মৌলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রদর্শনের কারণ।

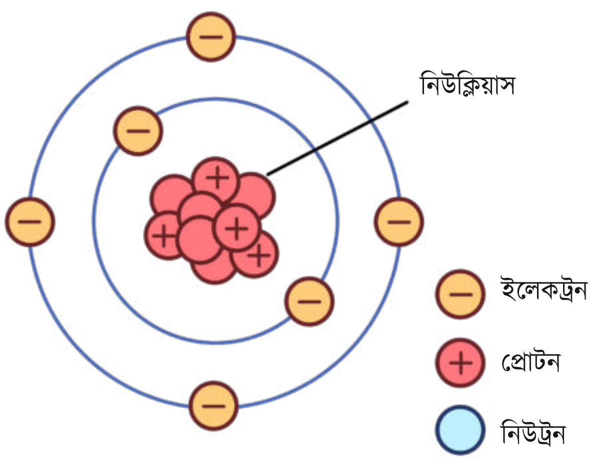

পরমাণুর গঠন

৫.1.1 পরমাণু এবং পারমাণবিক মডেলের ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ

এখন তোমরা সবাই জানো যে, প্রত্যেক পদার্থই অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। অতীতে এই ক্ষুদ্র কণা সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক তাদের বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, লিউসিপাস (Leucippus) ও ডেমোক্রিটাস (Democritus) বলেছিলেন যে প্রতিটি পদার্থই নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। তাঁদের মতে এসব কণা অবিভাজ্য, যাদেরকে পুনরায় ভাঙা যায় না। ডেমোক্রিটাস এসব ক্ষুদ্র কণার নাম দেন এটম (atom)। 'এটম' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'এটোমোস' (atomos) থেকে যারা অর্থ 'অবিভাজ্য' (indivisible)।

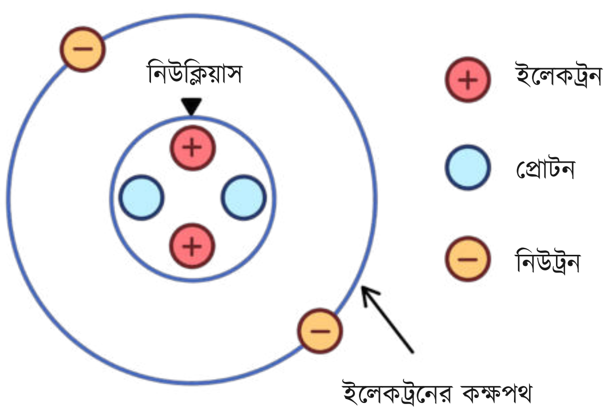

হিলিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন

তাঁর সমসাময়িক দুইজন দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটল ভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেন। এরিস্টটলের মতে, যে কোনো পদার্থই আগুন, মাটি, বাতাস ও পানি এই চারটি উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয়ে গঠিত এবং তাদেরকে ইচ্ছেমতো ভাগ করা যায়। কিন্তু তাঁরা সেই ধারণাগুলো প্রমাণের জন্য কোনোপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা বিবেচনা করেননি। 18 এবং 19 শতাব্দীতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পারমাণবিক মডেলের সাহায্যে পরমাণুর গঠন বর্ণনা করার চেষ্টা করেন। এসব মডেলের যেমন সঠিক দিক আছে আবার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, সেগুলো বর্তমান আধুনিক পারমাণবিক মডেল গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরমানবিক মডেল গঠনের পিছনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীরা হলেন জন ডাল্টন (John Dalton), জে জে থমসন (J. J. Thomson), আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) এবং নীলস বোর (Niels Bohr)।

পরীক্ষামূলক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, 1803 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন বলেছিলেন যে, 'মৌলের ক্ষুদ্রতম কণা হলো পরমাণু যাকে পুনরায় বিভাজিত করা যায়না।' আমরা এখন জানি পরমাণু পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণা নয় এবং পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণুকেও ভাগ করা যায়, পরমাণু আসলে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন নামক ছোট ছোট কণা নিয়ে গঠিত।

ডাল্টনের মডেলের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য পরবর্তী সময়ে অন্য বিজ্ঞানীরা বিকল্প মডেলের প্রস্তাব করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হলো রাদারফোর্ড এবং বোরের পরমাণু মডেল।

রাদারফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা সঠিক পরমাণবিক গঠন জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, সম্পূর্ণ ধনাত্মক চার্জ এবং ভর পরমাণুর কেন্দ্রে একটি অতি ক্ষুদ্র জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, একে নিউক্লিয়াস বলে।

তিনি আরও বলেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা এবং কেন্দ্রের ধনাত্মক চার্জের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত নগণ্য। ইলেকট্রনের এইভাবে ঘূর্ণনকে তিনি সৌরজগৎে সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলোর ঘূর্ণায়মান অবস্থার সাথে তুলনা করেন। কিন্তু রাদারফোর্ড নির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথের কথা বলেননি। পরবর্তী কালে 1913 সালে, বিজ্ঞানী বোর ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট কণাসমূহের ঘূর্ণনের নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা প্রদান করেন।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, পরমাণুকে ভাঙা যায় এবং ভাঙলে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায়। পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট প্রোটন এবং চার্জনিরপেক্ষ নিউট্রন থাকে। পরমাণুর অধিকাংশ ভরই পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে থাকে। নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ পরমাণুর ব্যাসার্ধ থেকে প্রায় লক্ষ গুণ ছোট বলে ইলেকট্রনসমূহ এবং নিউক্লিয়াসের মাঝামাঝি সমস্ত জায়গাই খালি। আসলে পরমাণুর অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা।

3.1.2 পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা

তোমরা ইতোমধ্যে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়ে গেছ তবে পরমাণুর গঠন ভালোভাবে বুঝতে হলে পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা সম্পর্কেও ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পারমাণবিক সংখ্যা

- কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা মোট প্রোটনের সংখ্যাই হলো ঐ পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যাকে ইংরেজি অক্ষর ‘Z’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণুর সমান সংখ্যক প্রোটন থাকে, ফলে পারমাণবিক সংখ্যাও একই হয়।
- ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন, এর কারণে একটি মৌল থেকে অন্য কোনো মৌলকে আলাদা করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হাইড্রোজেন পরমাণুতে শুধু একটি প্রোটন থাকায় তার পারমাণবিক সংখ্যা হলো 1। অক্সিজেন পরমাণুতে ৪টি প্রোটন থাকায় তার পারমাণবিক সংখ্যা ৪। যেহেতু প্রত্যেক পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে সুতরাং আমরা বলতে পারি, হাইড্রোজেন পরমাণুতে 1টি এবং অক্সিজেন পরমাণুতে ৪টি ইলেকট্রন রয়েছে। একটি পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা থেকে কি ঐ পরমাণুতে কয়টি নিউট্রন আছে সেটি জানা সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, না। একটি পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা থেকে সেই পরমাণুতে কয়টি নিউট্রন আছে তা জানা সম্ভব নয়। কোনো পরমাণুতে কয়টি নিউট্রন আছে সেটি জানার জন্য ঐ পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যার পাশাপাশি ভর সংখ্যা জানতে হবে।

ভর সংখ্যা

☑ কোনো পরমাণুর ভরসংখ্যা হলো ঐ পরমাণুর মোট প্রোটন ও নিউট্রনের যোগফলের সমান যাকে ইংরেজি অক্ষর 'A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কার্বন পরমাণুতে 6টি প্রোটন ও 6টি নিউট্রন রয়েছে, কাজেই কার্বনের ভরসংখ্যা A হলো 12।

☑ একই মৌলের পরমাণুসমূহের প্রোটন সংখ্যা একই থাকলেও নিউট্রন সংখ্যা আলাদা হতে পারে। অন্যদিকে, একটি ইলেকট্রনের ভর খুবই নগণ্য। কাজেই একটি পরমাণুর পারমাণবিক ভর প্রায় তার ভর সংখ্যার সমান।

☑ যেহেতু প্রোটন এবং নিউট্রন উভয়ই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে, তাই তাদেরকে একত্রে নিউক্লিয়ন বলা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, যদি কোনো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা জানা থাকে তাহলে ঐ পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা জানা যায়।

উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায় যে, কোনো একটি পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা $Z = 9$ এবং ভর সংখ্যা $A = 19$ হলে সেই পরমাণুটিতে 9টি প্রোটন এবং $19 - 9 = 10$টি নিউট্রন রয়েছে।

3.1.3 পরমাণুর প্রকাশ (Notation of Atom)

প্রত্যেকটি পরমাণুর জন্য একটি প্রতীক নির্দিষ্ট আছে, যেমন- হাইড্রোজেনের প্রতীক H, অক্সিজেনের O এবং কার্বনের C। কোনো একটি পরমাণুকে প্রকাশ করতে হলে আমাদের ঐ মৌলের প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা জানতে হবে। ভর সংখ্যাকে প্রতীকের উপরের দিকে এবং পারমাণবিক সংখ্যাকে নিচের দিকে লেখা হয়। উদাহরণ হিসেবে কার্বনের প্রকাশ দেখানো হলো :

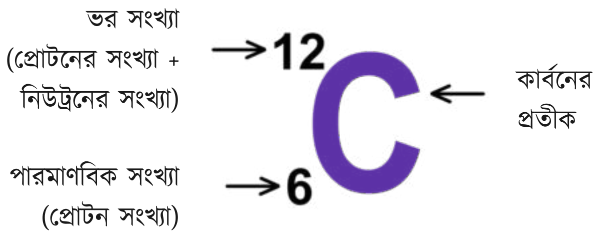

কার্বন পরমাণুর প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা

3.2 আইসোটোপ

ইতোমধ্যে তোমরা জেনে গেছ যে, কোনো একটা মৌলের পরমাণুর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে কিন্তু ঐ মৌলের বিভিন্ন পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকতে পারে বলে ভর

সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায়, প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন এবং একটি প্রোটন থাকে এবং অধিকাংশ হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনো নিউট্রন নেই। কিন্তু কিছু হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রনও থাকে যার কারণে তাদের ভর সংখ্যা হয় 2। শুধু তাই নয়, কিছু সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি পরমাণুর সঙ্গে দুইটি নিউট্রনও থাকে কাজেই তাদের ভরসংখ্যা হয় 3। সুতরাং, হাইড্রোজেন পরমাণুর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যা হওয়া সম্ভব। যে মৌলের পরমাণুতে একই সংখ্যক প্রোটন কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে সেই মৌলের আইসোটোপ বলে। তাই হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ আছে। যদিও সাধারণত একটি পরমাণুর আইসোটোপের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয় না, তাদের ভিন্ন ভর সংখ্যা দিয়ে আলাদা করা হয় কিন্তু হাইড্রোজেনের বেলায় তার অন্য দুটি আইসোটোপের জন্য ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম এই দুইটি ভিন্ন নাম প্রচলিত। একইভাবে,

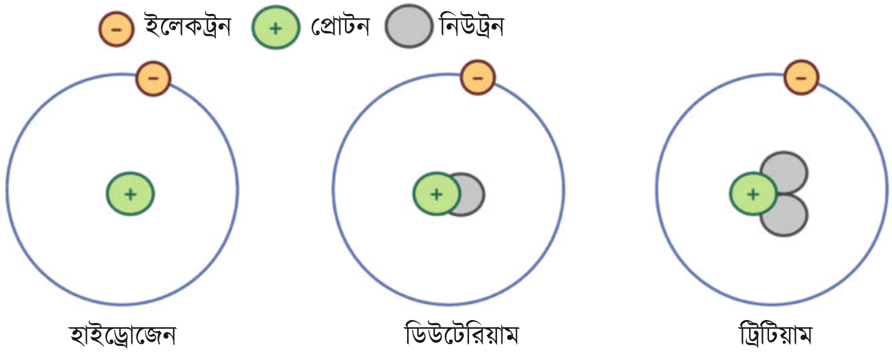

হাইড্রোজেনের আইসোটোপ

অধিকাংশ কার্বন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 6টি প্রোটন ও 6টি নিউট্রন রয়েছে। কিন্তু, কিছুসংখ্যক কার্বন পরমাণুতে 7 অথবা 8টি নিউট্রন থাকে। সুতরাং, কার্বনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভরসংখ্যা (12, 13 এবং 14) হওয়া সম্ভব। এভাবে, কার্বন-12, কার্বন-13 এবং কার্বন-14 হলো কার্বনের তিনটি আইসোটোপ।

3.2.1 আইসোটোপের ধর্ম ও তাদের কিছু ব্যবহার

কোনো মৌলের আইসোটোপের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে :

(ক) কোনো নির্দিষ্ট মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে, তাই তাদের সবকটিতে ইলেকট্রনের বিন্যাস এক হয়। মূলত, ইলেকট্রন বিন্যাসই কোনো মৌলের সব ধরনের বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক ধর্মের জন্য দায়ী, সেজন্য বিভিন্ন আইসোটোপের রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক ধর্মে কোনো পার্থক্য থাকে না। তারপরও আইসোটোপের ভর আলাদা হওয়ায় তাদের একটি থেকে আরেকটি আলাদা করা যায়।

(খ) আইসোটোপের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যার ভিন্নতা থাকায় তাদের ভৌত ধর্ম একটু আলাদা হয়।

মৌলের যে আইসোটোপটি অন্যগুলোর তুলনায় বেশি স্থিতিশীল সেটিকে প্রকৃতিতে বেশি পরিমাণে

পাওয়া যায়। অস্থিতিশীল আইসোটোপগুলো তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ধরনের আলোকরশ্মি ও কণা বিকিরণ করে থাকে। তাদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে। এইসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে আইসোটোপের কিছু ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অসুস্থতা ও রোগ নির্ণয় এবং তাদের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহার রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু ব্যবহার নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ নির্ণয়ে আয়োডিন-131 আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(খ) টেকনিশিয়াম-99 আইসোটোপ ব্যবহার করেও থাইরয়েড ফাংশন পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(গ) সরু ধমনিতে কোনো সমস্যা থাকলে ধমনিতে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায়। ঠিক একইভাবে, ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাঠিয়ে আক্রান্ত কোষের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করার কাজেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(ঘ) চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণ করার কাজে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ ব্যবহার করা হয়।

কৃষিকাজে ব্যবহার

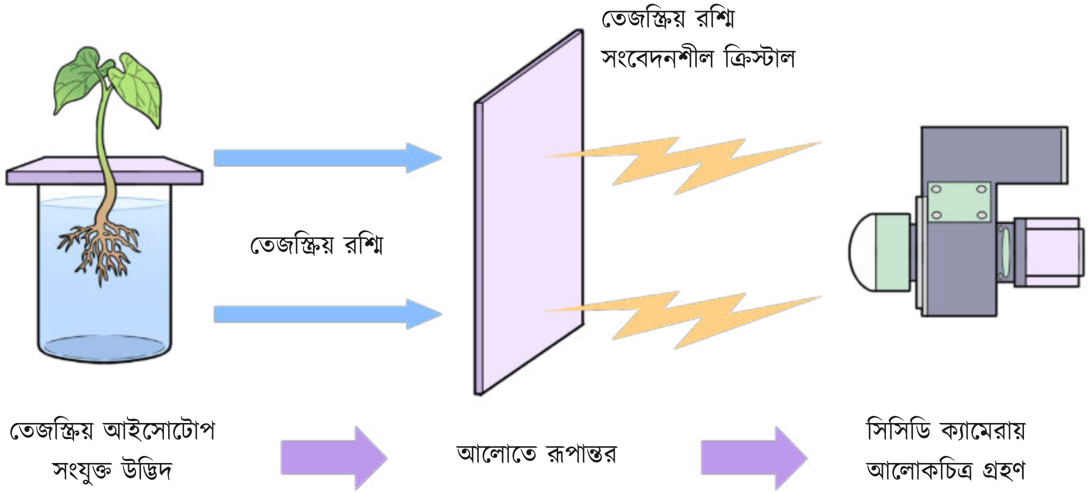

কৃষিতে আইসোটোপের ব্যবহার

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কৃষিক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো :

(ক) আইসোটোপ থেকে বিকিরণ পোকামাকড় ও পরজীবী নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা হয়।

(খ) তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আইসোটোপের সাহায্যে কোন ফসলের জন্য কোন ধরনের সার এবং কি পরিমাণ সার প্রয়োজন তা নির্ণয় করা যায়।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে আইসোটোপের ব্যবহার

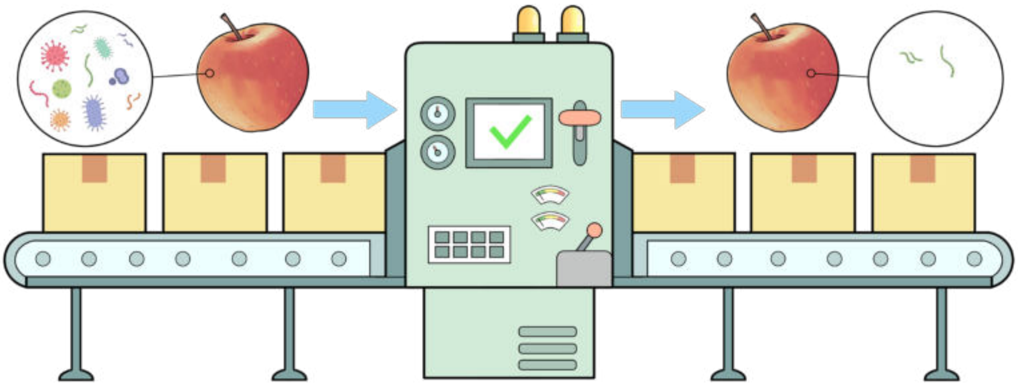

ব্যাকটেরিয়া-মুক্ত খাবারের জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার

ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্নরকম জীবাণুকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরণের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যার ফলে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে খাদ্য ও ফল জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যবহার

তোমরা প্রায়ই খবর শুনে থাক যে, কয়েক কোটি বছরের পুরোনো জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কীভাবে এসব জীবাশ্মের বয়স জানতে পারেন? এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে। স্থিতিশীল ও অস্থিতিশীল আইসোটোপের অনুপাত থেকে জীবাশ্মটির বয়স কত তা বের করা সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ তৈরির কাজে ব্যবহার

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরিতে পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম-235 ব্যবহার করা হয়। ইউরেনিয়াম-235 এর ভারী নিউক্লিয়াসে যখন ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয়, তখন সেটি ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট নিউক্লিয়াস তৈরির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি তৈরি করে। এই তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি।

নির্মিয়মান রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে নির্মাণ করা হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দুই হাজার চারশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

3.2.2 তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ক্ষতিকর প্রভাব

তোমরা ইতোমধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অনেকগুলো ব্যবহার সম্পর্কে জেনে গেছ। এর সঙ্গে সঙ্গে এসব আইসোটোপ আমাদের বড়ো ধরনের ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরিত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি আমাদের জিনগত পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পারামাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তাতে তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে এবং পরবর্তী সময়ে তেজস্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি জটিলতায় অনেক লোক মারা যায়। 1986 সালে রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া চেরনোবিল দুর্ঘটনায়ও অনেক মানুষ মারা যায় এবং স্থানীয় পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

3.3 পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম

নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের কাল্পনিক স্তরগুলোকে কক্ষপথ বা অরবিট বলে। এইসব কক্ষপথ বা অরবিট নিউক্লিয়াস থেকে বাইরের দিকে বিস্তৃত থাকে। একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট অরবিট থাকে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, একটি অরবিটে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে? তাদের বিন্যাসের নিয়মই-বা কী? আমরা পরবর্তী সময়ে এই বিষয়গুলো আরও অনেক বিস্তৃতভাবে জানব, আপাতত কয়েকটি সহজ নিয়ম জেনে নিই।

নিয়মসমূহ

1) একটি কক্ষপথে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা হলো $2n^2$ (যেখানে, n= 1, 2, 3, 4...... হলো কক্ষপথের ধারাবাহিক সংখ্যা। (সংশ্লিষ্ট কক্ষপথগুলো সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে K, L, M, N.. নামেও পরিচিত)। কাজেই আমরা কয়েকটি কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা বের করে দেখতে পারি:

1ম কক্ষপথ : n=1 কাজেই $2n^2 = 2(1)^2 = 2\times1 = 2$; অর্থাৎ সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন থাকতে পারে

2য় কক্ষপথ : n=2 মাজেই $2n^2 = 2(2)^2 = 2\times4 = 8$; অর্থাৎ সর্বোচ্চ 8টি ইলেকট্রন থাকতে পারে

3য় কক্ষপথ : n=3 কাজেই $2n^2 = 2(3)^2 = 2\times9 = 18$; অর্থাৎ সর্বোচ্চ 18টি ইলেকট্রন থাকতে পারে

2) পূর্ববর্তী কক্ষপথ সম্পূর্ণভাবে পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন অরবিট বা কক্ষপথ শুরু হতে পারে না।

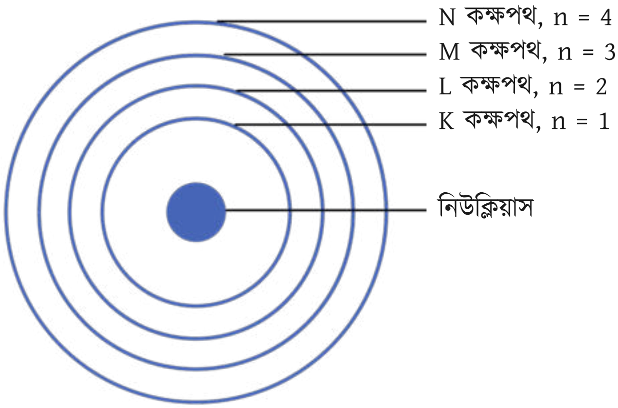

একটি পরমাণুর মধ্যে বিভিন্ন কক্ষপথ বা শক্তি স্তর

উল্লেখ্য যে, এসব কক্ষপথকে শক্তি স্তর বলা হয়, কারণ প্রতিটি কক্ষপথে থাকা ইলেকট্রনের জন্য একটি নির্দিষ্ট শক্তি রয়েছে। পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্যে নিচের উদাহরণ দুটি লক্ষ করতে পারো।

লিথিয়াম পরমাণুতে 3টি ইলেকট্রন আছে। তাদের মধ্যে দুটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে এবং তৃতীয় ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে যা পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে। ঠিক একইভাবে, কার্বন পরমাণুতে 6টি ইলেকট্রন থাকায় এদের মধ্যে 2টি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে এবং বাকি 4টি দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে।

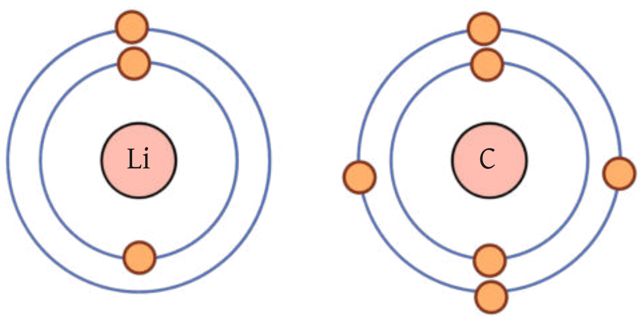

লিথিয়াম (Li) এবং কার্বন (C) পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস

এবার সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখা যাক। সোডিয়াম পরমাণুতে 11টি ইলেকট্রন রয়েছে। তোমরা খুব সহজেই বের করতে পারবে যে সোডিয়ামের ইলেকট্রনগুলো 3টি কক্ষপথে থাকবে এবং এর ইলেকট্রনবিন্যাসকে কক্ষপথের পর্যায়ক্রমে এভাবে প্রকাশ করা যায় : (2, 8, 1)। অর্থাৎ, প্রথম কক্ষপথে 2টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে 8টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে 1টি।

আরও কিছু মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস, পারমাণবিক সংখ্যা, এবং প্রতীকসহ নিচের ছকে বামপাশে দেখানো হয়েছে। উদাহরণগুলো দেখে ছকের ডানপাশে দেখানো মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন হবে সেটি লেখো।

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	প্রতীক	ইলেকট্রন বিন্যাস
হিলিয়াম	2	He	2
নাইট্রো-জেন	7	N	2, 5
অক্সি-জেন	8	O	2, 6
ক্লোরিন	17	Cl	2 , 8, 7

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	প্রতীক	ইলেকট্রন বিন্যাস
হাইড্রো-জেন	1	H	
বোরন	5	B	
সালফার	16	S	
আর্গন	18	Ar	

3.3.1 মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস ও তাদের ধর্ম

তোমরা ইতোমধ্যে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা, প্রতীক এবং ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছ। মৌলিক পদার্থের ধর্ম মূলত তাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিন্নতার কারণেই পরমাণুগুলো সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়, ধাতব, অধাতব, পরিবাহী, অপরিবাহী এরকম ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের হয়ে থাকে।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, যদি সর্বশেষ কক্ষপথে ধারণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ইলেকট্রন থাকে তাহলে কক্ষপথটিকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ বলা হয় এবং এই ধরনের পরমাণুগুলো নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন- হিলিয়াম পরমাণুতে 2টি ইলেকট্রন রয়েছে, এই দুটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে অবস্থান করে। প্রথম কক্ষপথে যেহেতু সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন থাকতে পারে তাই হিলিয়াম পরামানু নিষ্ক্রিয়। একইভাবে নিয়ন (Ne-10) গ্যাসের বেলায় সর্বশেষ কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন তার দ্বিতীয় কক্ষপথ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেছে বলে এই গ্যাসটিও নিষ্ক্রিয়।

3.4 আয়ন সৃষ্টি (Formation of ions)

কখনো কখনো একটি পরমাণু তার সর্বশেষ কক্ষপথের এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগ করে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। যেসব পরমাণু ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারা আর চার্জ নিরপেক্ষ না থেকে ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয়। আবার যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা ঋণাত্মক বা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয়। এসব চার্জযুক্ত

পরমাণুকে আয়ন বলা হয়।

যখন কোনো পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে, তখন সেটি ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। এই ধরনের আয়নকে ক্যাটায়ন বলে। .উদাহরণ হিসেবে সোডিয়াম পরমাণুর কথা বিবেচনা করা যাক। সোডিয়ামের প্রথম শক্তিস্তরে 2টি ইলেকট্রন, দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৪টি ও সর্বশেষ তৃতীয় শক্তিস্তরে 1টি ইলেকট্রন থাকে। সোডিয়াম পরমাণু যদি তার তৃতীয় শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে 2য় শক্তিস্তরটি সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে পরিণত হয় যেটি ৪টি ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ। এভাবে সোডিয়াম তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের মতো স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। যখন অন্য কোনো পরমাণু যেগুলোর ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে, সোডিয়াম পরমাণুর সংস্পর্শে আসে, তখন সোডিয়াম খুব সহজেই তার তৃতীয় শক্তিস্তর থেকে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে।

আবার যখন কোনো পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে, তখন সেটি ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জযুক্ত আয়নে পরিণত হয়, এই ধরনের আয়নকে অ্যানায়ন বলে। পারমাণবিক সংখ্যা 9 বিশিষ্ট ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো 2, 7। ফ্লোরিন স্থিতিশীল নয়, স্থিতিশীলতার জন্য এটির বহিঃস্থ স্তরে ৪টি ইলেকট্রন দরকার। দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রনের জন্যে এটি তার বহিঃস্থ স্তরের 7টি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে অথবা কোথাও থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। শক্তির বিবেচনায়, দ্বিতীয় শক্তিস্তরে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করা 7টি ইলেকট্রন ত্যাগ করার চেয়ে অনেক বেশি সহজ। সোডিয়াম পরমাণুর সংস্পর্শে এটি খুব সহজেই একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ফ্লোরিন পরমাণুটি ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জযুক্ত আয়নে পরিণত হয়, যাকে অ্যানায়ন বলে।

এভাবেই ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগের মাধ্যমে পরমাণুসমূহ আয়নে পরিণত হয়। বিপরীত চার্জবিশিষ্ট ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যকার আকর্ষণ বলের কারণে রাসায়নিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এভাবেই 2টি ভিন্ন মৌলের পরমাণু থেকে যৌগ তৈরি হয় যেগুলো সম্পর্কে তোমরা তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে বিস্তারিত জানতে পারবে। নিচে সোডিয়াম ফ্লোরাইড তৈরির উদাহরণটি দেখানো হলো। প্রথমে সোডিয়াম (Na) পরমাণু একটি ইলেকট্রন (e^-) ত্যাগ করে ক্যাটায়নে (Na^+) পরিণত হয়েছে। সেই ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে ফ্লোরিন অ্যানায়নে (F^-) পরিণত হয়েছে, তখন সোডিয়াম ক্যাটায়ন (Na^+) ফ্লোরিন অ্যানায়নের (F^-) সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ফ্লোরাইড (Na^+F^- অথবা NaF) যৌগে পরিণত হয়েছে।

$$Na \longrightarrow Na^+ + e^-$$

$$F + e^- \longrightarrow F^-$$

$$Na + F \longrightarrow Na^+F^- \text{ অথবা } NaF$$

সোডিয়াম ফ্লোরাইড একটি প্রয়োজনীয় যৌগ, দাঁতের ক্ষয় রোধ করার জন্য এটি পানিতে এবং টুথপেস্টে ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৩.৫.1 ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের সাহায্যে যৌগের রাসায়নিক সংকেত লিখার নিয়ম

যদি তোমরা সোডিয়াম ফ্লোরাইডের মতো অন্য কোনো আয়নিক যৌগের নাম জানো তাহলে তার রাসায়নিক সংকেতও লিখতে পারবে। প্রথমে যৌগটির অন্তর্ভুক্ত মৌলদুটিকে অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়নে বিভক্ত করতে হবে। সেজন্য তোমাকে জানতে হবে কাছাকাছি পূর্ণ কক্ষপথ করার জন্য কয়টি ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে ক্যাটায়ন হতে পারে অথবা কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন হতে পারে। তারপর আয়নদুটিকে তার চার্জসহ লিখে, কোন আয়নটি কয়টি করে নিলে পুরো যৌগটি চার্জ-নিরপেক্ষ হবে সেটি নির্ধারণ করা হয়। নিচে দুইটি উদাহরণ দেখানো হলো।

লিথিয়াম অক্সাইড

লিথিয়াম (Li-3) ও অক্সিজেন (O-8) মিলে লিথিয়াম অক্সাইড যৌগ তৈরি হয়। লিথিয়াম একটি ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে সর্বশেষ $n = 1$ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে পারে। কাজেই তার ক্যাটায়ন হচ্ছে Li^+ অন্যদিকে অক্সিজেন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার সর্বশেষ $n = 2$ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে পারে কাজেই তার অ্যানায়ন O^{2-}।

তাহলে দুইটি লিথিয়াম পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে চার্জ-নিরপেক্ষ লিথিয়াম অক্সাইড Li_2O যৌগ তৈরি হয়।

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

ম্যাগনেসিয়াম (Mg-12) ও অক্সিজেন (O-8) মিলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যৌগ তৈরি হয়। ম্যাগনেসিয়াম দুইটি ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে সর্বশেষ $n = 2$ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে পারে। কাজেই তার ক্যাটায়ন হচ্ছে Mg^{2+} অন্যদিকে অক্সিজেন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার সর্বশেষ $n = 2$ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে পারে কাজেই তার অ্যানায়ন O^{2-}।

তাহলে একটি ম্যাগনেসিয়াম পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে চার্জ-নিরপেক্ষ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড MgO যৌগ তৈরি হয়।

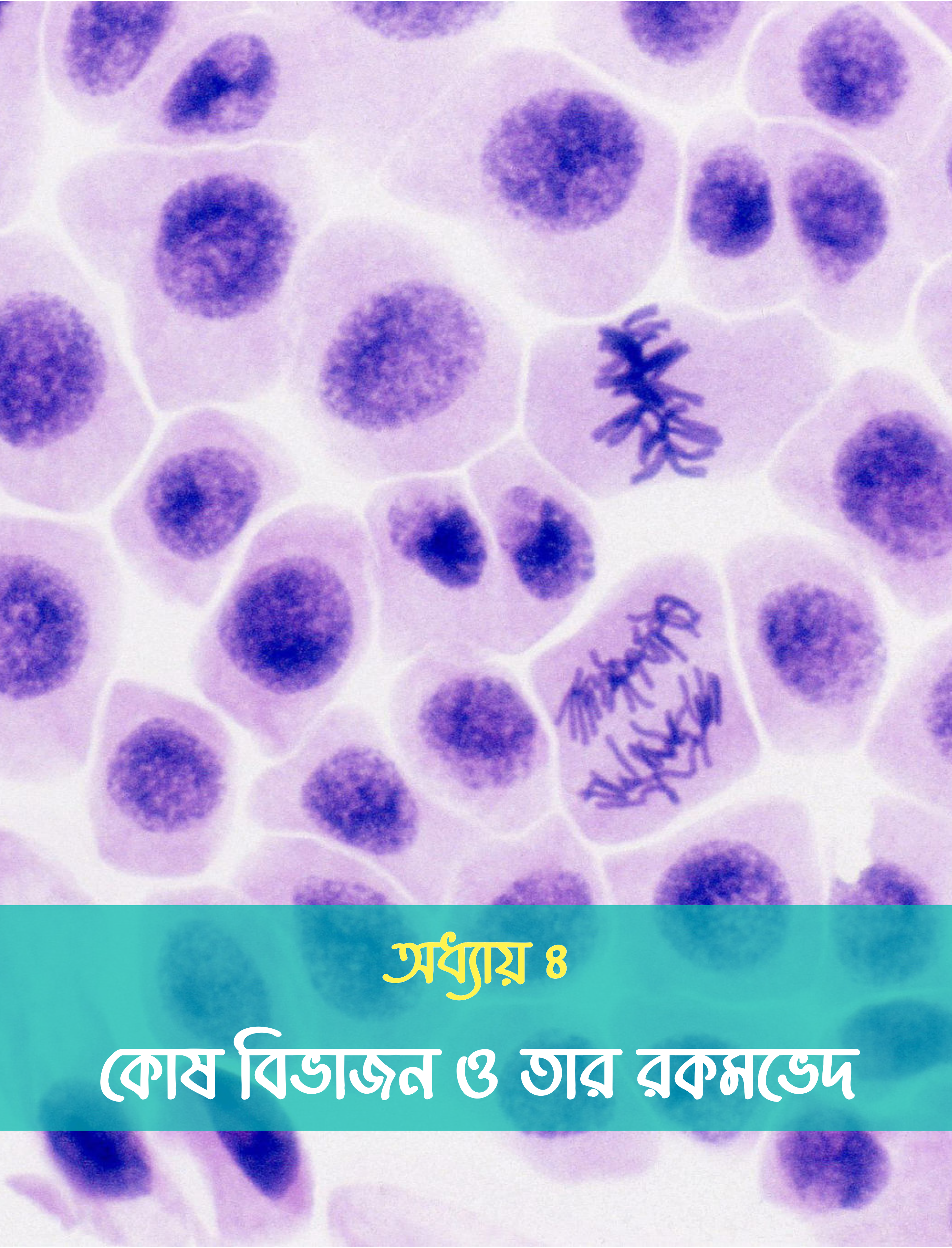

অধ্যায় ৪

কোষ বিভাজন ও তার রকমভেদ

অধ্যায় ৪ কোষ বিভাজন ও তার রকমভেদ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ কোষ বিভাজন কী ও তার রকমভেদ
- ☑ মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন ও কোষচক্র
- ☑ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ
- ☑ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব
- ☑ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ধাপসূমহ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ
- ☑ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব
- ☑ অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন ও তার ফলাফল
- ☑ কোষ বিভাজন ও ডিএনএ'র অপরিবর্তনীয় প্রবাহ
- ☑ বংশগতি নির্ধারণে ডিএনএ'র ভূমিকা

কোষ হলো জীবদেহের গঠনগত একক। জীবদেহ ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা, প্লাজমিডিয়াম এগুলোর মতো এককোষী হতে পারে আবার মানুষ, বটগাছ, তিমি এগুলোর মতো বহুকোষী হতে পারে। এককোষী জীব ছাড়া অন্য সকল জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি হয়। প্রতিটি জীব কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তাদের বংশবৃদ্ধি ও কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় একটি থেকে একাধিক কোষ তৈরি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে। কোষ বিভাজন একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে অসংখ্য কোষ তৈরির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। আদি এককোষী জীব সাধারণত যে প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় তাকে আম্যাইটোসিস বলা হয়। বহুকোষী জীব যে দুটি প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় সেগুলো হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিয়োসিস।

কোষ বিভাজনের গুরুত্ব

জীবদেহের দৈহিকবৃদ্ধি, জনন ও পরিস্ফুটনের জন্য কোষ বিভাজন প্রয়োজন। সকল প্রকার কোষ তার পূর্ববর্তী কোষ থেকে বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। জীবদেহ আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সারিয়ে নিতেও কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার জননকোষে কোষ বিভাজন জীবদেহের বংশবৃদ্ধির জন্য অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অপত্য (নতুন) কোষ তৈরি হয়, যা জীবের অভিযোজন, অভিব্যক্তি ও বংশপরম্পরা অব্যাহত রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোষের গঠন

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের গঠন সম্পর্কে পড়েছ। তোমরা তখন দেখেছ যে কোষ ঝিল্লি দিয়ে আবৃত কোষের মূল দুটি উপাদান হচ্ছে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। কোষের কেন্দ্রে ঘন অস্বচ্ছ অঙ্গাণুটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষ ঝিল্লি দিয়ে আবৃত বাকি অংশটি সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসটি নিউক্লিয়ার ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে এবং তার ভেতরে রয়েছে জীবের বংশগতি পদার্থ ডিএনএ দিয়ে তৈরি ক্রোমোজোম। সাধারণ অবস্থায় দীর্ঘ ক্রোমোজোম হিস্টোন নামে প্রোটিন কণার উপর পেঁচিয়ে ক্রোমাটিন হিসেবে উন্মুক্ত জালিকার মতো থাকে বলে এটি আলাদাভাবে বোঝা যায় না। শুধু কোষ বিভাজনের সময় এটি কুণ্ডলী পাকিয়ে সংকুচিত হয় বলে তখন এটি দৃশ্যমান হয়।

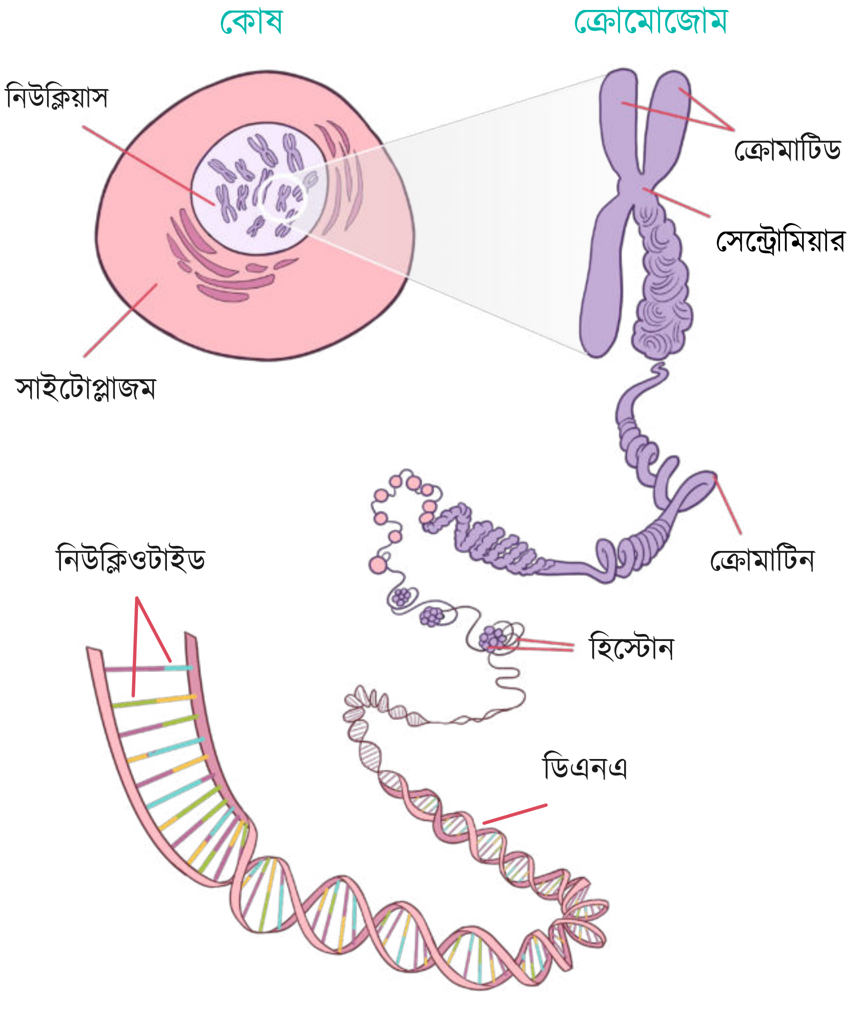

ক্রোমোজোমের গঠন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৫.1 এককোষী জীবদেহের কোষ বিভাজন : অ্যাম্যাইটোসিস (amitosis)

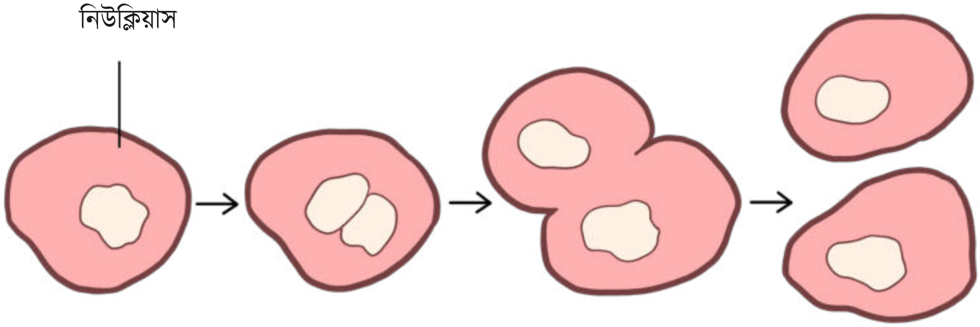

আম্যাইটোসিস কোষ বিভাজন

এককোষী আদিকোষী জীবগুলো সরাসরি বিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকে, এই প্রক্রিয়াটি আম্যাইটোসিস বা বাইনারি ফিশান নামে পরিচিত। অ্যামিবা, ব্যাকটেরিয়া কিংবা নীলাভ সবুজ শৈবাল জাতীয় আদিকোষী জীবে এ ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়। এককোষী জীবের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কার্যকর, বিভাজনের জন্য কোষের বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না এবং এই পদ্ধতিতে দ্রুত কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আম্যাইটোসিস ধরনের কোষ বিভাজনে কোষটি পরিপক্ক হলে প্রথমে নিউক্লিয়াসের ভেতর ক্রোমোজমের ডিএনএ'র প্রতিলিপন হয়। কোষের নিউক্লিয়াসটির আকৃতি পরিবর্তন হয়ে ডাম্বেলের আকৃতি ধারণ করে এবং প্রায় মাঝ বরাবর সংকুচিত হতে শুরু করে। সংকোচন শেষে মাতৃকোষের মূল দীর্ঘাকৃতির নিউক্লিয়াসটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভাজিত দুইটি নিউক্লিয়াসে ডিএনএ সুনির্দিষ্ট এবং সমানভাবে বিভক্ত হওয়া পুরোপুরি নিশ্চিত নয়, কাজেই দুটি ভিন্ন হতে পারে। নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজমও মাঝ বরাবর সংকুচিত হতে হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ তৈরি করে, তাই একে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।

৫.২ বহুকোষী জীবদেহের কোষ বিভাজন

আমরা বহুকোষী প্রাণী। আমাদের শরীরে রয়েছে প্রায় এক ট্রিলিয়ন কোষ। আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের কোষ রয়েছে, যেমন- রক্তের কোষ, পেশি কোষ, ত্বকের কোষ, পাকস্থলীর কোষ ইত্যাদি। প্রতিটি ভিন্ন ধরনের কোষের নিজস্ব গঠন এবং কাজ রয়েছে। এইসব কোষ এসেছে স্টেম সেল বা স্টেম কোষ নামক এক বিশেষ ধরনের কোষ থেকে। সকল প্রাণীর ও উদ্ভিদের স্টেম কোষ প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে বিকশিত না হওয়া প্রাণীকে ভ্রূণ বলে, ভ্রূণে স্টেম কোষগুলো বিভিন্ন ধরনের কোষে বিকশিত হতে পারে।

সমস্ত স্টেম কোষের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে: স্টেম কোষ বিভক্ত হয়ে আরও স্টেম কোষ তৈরি করে। স্টেম কোষের বিভিন্ন ধরনের কোষে বিকশিত হওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। একটি স্টেম কোষ দুটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয়, প্রতিটি অপত্য কোষ হুবহু মূল কোষের মতো। পরিপক্ব হলে, এই কোষগুলোও বিভাজিত হয়। এভাবেই ভ্রূণে স্টেম কোষের সরবরাহ নিশ্চিত হয়। একটি ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং তার অঙ্গগুলোর বিকাশের জন্য প্রচুর স্টেম সেল প্রয়োজন। গবেষণাগারে, কয়েকটি স্টেম সেল দিয়ে শুরু করে, কয়েক মাসের মধ্যে বিজ্ঞানীরা লক্ষ লক্ষ কোষ তৈরি করতে সক্ষম করেছেন। কীভাবে স্টেম কোষ অন্য ধরনের কোষে পরিবর্তিত হয় বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন।

এই পর্যায়ে আমরা বহুকোষী জীবদেহের কোষ বিভাজন সম্পর্কে জানব।

বহুকোষী জীবদেহের দেহকোষ যে প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় তাকে মাইটোসিস বলে, আবার যৌন জননকারী জীবের জনন মাতৃকোষ যে প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় তাকে মিয়োসিস বলে। উদ্ভিদদেহের মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ, ভ্রূণমুকুল, ভ্রূণমূল ও পাতা ইত্যাদি বর্ধনশীল অঞ্চলের টিস্যুতে মাইটোসিস ঘটে, আবার সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজিত হয়।

কোষচক্র

যে কোষ থেকে কোষ বিভাজন শুরু হয় তাকে মাতৃকোষ বলে এবং যে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় তাকে অপত্য বা কন্যা কোষ বলা হয়ে থাকে। যে চক্রের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তী সময়ে বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষচক্র বলে। কোষচক্র দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত, বিভাজনরত অবস্থাকে বলা হয় মাইটোসিস পর্যায় (M phase) এবং বিভাজনের পূর্ববর্তী প্রস্তুতি অবস্থাকে বলা হয় ইন্টারফেজ (Interphase) পর্যায়। কোষচক্রের প্রায় 90-95% সময় ব্যয় হয় ইন্টারফেজ পর্যায়ে এবং বাকি 5-10% সময় ব্যয় হয় মাইটোসিস পর্যায়ে। ইন্টারফেজ পর্যায় আবার G1 (Gap 1), S (Synthesis) এবং G2 (Gap 2) এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। একটি কোষ বিভাজনের পর পরের কোষ বিভাজনের চক্রটি শুরু করার জন্য G1 হচ্ছে প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে কোষের আকার বৃদ্ধি পায় এবং কোষটি তার চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে আবার কোষ বিভাজন করবে কি না সেটি নির্ধারণ করে। কোষ বিভাজনের প্রয়োজন না থাকলে কোষটি বিভাজনের প্রস্তুতি না নিয়ে 'বিশ্রাম পর্যায়ে' গিয়ে

সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। পরবর্তী S পর্যায় হচ্ছে প্রতিলিপন পর্যায়, এই পর্যায়ে ডিএনএ প্রতিলিপন হয়ে প্রতিটি ক্রোমোজমের একটি অবিকল প্রতিলিপি তৈরি হয়। এর পরের G2 পর্যায়ে ডিএনএ প্রতিলিপনে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করা হয়। এটি মাইটোসিস প্রক্রিয়া শুরু করার আগের পর্যায়। এই পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজমের সঙ্গে তার হুবহু প্রতিলিপি সেন্ট্রোমিয়ারে সংযুক্ত থাকে এবং তাদেরকে ক্রোমাটিড বলা হয়। G2 পর্যায় শেষ হওয়ার পর মাইটোসিস নামে প্রকৃত কোষ বিভাজন শুরু হয়।

কোষচক্র

কীভাবে এই কোষচক্রটি নিয়ন্ত্রিত হয় সেটি জেনে নেয়া দরকার, কারণ যদি কোষচক্র নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ঘটে, তবে কোষগুলো প্রস্তুত হওয়ার আগেই এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে চলে যেতে পারে। সেটি কোষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কোষচক্রের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হলে ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগ হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কোষচক্রটি নিয়ন্ত্রিত হয় কীভাবে, অর্থাৎ কীভাবে কোষ জানতে পারে কখন বৃদ্ধি পেতে হবে, কখন ডিএনএ'র প্রতিলিপন হতে হবে কিংবা কখন বিভক্ত হতে হবে। কোষচক্র প্রধানত কিছু নিয়ন্ত্রক প্রোটিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইসব প্রোটিন কোষটি এগিয়ে যাওয়ার আগে পূর্ববর্তী পর্বটি সম্পূর্ণ হয়েছে কি না সেটি নিশ্চিত করে এবং চক্রের পরবর্তী পর্ব শুরু বা বিলম্বিত করার জন্য কোষকে সংকেত দিয়ে চক্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৫.2.1 মাইটোসিস

বহুকোষী জীবদেহ গঠনের জন্য একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ তৈরির প্রক্রিয়াকে মাইটোসিস বলে। এ প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতরের সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজম উভয়ই সমানভাবে বিভক্ত হয় এবং ক্রোমোজমের সংখ্যা ও গুণাগুণ মাতৃকোষের অনুরূপ হয়, অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন দেহকোষ বিভাজিত হয়ে হুবহু মাতৃকোষের অনুরূপ দুটি অপত্য কোষ তৈরি করে। এই বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবের দেহকোষে হয়ে থাকে এবং বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণী ও উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পায়।

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে আদি-এককোষী জীবে মাইটোসিস হয় না।এছাড়াও বহুকোষী জীবের জনন মাতৃকোষ, প্রাণীর স্নায়ুকোষ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুর কোষে মাইটোসিস বিভাজন দেখা যায় না।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ

মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। এই বিভাজন সাধারণত কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোষচক্র পড়ার সময় তোমরা জেনেছ মাইটোসিস প্রক্রিয়া শুরু করার আগে প্রস্তুতি হিসেবে ইন্টারফেজ পর্যায়ে কোষের প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটি করে প্রতিলিপি তৈরি হয়। মাইটোসিস প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হচ্ছে :

(ক) প্রোফেজ: মাইটোসিসের প্রথম ধাপ হলো প্রোফেজ, এই ধাপে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড়ো হয়, এই ধাপের শুরুতে কোষের প্রতিটি ক্রোমোজোমের সঙ্গে তার প্রতিলিপি সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত থাকে এবং যেগুলোকে ক্রোমাটিড বলা হয়। এই পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের দুই মেরুতে তন্তুযুক্ত স্পিন্ডল যন্ত্র (Spindle apparatus) গঠিত হতে শুরু করে। এদিকে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ক্রোমাটিডগুলো ক্রমাগত স্প্রিঙয়ের ন্যায় কুণ্ডলিত হয়ে খাটো ও মোটা হতে থাকে। এই পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ক্রমাগত বিলুপ্ত হতে থাকে।

(খ) মেটাফেজ : এ পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে নির্মিত দুই মেরুবিশিষ্ট তন্তুযুক্ত স্পিন্ডল যন্ত্রের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় (বিষুবীয় অঞ্চলে) ক্রোমোজমগুলো বিন্যস্ত হয়। প্রতিটি ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং ক্রোমাটিড বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে। এ পর্যায়েই ক্রোমোজমগুলোকে সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়। এ পর্যায়ের শেষদিকে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন ঘটে দুটি অপত্য সেন্ট্রোমিয়ার সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(গ) অ্যানাফেজ : কোষ বিভাজনের এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হওয়ার ফলে ক্রোমাটিড দুটি আলাদা হয়ে পড়ে। ক্রোমাটিড দুইটিকে অপত্য ক্রোমোজম বলে এবং দুটিতেই একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত থাকে। অপত্য ক্রোমোজমদুটি কোষের মধ্যবর্তী বা বিষুবীয় অঞ্চল থেকে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে থাকে। মেরুর দিকে যাওয়ার সময় অপত্য ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী থাকে এবং ক্রোমাটিড বাহুগুলো তাদের পেছন দিকে থাকে। এ পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। অপত্য ক্রোমোজমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌঁছালেই এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

(ঘ) টেলোফেজ : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায় হলো টেলোফেজ। এই পর্যায়ে অপত্য ক্রোমোজমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌঁছায়। ক্রোমোজমগুলো ধীরে ধীরে আবার সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে। নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের পুনরাবির্ভাব ঘটে, যার ফলে দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। স্পিন্ডলযন্ত্রের কাঠামো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে থাকে এবং সবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(ঙ) সাইটোকাইনেসিস : যে প্রক্রিয়ায় বিভাজনরত কোষের সাইটোপ্লাজম দুভাগে বিভক্ত হয় তাকে সাইটোকাইনেসিস বলে। এই পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কোষের মধ্যবর্তী অংশে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের উভয়পাশ থেকে দুটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। এ খাঁজ ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে মিলিত হয়ে দু'টি কোষে বিভক্ত হয়। সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুসমূহের সমবন্টন ঘটার ফলে দুটি পরিপূর্ণ অপত্য কোষ (daughter cell) সৃষ্টি হয়।

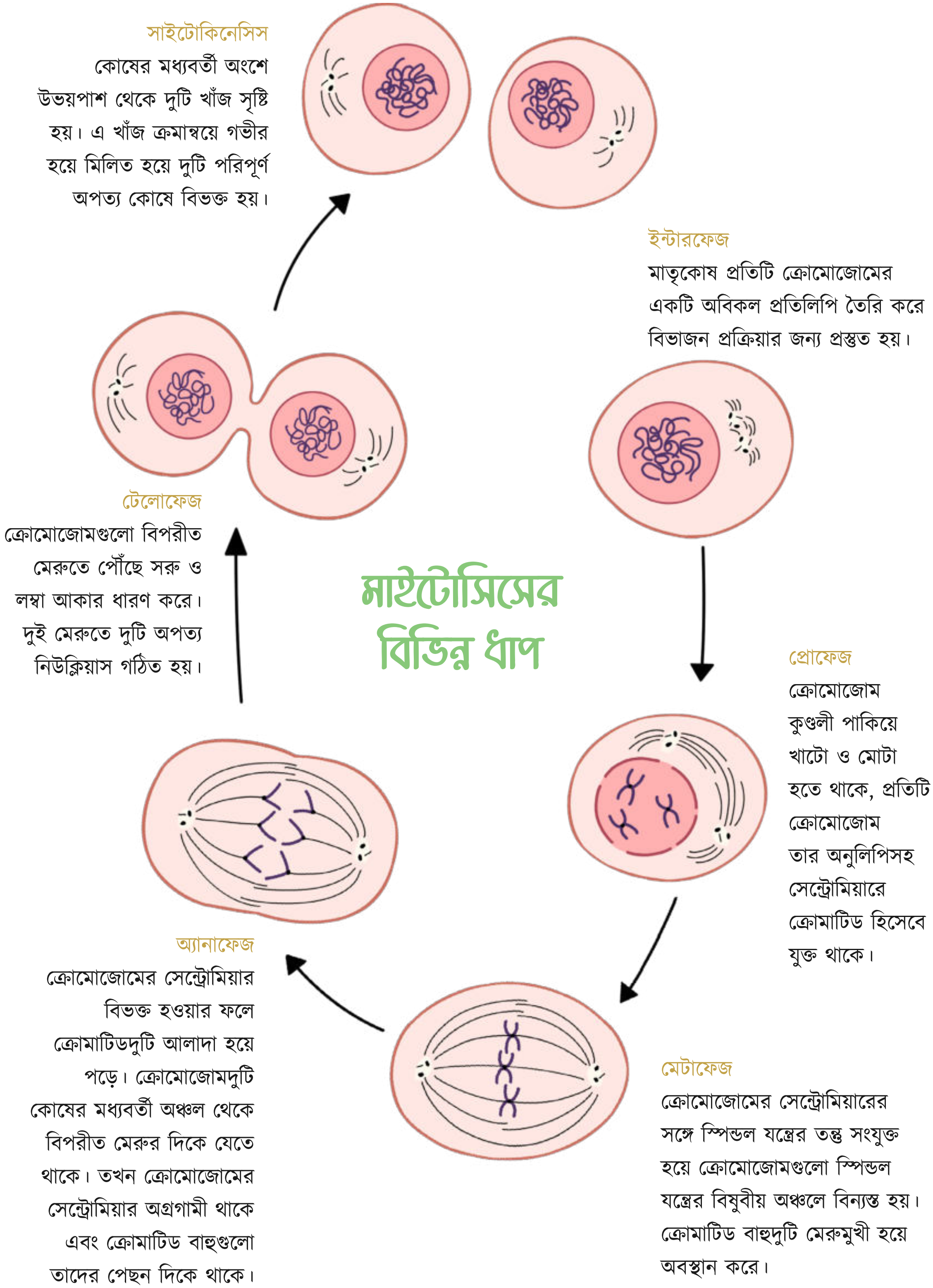
মাইটোসিসের বিভিন্ন ধাপ
সাইটোকিনেসিস
কোষের মধ্যবর্তী অংশে উভয়পাশ থেকে দুটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। এ খাঁজ ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে মিলিত হয়ে দুটি পরিপূর্ণ অপত্য কোষে বিভক্ত হয়।
ইন্টারফেজ
মাতৃকোষ প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটি অবিকল প্রতিলিপি তৈরি করে বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।
প্রোফেজ
ক্রোমোজোম কুণ্ডলী পাকিয়ে খাটো ও মোটা হতে থাকে, প্রতিটি ক্রোমোজোম তার অনুলিপিসহ সেন্ট্রোমিয়ারে ক্রোমাটিড হিসেবে যুক্ত থাকে।
মেটাফেজ
ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে স্পিন্ডল যন্ত্রের তন্তু সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হয়। ক্রোমাটিড বাহুদুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে।
অ্যানাফেজ
ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হওয়ার ফলে ক্রোমাটিডদুটি আলাদা হয়ে পড়ে। ক্রোমোজোমদুটি কোষের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে থাকে। তখন ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী থাকে এবং ক্রোমাটিড বাহুগুলো তাদের পেছন দিকে থাকে।
টেলোফেজ
ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে পৌঁছে সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে। দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব

জীবদেহের বৃদ্ধি ও কোষ সংখ্যার স্থিতিশীলতার জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বগুলো তুলে ধরা হলো :

1। বহুকোষী জীবে জাইগোট নামক একটিমাত্র কোষ হতে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দৈহিক বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।

2। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই মাতৃকোষের স্বাভাবিক আকার, আকৃতি, আয়তন ও গুণাগুণ অপত্য কোষে বজায় থাকে।

3। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার ভারসাম্য বজায় থাকে।

4। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে দেহের সব কোষে সমসংখ্যক ও সমগুণধারী ক্রোমোজম থাকে।

5। বহুকোষী জীবদেহে সৃষ্ট যে কোনো ক্ষতস্থান মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূরণ হয়।

6। কিছু কিছু অতিপ্রয়োজনীয় কোষের জীবনকাল সীমিত এগুলো ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এদের পুনরুৎপাদন ঘটে।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ

মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি জীবের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় বিভিন্ন প্রভাবকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কারণে কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনের ফলে টিউমার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন রোগজীবাণু, রাসায়নিক পদার্থ কিংবা তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস কোষ বিভাজনে বাহ্যিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যকৃত, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, স্তন, ত্বক, কোলন এরকম প্রাণিদেহের প্রায় সকল অঙ্গে ক্যান্সার হতে পারে।

4.2.2 মিয়োসিস (Meiosis)

যদি জীবকোষে প্রত্যেকটি ক্রোমোজম দুটি করে থাকে তবে তাকে ডিপ্লয়েড (Diploid) বলে। মানুষ ডিপ্লয়েড কারণ মানুষের প্রতিটি কোষে দুটি করে মোট 23 জোড়া ক্রোমোজম রয়েছে। এই 23 জোড়া ক্রোমোজমের 23টি এসেছে বাবার পুংজনন কোষ থেকে এবং অন্য 23টি এসেছে মায়ের স্ত্রীজনন কোষ

থেকে। কাজেই এখান থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মানুষের অন্যান্য কোষ থেকে এই পুংজনন কোষ এবং স্ত্রীজনন কোষগুলো ভিন্ন, কারণ এখানে 23 জোড়ার বদলে তার অর্ধেক, 23টি করে ক্রোমোজম রয়েছে, এই কোষগুলোকে হাপ্লয়েড (Haploid) বলে। আমরা মাইটোসিস নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখেছি অপত্য কোষগুলো হুবহু মাতৃকোষের অনুরূপ হয়, কাজেই মাইটোসিস কোষ বিভাজন দিয়ে আমরা কখনোই ডিপ্লয়েড থেকে হাপ্লয়েড পেতে পারব না, এর জন্য আমাদের ভিন্ন এক ধরনের কোষ বিভাজন পদ্ধতি দরকার এবং এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে মিয়োসিস।

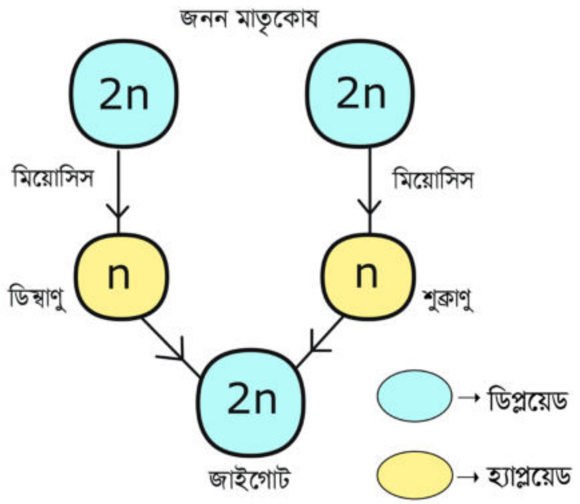

কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি

একটি ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের আগে মাইটোসিসের মতোই কোষচক্রের ইন্টারফেজ পর্যায় দিয়ে যায়, এবং একইভাবে চক্রের S বা প্রতিলিপন পর্যায়ে এর প্রতিটি ক্রোমোজম তার আরেকটি করে প্রতিলিপি তৈরি করে।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ

মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াকে মিয়োসিস-1 এবং মিয়োসিস-2 এই দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম মিয়োসিস-1 পর্যায়ে প্রতি জোড়া ক্রোমোজম থেকে একটি করে ক্রোমোজোম নিয়ে দুটি কোষ তৈরি হয়। দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিস বিভাজনের অনুরূপ। অর্থাৎ, প্রথম বিভাজনে উৎপন্ন প্রতিটি কোষ পুনরায় বিভাজিত হয়ে দুটি করে সর্বমোট চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। মিয়োসিস-1 পর্যায়কে প্রোফেজ-1, মেটাফেজ-1, আনাফেজ-1 এবং টেলোফেজ-1 এই চারটি মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায়। একইভাবে মিয়োসিস-2 পর্যায়কে প্রোফেজ-2, মেটাফেজ-2, আনাফেজ-2 এবং টেলোফেজ-2 এই চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছবিতে একই ধরনের এক জোড়া ক্রোমোজম সংবলিত একটি ডিপ্লয়েড কোষের মিয়োসিস-1 এবং মিয়োসিস-2 এর বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তর দেখানো হয়েছে। মানুষের বেলায় এক জোড়ার পরিবর্তে 23 জোড়া ক্রোমোজম দিয়ে শুরু হতো। মিয়োসিস প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে কোষচক্রের ইন্টারফেজ পর্যায়ে ডিপ্লয়েড কোষের একই ধরণের ক্রোমোজম দুইটি আরেকটি করে প্রতিলিপি তৈরি করে।

1 জোড়া ক্রোমোজমের একটি ডিপ্লয়েড কোষ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় 1টি ক্রোমোজম সংবলিত চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষে বিভাজিত হয়েছে।

প্রোফেজ-1: ক্রোমোজমগুলো নিজেদের মধ্যে জোড় বাধে এবং পরস্পরের মধ্যে ডিএনএ বিনিময় করে (ক্রসিং ওভার)।

☑ মেটাফেজ-1 : ক্রোমোজমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হয়।

☑ আনাফেজ-1 : ক্রোমোজমগুলো দুই মেরুর দিকে আকর্ষিত হয়।

☑ টেলোফেজ-1 এবং সাইটোকিনেসিস : কোষের মধ্যভাগ সংকুচিত হয়।

☑ প্রোফেজ-2 : দুটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয়।

☑ মেটাফেজ-2 : অপত্য কোষের ক্রোমোজমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হয়।

☑ আনাফেজ-2 : ক্রোমাটিডগুলো দুই মেরুর দিকে আকর্ষিত হয়।

☑ টেলোফেজ-2 এবং সাইটোকিনেসিস : কোষের মধ্যভাগ সংকুচিত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষে বিভক্ত হয়।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব অপরিসীম, নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো :

1। ডিপ্লয়েড জীবে মিয়োসিসের ফলে গ্যামিট বা জনন কোষ তৈরি হয়। যৌন প্রক্রিয়ায় জনন কোষের মিলনের মাধ্যমেই বংশবিস্তার হয় বলে মিয়োসিস কোষ বিভাজন ব্যতিত জীবের বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়।

2। বংশানুক্রমে প্রজাতির স্বকীয়তা রক্ষা করার জন্য ক্রোমোজম সংখ্যা সঠিক থাকতে হয়, মিয়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

3। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জননকোষের ক্রসিং ওভারের ফলে জীবজগতে বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

৫.3 বংশগতি নির্ধারণে ক্রোমোজম ও ডিএনএ'র ভূমিকা

তোমাদের কী কী দৈহিক বৈশিষ্ট্য আছে? তোমাদের কারো কারো চুল কোঁকড়ানো, আবার কারো চুল সোজা, কেউ লম্বা আবার কেউ খাটো, কারো চুল কালো আবার কারো চোখ বাদামি। আমাদের দেহে এই যে নানা রকম বৈশিষ্ট্য, সেগুলো আমাদের শরীরের ক্রোমোজমে থাকা ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) বহন করে থাকে। জীবের যে কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ডিএনএ'তে সংরক্ষিত থাকে। ডিএনএ-ই মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য সরাসরি তার সন্তান-সন্ততিদের মাঝে নিয়ে আসে, যেটি বংশগতি নামে পরিচিত। কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বংশগতির ধারা রক্ষা করার মূল ভূমিকা পালন করে ক্রোমোজমে থাকা মানব দেহের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডিএনএ। অর্থাৎ বংশগতির

ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ডিএনএ-ই বংশগতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। ক্রোমোজমে অবস্থিত এই ডিএনএ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় সরাসরি পিতামাতা থেকে পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয়। সেজন্য ক্রোমোজমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তী শ্রেণিতে তোমরা এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

পুরুষ ও নারী সন্তান

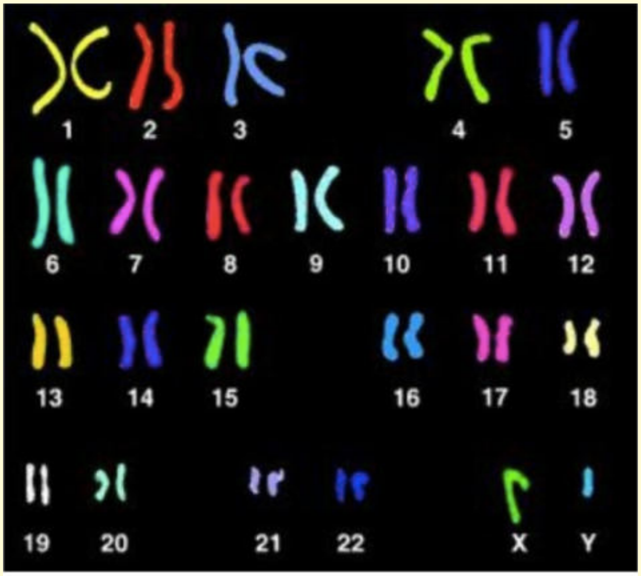

মানুষের 23 জোড়া ক্রোমোজোম

পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষের 22টি ক্রোমোজোম অভিন্ন, 23তম ক্রোমোজোমটি পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষের জন্য ভিন্ন হতে পারে। স্ত্রীজনন কোষের বেলায় সেটি সবসময়েই X, পুংজনন কোষের বেলায় সেটি কখনো X কখনো Y। সে কারণে পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষ এক সাথে মিলিত হওয়ার পর ক্রোমোজোমের 23 তম জোড়াটি XX কিংবা XY হতে পারে। যদি সেটি XX হয় তাহলে সন্তানটি হয় নারী এবং XY হলে সন্তানটি হয় পুরুষ। সংযুক্ত ক্রোমোজোমের ছবিগুলো লক্ষ করলে তোমরা দেখতে পাবে X এবং Y ক্রোমোজমের আকার ভিন্ন। Y ক্রোমোজম X ক্রোমোজোমের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র।

অধ্যায় ৫

উদ্ভিদের কোষ, টিস্যু ও তাদের বিশেষত্ব

অধ্যায় ৫ উদ্ভিদের কোষ, টিস্যু ও তাদের বিশেষত্ব

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ উদ্ভিদের কোষ, টিস্যু ও তাদের ধরণ
- ☑ উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাদের কাজ
- ☑ উদ্ভিদে ব্যাপন, প্রস্বেদন ও পরিবহণ
- ☑ উদ্ভিদ টিস্যু আবাদ ও তার ব্যবহার

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে জীবদেহের গাঠনিক একক হচ্ছে কোষ। সরল এককোষী উদ্ভিদদেহ একটি কোষ দিয়েই গঠিত হয়, এই শ্রেণির উদ্ভিদে সব ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজ এই একটিমাত্র কোষেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু জটিল বহুকোষী উদ্ভিদের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজ অনেক জটিল, সেগুলো উদ্ভিদকে তার বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। বিভিন্ন অঙ্গের কাজও আলাদা, যেমন কোনো অঙ্গ পানি ও খনিজ উপাদান পরিবহণ করে, কোনোটি উদ্ভিদে দৃঢ়তা প্রদান করে আবার কোনোটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য কোষের আকারও ভিন্ন হয়। যেহেতু একটি কোষের পক্ষে এককভাবে সকল কাজ করা সম্ভব নয়, তাই অনেকগুলো কোষ একত্রিত হয়ে প্রয়োজনীয় শারীরতাত্ত্বিক কাজগুলো করে থাকে। যখন উদ্ভিদের কোনো কোষগুচ্ছ সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় শারীরতাত্ত্বিক কাজ সম্পাদন করে তখন তাদেরকেই টিস্যু বলে।

5.1 টিস্যু ও প্রকারভেদ

তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ বীজ থেকে অঙ্কুরিত উদ্ভিদ ধীরে ধীরে বড়ো হয়। এ সময় পাতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডও বড়ো এবং দৃঢ় হয়, মূল তৈরি হয়। কোন ধরনের টিস্যু এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে, তারা কি একই রকম নাকি আলাদা—আমরা এখন এই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করব।

কোষ বিভাজনের ফলেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে তাই টিস্যু গঠনকারী কোষের বিভাজন অনুযায়ী সবধরনের টিস্যুকে ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুই ধরনের টিস্যুগুলোতে কিছু পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো এরকম :

5.1.1 ভাজক টিস্যু

জীবদেহের কিছু কিছু কোষগুচ্ছে কোষের অবিরাম বিভাজনের ফলে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যে কোষগুলো কোষগুলো বিভাজিত হতে পারে সেগুলো হলো ভাজক কোষ, আর ভাজক কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুই হলো ভাজক টিস্যু।

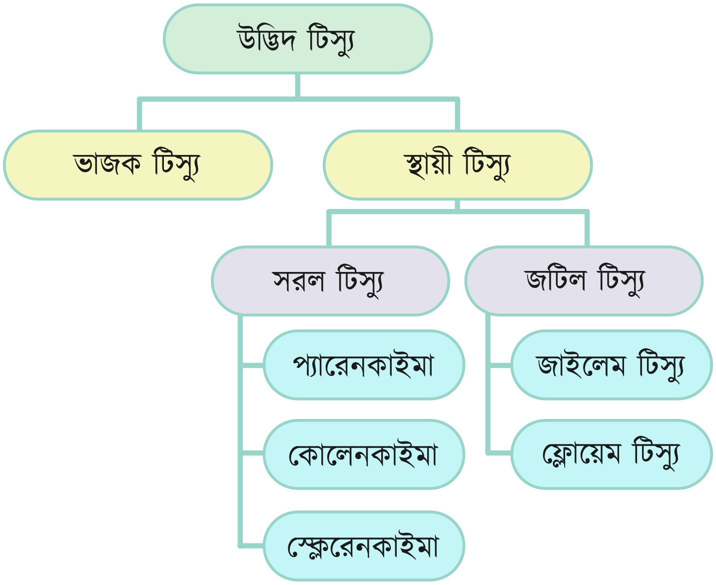

টিস্যুর প্রকারভেদ

বৈশিষ্ট্য :

নিচে ভাজক টিস্যুর উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

1। ভাজক টিস্যুর কোষগুলো জীবিত ও অপেক্ষাকৃত ছোটো।

2। কোষের নিউক্লিয়াস তুলনামূলক ভাবে বড়ো এবং সাইটোপ্লাজম ঘন হয়ে থাকে।

3। টিস্যুর কোষগুলোতে সেলুলোজ দিয়ে তৈরি পাতলা কোষপ্রাচীর থাকে।

4। ভাজক টিস্যুর কোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না।

5। এই কোষগুলো সাধারণত আয়তাকার, ডিম্বাকার, পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজাকার হয়।

6। কোষগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এদের মধ্যে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে না।

7। কোষে কোনো প্রকার সঞ্চিত খাদ্য, ক্ষরিত বস্তু বা বর্জ্য পদার্থ থাকে না।

কাজ :

1। ভাজক টিস্যুর বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পায়।

2। ভাজক টিস্যু থেকে স্থায়ী টিস্যু তৈরি হয়।

3। ভাজক টিস্যু বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষতস্থান পূরণ করে।

5.1.2 স্থায়ী টিস্যু

উদ্ভিদের ভাজক টিস্যু যখন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হয়ে উদ্ভিদের নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান নেয় এবং আর বিভাজিত হয় না তখন তাকে স্থায়ী টিস্যু বলে। এ টিস্যুর কোষগুলো পূর্ণভাবে বিকশিত এবং সঠিক আকার-আকৃতিবিশিষ্ট।

বৈশিষ্ট্য :

স্থায়ী টিস্যুর কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

1। স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলোর প্রাচীর অপেক্ষাকৃত স্থূল ও বেশ পুরু।

3। এই কোষের নিউক্লিয়াস স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট এবং সেটি কোষের একপাশে অবস্থান করে।

2। কোষ গহ্বর অপেক্ষাকৃত বড়ো।

4। স্থায়ী টিস্যুর কোষপ্রাচীরে নানা নকশা দেখা যায়।

কাজ :

পরিবহণ ও পরিচলনে অংশগ্রহণ করাই স্থায়ী টিস্যুর প্রধান কাজ।

স্থায়ী টিস্যুকে আবার সরল ও জটিল এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

সরল টিস্যু

কিছু স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষের আকার, গঠন এবং আকৃতি একরকম, এগুলো সরল টিস্যু নামে পরিচিত। তিন ধরনের সরল টিস্যু রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে :

(ক) প্যারেনকাইমা টিস্যু :

উদ্ভিদদেহের সব অংশে এই কোষগুলো পাওয়া যায়। এই টিস্যুর কোষগুলো জীবিত, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ। এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে। কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন, খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য সঞ্চয় এবং পরিবহণ করা।

(খ) কোলেনকাইমা টিস্যু :

এগুলো বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে তৈরি। এ টিস্যুর কোষগুলোও সজীব, প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ এবং লম্বাটে হয়। কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন নামক শর্করা থাকার কারণে কোলেনকাইমা

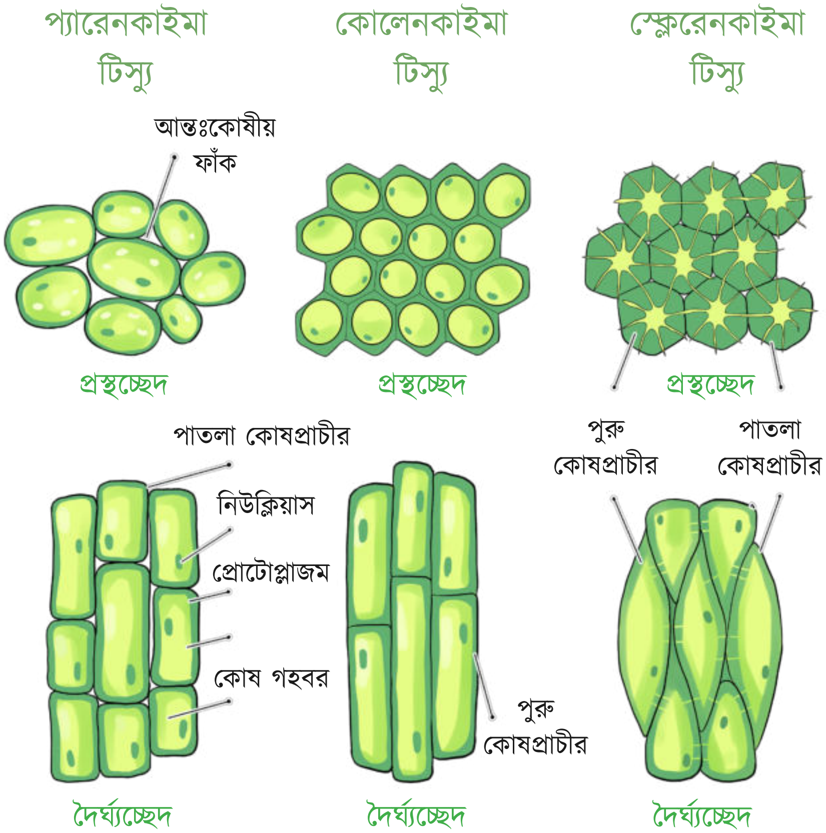

তিন ধরনের সরল টিস্যু

টিস্যুর কোষপ্রাচীরগুলো পুরু হয়। এই টিস্যু উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করা এদের প্রধান করে যে কারণে উদ্ভিদের কাণ্ড না ভেঙ্গে বাঁকা হতে পারে।

(গ) স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু :

এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা এবং পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট হয়। স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু প্রোটোপ্লাজমবিহীন। প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো নষ্ট হয়ে মৃত কোষে পরিণত হয়। এই টিস্যু লিগনিন নামক এক ধরনের জৈব পলিমারযুক্ত এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য গঠিত। এই কোষ উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদান করে থাকে।

জটিল টিস্যু

কিছু কিছু স্থায়ী টিস্যু একাধিক প্রকার কোষ দিয়ে গঠিত হয় এবং সম্মিলিতভাবে একই রকম কাজ করে থাকে। এদেরকে জটিল টিস্যু বলা হয়। এরা উদ্ভিদে পরিবহণের কাজ করে বলে এদের পরিবহণ

টিস্যুও বলা হয়। এ টিস্যু দুই ধরনের (ক) জাইলেম এবং (খ) ফ্লোয়েম। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একত্রে উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।

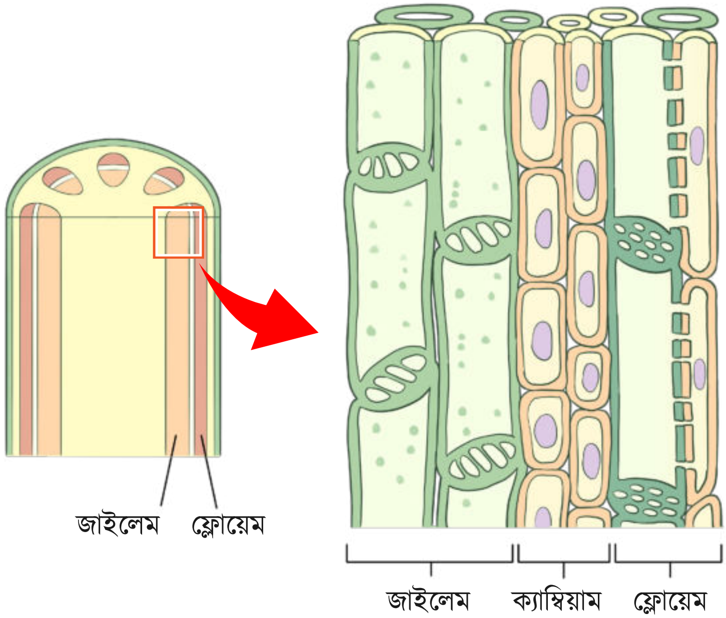

উদ্ভিদের পরিবাহী টিস্যু

(ক) জাইলেম টিস্যু (xylem) :

উদ্ভিদের দৃঢ়তা প্রদানকারী টিস্যুর মধ্যে অন্যতম হলো জাইলেম টিস্যু। জাইলেম টিস্যু মূল থেকে উদ্ভিদের কাণ্ড দিয়ে উপরে পাতায় পানি অন্যান্য খনিজ লবণ সরবরাহ করে থাকে।

(খ) ফ্লোয়েম টিস্যু (phloem) :

উদ্ভিদ কাণ্ডে এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। জাইলেম যেমন খাদ্য প্রস্তুতের কাঁচামাল ও পানি সরবরাহ করে, তেমনি ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ করে।

জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী টিস্যুকে ক্যাম্বিয়াম (Cambium) বলে, এই টিস্যু ভাজক টিস্যু হিসেবে নতুন জাইলেম এবং ফ্লোয়েম টিস্যু তৈরি করে উদ্ভিদের কাণ্ড বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে থাকে।

5.2 উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাদের কাজের গুরুত্ব

উদ্ভিদের প্রধান গাঠনিক অঙ্গ হচ্ছে মূল, কাণ্ড ও পাতা যা বিভিন্ন টিস্যুর সমন্বয়ে তৈরি। উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড কেন প্রয়োজন? উঁচু দালানে এক ধরনের নলের মাঝ দিয়ে পানি যেরকম দালানের বিভিন্ন তলার নানা অংশে পরিবাহিত হয়, ঠিক সেভাবে উদ্ভিদের জৈবিক কাজ সম্পাদনের জন্য এর বিভিন্ন উপাদান উদ্ভিদের মাঝে পরিবহণের প্রয়োজন হয়। যে সকল উদ্ভিদে ঠিক এরকম পরিবহণ করার টিস্যু আছে তাদেরকে সংবাহী (vascular) উদ্ভিদ বলে। এসব গাছ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ করে। সেই পানি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উঁচু শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য অঙ্গে যায়। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে উদ্ভিদ তার সবুজ পাতায় শর্করা জাতীয় উপাদান

ও অক্সিজেন তৈরি করে। উদ্ভিদ তার উৎপাদিত খাদ্য ফল, মূল পাতা কিংবা বীজে সংরক্ষণ করে যেটি অন্য জীব তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদের দেহে তৈরিকৃত শর্করা শ্বসনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদ সেই অক্সিজেন ব্যবহার করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্সিজেন পরিবেশে বিমুক্ত করে দেয়, যা এই পৃথিবীকে মানুষসহ অন্য সব প্রাণীর জন্য বাসযোগ্য করে রেখেছে।

5.2.1 কাণ্ড

আমাদের চারপাশে ছোটো-বড়ো নানান রকমের গাছ আমরা দেখতে পাই। গাছের মাটির উপরের যে অংশটি আমরা দেখতে পাই, মূলত এটিই গাছের কাণ্ড। গাছের বাকল সাধারণত বাদামি বা ধূসর এবং কচি ডালপালা সবুজ বর্ণের হয়। গাছের কাণ্ড একটা গাছকে তার কাঠামো প্রদান করে এবং পাতা, ফুল ও ফল ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। বিভিন্ন গাছের জন্য কিংবা গাছের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য এই কাণ্ড আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে। ফুলের বোঁটা হিসেবে আমরা যা দেখি সেটিও মূলত এক ধরনের নরম কাণ্ড। প্রাথমিকভাবে কাণ্ড নরম হয়ে থাকে, ডালপালা দুর্বল হয় এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তী সময়ে অনেক গাছের কাণ্ড খুব শক্ত হয় যা কাঠ হিসেবে ব্যবহার উপযোগী। এদের বাইরে পুরু বাকল থাকে। কান্ড গাছকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামো দেয়, সুরক্ষা প্রদান করে। শুধু তাই না, গাছের ডালপালা বংশবিস্তারেও সাহায্য করে। এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ঋতুতে একটি গাছ শিকড়, ডগায় এবং পাশে বৃদ্ধি পায়। পাশের বৃদ্ধির কারণেই ডাঁটা, শাখা এবং কাণ্ড ঘন হয়ে যায় এবং এর মধ্যে দিয়ে আমরা গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে যে রিংগুলো দেখি সেগুলো তৈরী হয়, একটি রিং যা ঋতুর একটি চক্র বা এক বছরকে চিহ্নিত করে।

গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে রিং

কিছু ভূগর্ভস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড যেমন- আলু ও আদা খাদ্য সঞ্চয় করে ভিন্ন আকার ও আকৃতি ধারণ করে। সুমিষ্ট পানীয় আখের রস আমরা পাই আখের রসালো কাণ্ডে সঞ্চিত খাদ্য থেকে। আবার, কাঁটাযুক্ত ক্যাকটাস তাদের কাণ্ড পানি সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহার করে।

5.2.2 মূল

গাছের যে অংশ মাটির সাথে যুক্ত থাকে, খাদ্য জমা রাখে, মাটি থেকে পানি ও খনিজ পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে সেটি মূল বা শিকড় (Root) নামে পরিচিত। মূলের গায়ে ছোট ছোট চুলের মতো অংশ থাকে যাকে মূলরোম (Root hair) বলা হয়। মূলরোম এমনভাবে গঠিত হয় যেন খুব সহজেই সেগুলো মাটি থেকে বেশি পরিমাণে পানি ও দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে নিতে পারে। প্রত্যেক মূলের আগায় থাকে মূলটুপি (Root cap), যেটি মূলত কোষের শক্ত আবরণ যা মূলকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। উদ্ভিদের মূল সাধারণত দু ধরনের হয়। মূলের যে অংশ মাটির গভীরে প্রবেশ করে সেটি হচ্ছে প্রধান মূল এবং ভূপৃষ্ঠতলের কাছাকাছি শাখামূল বিস্তৃত থাকে। এরা মাটি থেকে পানি ও খনিজ উপাদান শোষণের জন্য কাজ করে। মাটি থেকে পানি ও খনিজ উপাদান মূলরোম, প্রশাখামূল, শাখামূল হয়ে প্রধান মূলে প্রবেশ করার পর মূলের কোষে তরলের চাপ সৃষ্টি হয়। প্রস্বেদন টানের ফলে পানি ও খনিজ উপাদান মূল হতে কাণ্ডের সাহায্যে উদ্ভিদের উঁচু শাখা-প্রশাখা ও পাতায় প্রবেশ করে।

5.2.3 পাতা

একটি উদ্ভিদের দিকে তাকালে যেটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে তার পাতা এবং এটি উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পাতায় উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক্লোরোফিল থাকে। উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পাতায় তৈরি হয়। উদ্ভিদে বিভিন্ন রঙের এবং বিভিন্ন আকার-আকৃতির পাতা রয়েছে। পাতার গঠন তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত। অনেক পাতা চ্যাপ্টা এবং চওড়া হয় যাতে করে তারা সর্বাধিক পরিমাণ সূর্যালোক শোষণ করতে পারে। আম, কাঁঠাল, জাম, বট প্রভৃতি গাছে একক বা সরল পাতা দেখা যায়। গোলাপ, নিম, সজনে প্রভৃতি গাছের পাতায় একাধিক ছোট ছোট পত্রফলক (Lamina) থাকে বলে এদের যৌগিক পাতা বলে। কিছু গাছের পাতা সুচের মতো চিকন হয় আবার কোনো কোনো গাছের পাতা কাঁটাযুক্ত থাকে। চিরহরিৎ জাতীয় গাছ, যেমন—পাইন গাছে সারা বছর সবুজ পাতা থাকে। এই পাতার

পাথরকুচির পাতা থেকে নতুন গাছ তৈরি হয়

বাইরের আবরণ হলো কিউটিকল (Cuticle) নামক মোম-জাতীয় আবরণ, এটি খুব ঠান্ডা বা শুষ্ক আবহাওয়ায় পাতা থেকে অতিরিক্ত পানি বের হওয়া রোধ করে। এর পরের স্তর হচ্ছে ত্বকীয় বহিস্তর, বহিঃত্বক বা এপিডার্মিস (Epidermis)। খাদ্য তৈরি, প্রস্বেদন ছাড়াও পাতা বংশবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। তোমরা যারা পাথরকুচির পাতা দেখেছ, তারা সবাই নিশ্চয়ই দেখেছ সেখানে পাতা থেকেই নতুন গাছ তৈরি হয়।

উদ্ভিদের কাণ্ড, মূল এবং পাতা-এই তিনটি প্রধান অঙ্গ ছাড়া আরো যে দুটি অঙ্গ দেখা যায় তা নিচে বর্ণিত হলো :

5.2.৫ ফুল

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, উদ্ভিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয়, সুগন্ধযুক্ত ও রঙিন অঙ্গ হচ্ছে ফুল। উদ্ভিদের প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের কাণ্ড বা কাণ্ডের অংশই হলো ফুল। পরাগায়নকারীদের আকৃষ্ট করতেই ফুল রং ও সুগন্ধি তৈরি করে থাকে। বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সুবাস থাকলে কখনোই কোনো দুটি ফুল এক সুবাস নির্গত করে না। উচ্চতর উদ্ভিদের একটি আদর্শ ফুলে মূলত পুষ্পাক্ষ, বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক এই পাঁচটি অংশ দেখা যায়। এই পাঁচটি অংশের মধ্যে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এরা প্রজননে সরাসরি অংশ নেয়। যে ফুলে এই পাঁচটি অংশই উপস্থিত থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। এর যেকোনো একটি অংশ না থাকলে তাকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। যখন কোনো ফুলে একই সঙ্গে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই উপস্থিত থাকে, তাকে উভলিঙ্গ ফুল বলে, যেমন- জবা বা ধুতুরা। অন্যদিকে, পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবক যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে একলিঙ্গ ফুল বলে, যেমন- লাউ কিংবা কুমড়া। দুটোই অনুপস্থিত থাকলে তাকে ক্লীবলিঙ্গ ফুল বলে।

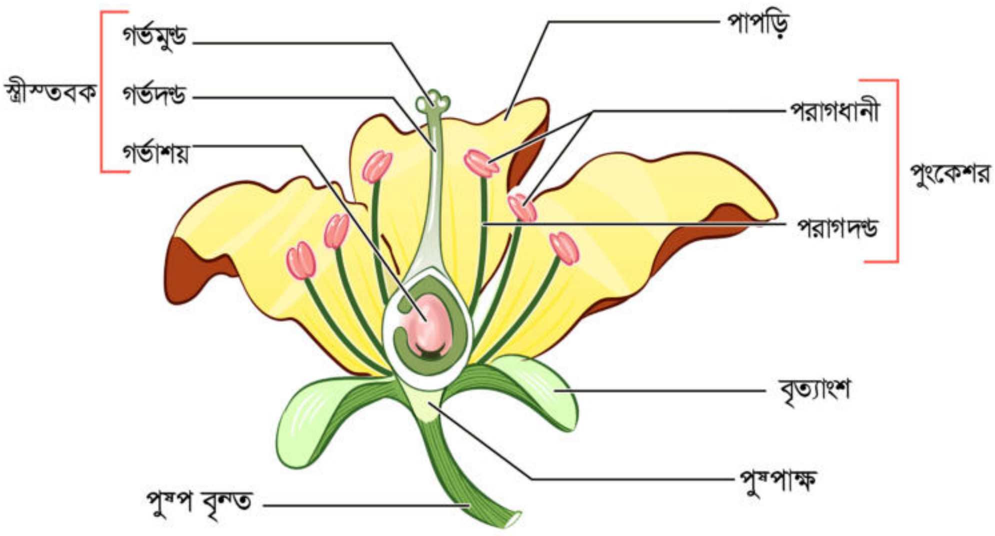

উভলিঙ্গ ফুল

5.2.5 ফল

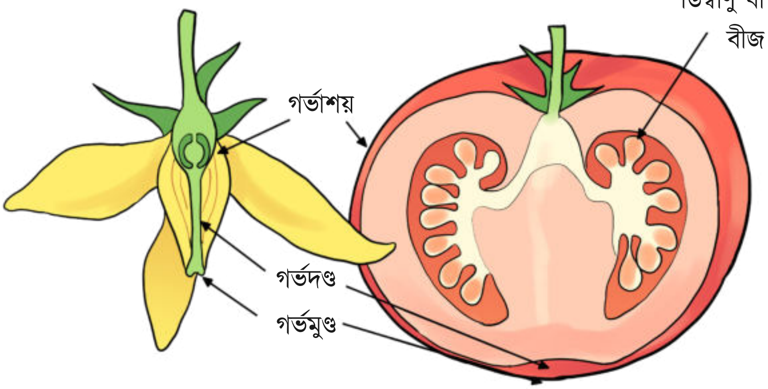

টমেটোতে ডিম্বাণুগুলোকে ঘিরে থাকা ডিম্বাশয়

সপুষ্পক উদ্ভিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ফল। ফল বলতে আমরা সাধারণত আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, পটল ইত্যাদি যা কিছু আমরা সবজি হিসেবে খাই, সেগুলো সবই ফল। ফুলে নিষিক্তকরণ শেষ হলেই ফল গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে, তাকে ফল বলে। শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন- আম কিংবা জাম। অপরপক্ষে, যখন গর্ভাশয়সহ ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন- আপেল, চালতা ইত্যাদি। বীজ নিষিক্ত হওয়ার পরে প্রতিটি ডিম্বাণু একটি বীজ হিসেবে বিকশিত হয়। প্রতিটি বীজে একটি ক্ষুদ্র এবং অবিকশিত উদ্ভিদ থাকে যাকে ভ্রূণ বলা হয়। ডিম্বাণুগুলোকে ঘিরে থাকা ডিম্বাশয় এমন একটি ফল হিসেবে বিকশিত হয় যেখানে এক বা একাধিক বীজ থাকে। উপরের চিত্রে টম্যাটোর মধ্যে যেমনটি দেখা যাচ্ছে।

5.3 উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব

প্রতিটি উদ্ভিদ কোষে প্রতিনিয়ত পানি শোষণ, অভিস্রবণ, ব্যাপন, প্রস্বেদন, পরিবহণ, সালোক সংশ্লেষণ ইত্যাদি অনেক ধরনের জৈবনিক কাজ সম্পাদন হয়। এইসব জৈবনিক কাজ করতে শক্তির প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদ খাদ্য থেকে এই শক্তি সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে আবার প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিভিন্ন অঙ্গাণুতে পৌঁছে দেয়, যে কারণে উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। এই কাজগুলো অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এই অধ্যায়ে আমরা সেরকম কিছু জৈবনিক কাজ সম্পর্কে জেনে নিই।

5.3.1 ব্যাপন (Diffusion)

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ যে, পানির অভাবে টবে লাগানো গাছের পাতা নুইয়ে পড়লে টবে পানি দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে গাছের পাতাগুলো আবার আগের মতোই সতেজ হয়ে ওঠে। এটি ব্যাপন নামের

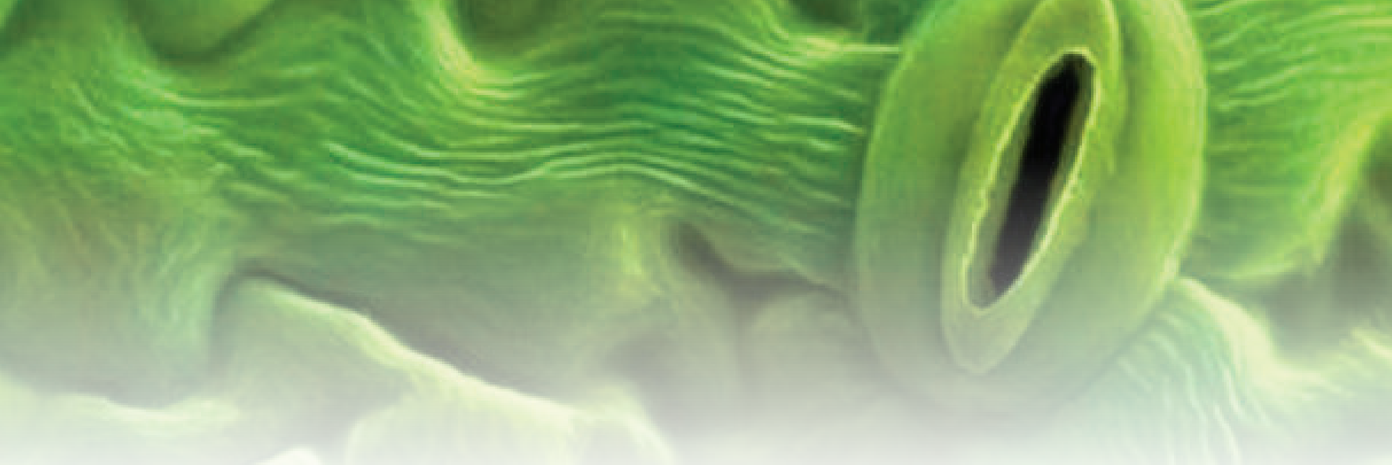

প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে। একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থ অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে এবং বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রবণ থেকে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবকের ব্যাপিত হওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। পাতার মেসোফিল টিস্যুতে এই ব্যাপন চাপ ঘাটতির ফলে পানির ঘাটতি আছে এমন কোষ পাশের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এভাবে উদ্ভিদে পরিবহণ ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

গুরুত্ব : উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল ও কাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। উদ্ভিদের পানি শোষণে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। শোষণ ছাড়াও অন্য সব রকম শারীরবৃত্তীয় কাজ এই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঘটে। উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই কাজটি ব্যাপন প্রক্রিয়া দিয়ে সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাষ্পাকারে প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়।

5.3.2 প্রস্বেদন (Transpiration)

উদ্ভিদ প্রধানত মূল দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে এবং এই শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির জন্য ব্যয় হয় এবং প্রায় 99% পানি উদ্ভিদের মূলত পত্ররন্ধ্র (stoma, বহুবচন stomata) দিয়ে বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়। যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়, তাকে প্রস্বেদন বলে।

পত্ররন্ধ্র এক ধরনের রন্ধ্র বা ছিদ্র। পাতায়, কচি কাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে পত্ররন্ধ্র দুটি রক্ষীকোষ (Guard cell) দিয়ে বেষ্টিত থাকে। সালোক সংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করতে এবং অক্সিজেন

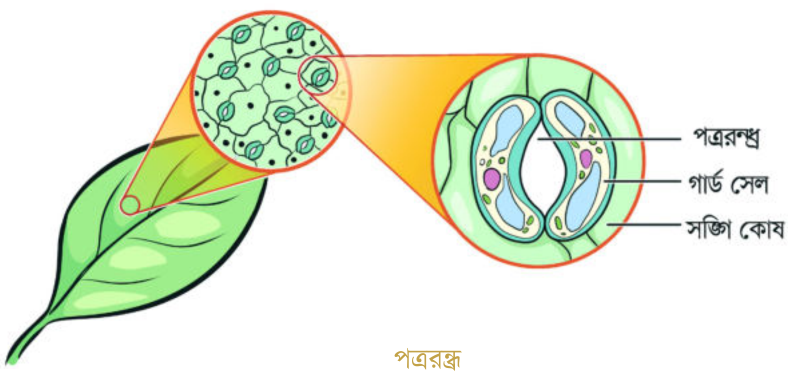

পত্ররন্ধ্র

নির্গত করতে পত্ররন্ধ্রকে খোলা রাখতে হয়, এবং তার ফলাফল হিসেবে পত্ররন্ধ্র দিয়ে বিশাল পরিমাণ পানি জলীয় বাষ্প হিসেবে বের হয়ে যায়। প্রস্বেদনের কারণে মূল থেকে পাতায় একটি অবিরাম পানির প্রবাহ চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পানিকে বাষ্পীভূত করে উদ্ভিদ অতিরিক্ত তাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে অতিরিক্ত পানিকে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটির কারণে উদ্ভিদ পানিশূন্যতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমরা সবাই জানি কৃষক ও চাষিদের তাদের ফসলকে রক্ষা করার জন্য সব সময়ই পানি সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাটি নিশ্চিত রাখতে হয়।

গুরুত্ব :

প্রস্বেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রক্রিয়া। উদ্ভিদের সকল কোষে পানি সরবরাহ ও সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি খাদ্য বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানোতে প্রস্বেদন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। প্রস্বেদনের ফলে বাহ্যিক নালিতে যে টান পড়ে সেই টান মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে। এছাড়াও প্রস্বেদনের ফলে সৃষ্ট টান পানি ও খাদ্যরস উপরে উঠানো, লবণ পরিশোষণ, পাতা ও অন্যান্য অংশে খনিজ উপাদান পৌঁছানো ইত্যাদিতে সহায়তা করে।

5.3.3 উদ্ভিদের পরিবহণ ব্যবস্থা

উদ্ভিদে পরিবহণ বলতে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ উপাদান এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যের চলাচলকে বুঝায়। কোষের ভিতরকার পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ উপাদানকে একত্রে কোষরস (cell sap) বলে। প্রস্বেদন টান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রভাবে এই কোষরস জাইলেম ভেসেলের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছায়। পাতায় পানি পৌঁছানোর পর সেখানে খাদ্য তৈরি হয়। তৈরিকৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহণের কাজটি ফ্লোয়েম টিস্যু করে থাকে।

উদ্ভিদের মূল পানি ও খনিজ উপাদান শোষণ করে। এ কোষরস মূলত অভিস্রবণ (Osmosis), প্রক্রিয়ায় মূলরোমের ভেতর দিয়ে মূলে প্রবেশ করে। একটি অর্ধভেদ্য পর্দার ভেতর দিয়ে কম ঘনত্বের তরলের বেশি ঘনত্বের তরলে প্রবেশের প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে। মূলরোম দিয়ে শোষিত পানি এবং খনিজ উপাদান অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে এক কোষ থেকে পার্শ্ববর্তী কোষে যায়। ঐ কোষ থেকে তা পুনরায় তার পার্শ্ববর্তী কোষে যায়। এভাবে কোষ থেকে কোষে পানি এবং খনিজ পদার্থ চলতে চলতে এক সময় জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায়। তখন প্রস্বেদন স্রোতের সঙ্গে কাণ্ডের পরিবহণ কলার মাধ্যমে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায়।

সেখানে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি হয়। পাতা থেকে তৈরিকৃত খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভ টিউবের (sieve tube) ভেতর দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। সিভ টিউব এক ধরনের নিউক্লিয়াসবিহীন পাতলা প্রাচীরযুক্ত নল আকৃতির সজীব কোষ। লম্বালম্বিভাবে এরা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হয়ে উদ্ভিদদেহে দীর্ঘ নলের মতো গঠন সৃষ্টি করে। দুটো সিভ টিউব কোষের মাঝখানের অনুপ্রস্থ প্রাচীরটি স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে চালুনির মতো আকৃতি ধারণ করে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। এভাবে ফ্লোয়েমের মাধ্যমে জীবন ধারণের জন্য

উদ্ভিদের সর্বত্র পুষ্টি সরবরাহ করা হয়।

জাইলেম ভেসেল বা ফ্লোয়েমের সিভ টিউব কখনো কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু অবধারিত। এজন্য বলা যায় উদ্ভিদ-জীবনে পরিবহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

১.৫ উদ্ভিদে টিস্যু কালচার ও তার ব্যবহার

উদ্ভিদে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবেই প্রয়োজন অনুসারে টিস্যু তৈরি হয়, যেগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হওয়ার কারণে প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদ টিস্যু তৈরি করা সম্ভব। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা, পাপড়ি বা এই জাতীয় কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টির মাধ্যমে বৃদ্ধি করে এবং পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদের চারা সৃষ্টি করাকে টিস্যু কালচার বলে। অর্থাৎ গবেষণাগারে কোনো টিস্যুকে পুষ্টি সরবরাহের মাধ্যমে আবাদ বা কালচার করাই হলো টিস্যু আবাদ বা টিস্যু কালচার।

ভালোজাতের একটি উদ্ভিদ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার করে অনেক সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অতি ক্ষুদ্র টিস্যু থেকে বহু চারা উৎপাদনের এ পদ্ধতিকে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলে। এ প্রক্রিয়া রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি, চারা উৎপাদন, বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ, অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন, ভ্রূণ কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজননে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

রাজশাহীতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নত মানের আলু চারা উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশে বিভিন্ন ধরনের দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা তৈরি হচ্ছে, তাছাড়া কলার চারা, বেলের চারা, কাঁঠালের চারা ইত্যাদিও সফলভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ডালজাতীয় শস্য ও বাদাম উৎপন্ন হয়েছে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত রোগমুক্ত স্ট্রবেরি, স্টেভিয়া, ও কলার বীজ ও চারাও এই তালিকায় রয়েছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

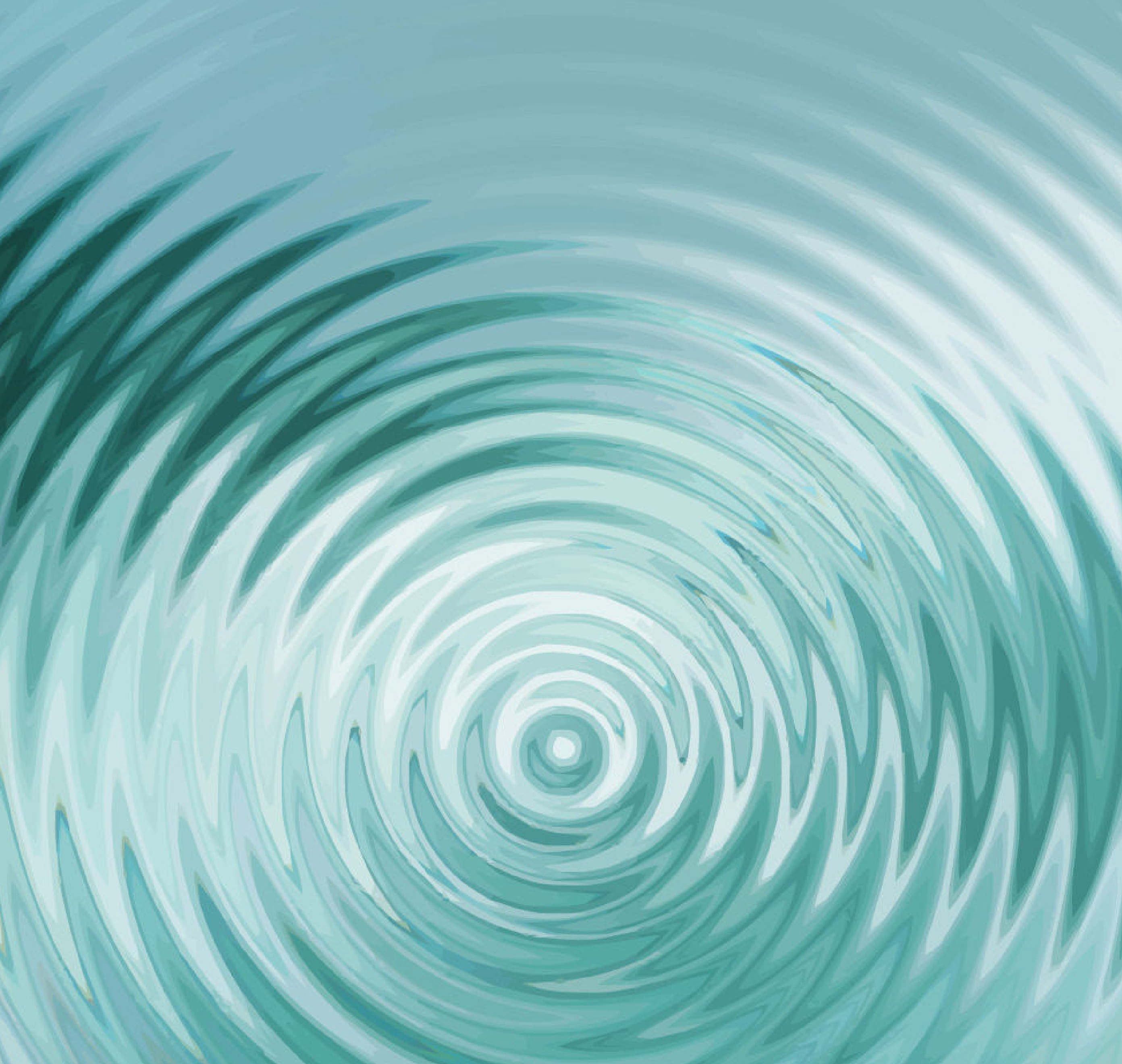

অধ্যায় ৬

তরঙ্গ ও শব্দ

অধ্যায় ৬ তরঙ্গ ও শব্দ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ কম্পন বা স্পন্দন
- ☑ তরঙ্গের ধারণা
- ☑ তরঙ্গের প্রকারভেদ
- ☑ তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাশি
- ☑ শব্দ ও এর গতি

6.1 সরল স্পন্দন গতি

আগের শ্রেণিতে আমরা একটি বিশেষ ধরনের গতির কথা জেনেছিলাম, সেটার নাম পর্যাবৃত্ত গতি (Periodic Motion), যেখানে গতিশীল বস্তুটি একই স্থানে বারবার ফিরে এসে তার গতির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। সুতায় বেঁধে একটা পাথরকে ডানে-বাঁয়ে দুলতে দিলে সেটি হবে পর্যাবৃত্ত গতির একটি উদাহরণ, কারণ পাথরটা যেখান থেকে শুরু করে আবার সেখানে বারবার ফিরে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, যদি ঘর্ষণ বা অন্য কোনোভাবে শক্তি ক্ষয় না হতো তাহলে পাথরটা অনন্ত কাল একইভাবে দুলতে থাকত। এই ধরনের গতিতে পাথরটির গতির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে কারণ পাথরটির শক্তি ক্রমাগত বিভবশক্তি থেকে গতিশক্তি এবং গতিশক্তি থেকে বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রথমে পাথরটি ঝুলিয়ে দেয়ার পর সেটি স্থির অবস্থায় ছিল, এটাকে সাম্য অবস্থা বলে। সাম্য অবস্থায় পাথরটির মাঝে বিভবশক্তি বা গতিশক্তি কোনোটাই নেই। এখন পাথরটিকে টেনে একপাশে একটু সরিয়ে নিলে সেটি একটু উপরে উঠে যায় বলে তার ভেতরে বিভবশক্তি সৃষ্টি হয়। এবারে পাথরটি ছেড়ে দিলে সুতা দিয়ে বাঁধা

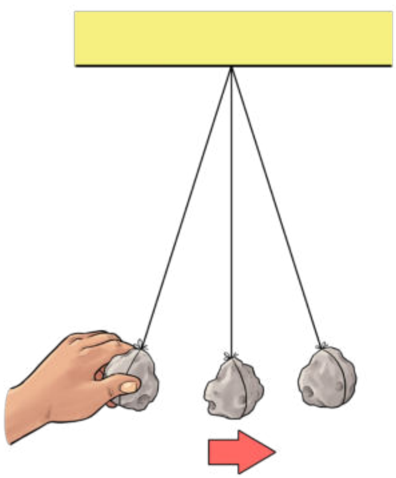

একটা ছোটোপাথরকে সুতায় বেঁধে টেনে একপাশে নিয়ে ছেড়ে দিলে সেটি বিভবশক্তি এবং গতিশক্তির মাঝে রূপান্তরিত হয়ে দুলতে থাকে।

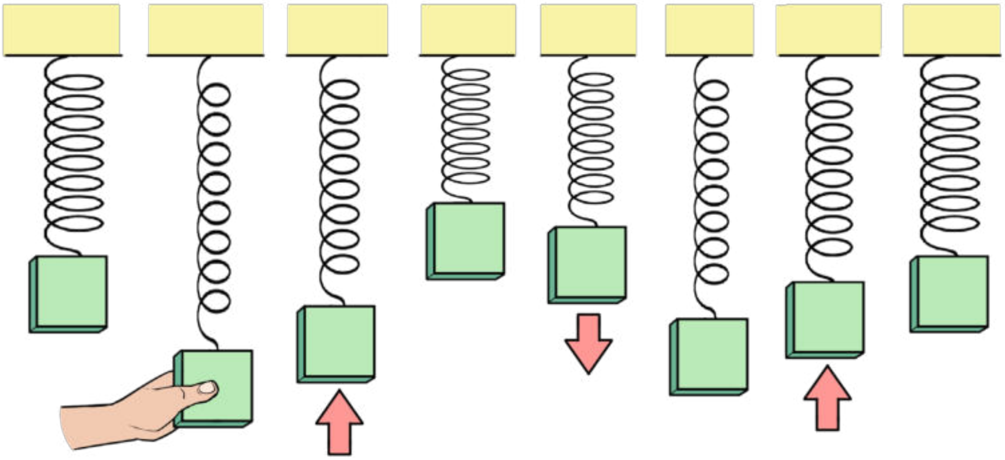

স্বাভাবিক ভাবে স্প্রিং থেকে ঝোলানো বস্তুটির অবস্থা হচ্ছে স্থিতাবস্থা। বস্তুটিকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হলে তার ভেতরে বিভবশক্তি জমা হয়। এটাকে ছেড়ে দিলে সেটি উপরে নিচে স্পন্দিত হতে শুরু করে। প্রথমে বিভবশক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেটি স্প্রিংকে সংকুচিত করে বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তারপর আবার বিভবশক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এভাবে স্প্রিংটি সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে।

বলে সরাসরি নিচে নামতে পারে না, তাই সামনের দিকে এগিয়ে সর্বনিম্ন স্থানে পৌঁছাতে চায়, তখন বিভব শক্তি কমে সেটি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। যখন সেটি সবচেয়ে নিচে নেমে আসে— অর্থাৎ পূর্বের সাম্য অবস্থার অবস্থানে আসে তখন তার ভেতরে কোনো বিভব শক্তি থাকে না, কিন্তু পুরো শক্তিটাই গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে যেতে থাকে। যেহেতু এখন পাথরটির মাঝে গতিশক্তি সৃষ্টি হয়েছে আমরা এখন আর এই অবস্থানকে সাম্য অবস্থা বলতে পারব না। এই গতিশক্তির কারণে পাথরটি অন্যপাশে উপরে উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তার গতিশক্তি কমতে থাকে। যখন এটি তার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছায় তখন সেটি থেমে যায় বলে তার ভেতরে আর কোনো গতিশক্তি থাকে না, পুরোটাই বিভব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পাথরটা তখন দিক পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে উল্টোদিকে গতিশীল হতে থাকে এবং এভাবে পুরো গতিচক্রের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, অর্থাৎ বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির মাঝে শক্তির রূপান্তর হতে থাকে। এই ধরনের গতিকে সরল স্পন্দন গতি (Simple Harmonic Motion) বলে। পৃথিবীতে যত ধরনের গতি আছে তাদের ভেতর এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গতির মাঝে একটি।

একইভাবে একটা স্প্রিংয়ের সঙ্গে একটা ভর যুক্ত করে সেটাকে নিচে টেনে ছেড়ে দিলে যখন সেটা উপর-নিচ করতে থাকে, সেটিও এই সরল স্পন্দন গতির উদাহরণ। স্প্রিংটিকে তার সাম্য অবস্থা থেকে টেনে লম্বা করে যখন ভরটিকে সবচেয়ে নিচের অবস্থানে নামিয়ে আনা হয় তখন তার ভেতরে একটা বিভব শক্তির সৃষ্টি হয়। ভরটিকে ছেড়ে দিলে এই বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং

আগের উদাহরণের মতো গতিশক্তিটি সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানোর পর পুরোটাই বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। স্প্রিংটি যখন তার সাম্য অবস্থা থেকে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়, এই দুই অবস্থাতেই তার ভেতরে বিভব শক্তির সৃষ্টি হয়। এভাবে ছবিতে দেখানো উপায়ে ভরটি বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির মাঝে রূপান্তরিত হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে।

সরল স্পন্দন গতিতে গতিশীল বস্তু যখন একদিকে সর্বোচ্চ দূরত্বে যায়, সাম্যাবস্থা থেকে তার সেই দূরত্বকে বলে বিস্তার। সরল স্পন্দন গতির দোলনকালটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য সব সময় নির্দিষ্ট থাকে, তাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। দোলন কাল পরিবর্তন করতে হলে সেই নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। উপরের শ্রেণিতে তোমরা যখন এই বিষয়ে আরও জানবে তখন দেখবে যে, গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় l দৈর্ঘ্যের একটি সরল দোলকের জন্য পর্যায়কাল T হলে:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

যেখানে g হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ। এই সূত্রটি দেখে তুমি বলতে পারবে, শুধু সুতার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করলেই তুমি দোলনকালের পরিবর্তন করতে পারবে।

6.2 তরঙ্গের ধারণা

পুকুরে ঢিল ছুড়লে পানির তরঙ্গ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে।

তোমরা সবাই পানিতে ঢেউ সৃষ্টি হতে দেখেছ। পুকুরের পানিতে একটা ঢিল ছুড়লে যেখানে ঢিলটি পড়ে সেই বিন্দু থেকে বৃত্তাকারে একটি তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদী দিয়ে একটা লঞ্চ গেলে তার ঢেউ নদী অতিক্রম করে একটু পরে তীরে এসে আঘাত করে। কোথাও একটা দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলে দড়ির একটা ঢেউকে দড়ি বেয়ে যেতে দেখবে। একটা লম্বা স্প্রিং টান টান করে রেখে তার এক মাথা খানিকটা সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে তুমি সেই সংকোচনকে স্প্রিংয়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখবে। এর সবগুলোই এক ধরনের তরঙ্গ, এবং প্রতিটি উদাহরণের বেলায় আমরা দেখেছি কোনো এক ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই তরঙ্গটি একটি মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সেই শক্তিটুকু বহন করে নিয়ে যায়। তবে তরঙ্গের বেলায় যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে, যদিও মাধ্যমটি তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমটি কিন্তু তার স্থান পরিবর্তন করছে না। আমাদের উদাহরণের দড়ি, পানি কিংবা স্প্রিং কোনোটাই কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে যাচ্ছে না অথচ তার ভেতর দিয়ে তরঙ্গের স্পন্দন আরেক মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা সবাই শব্দের কথা জানি, শব্দ আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু সেটিও আসলে এক ধরনের তরঙ্গ এবং সেটিও বাতাসকে মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছায়, কিন্তু বাতাস তার স্থান পরিবর্তন করে না।

» তরঙ্গ হলো মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়া, যেখানে মাধ্যমের বিভিন্ন অংশ নিজের অবস্থানে স্পন্দিত হয়ে শক্তিটুকু এগিয়ে দেয়, কিন্তু মাধ্যম নিজে তার অবস্থান ছেড়ে এগিয়ে যায় না।

6.2.1 তরঙ্গ ও সরল স্পন্দন গতি

তোমরা যারা পুকুরে ঢিল ছুড়ে পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করেছ তারা তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তরের বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে। পুকুরের পাড় থেকে আমরা যখন ঢিল ছুড়ে দেই, তখন ঢিলটি যেহেতু একটি গতিতে ছুটে যায় কাজেই তার একটি গতিশক্তি থাকে। এই শক্তি নিয়ে ঢিলটি যখন পানির পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে, তখন ঐ স্থানের পানির কণাগুলোতে সেই শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে একটা স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। সেই স্পন্দনটি তার পাশের পানির কণাগুলোতে একটি স্পন্দন তৈরি করে, যেটি আবার তার পাশের কণাগুলোতে স্পন্দন তৈরি করে। এভাবে স্পন্দনটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং আমরা দেখতে পাই, কেন্দ্র থেকে বৃত্তের মতো একটি ঢেউ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি পুকুরে কোনো কচুরিপানা ভেসে থাকে তাহলে দেখবে তার নিচে দিয়ে ঢেউটি যাওয়ার সময় কচুরিপানাটি নিজের জায়গাতেই উপরে নিচে করেছে কিন্তু ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেনি। অর্থাৎ, মাধ্যম নিজে সরেনি, শুধু নিজের স্থানে স্পন্দিত হয়ে তরঙ্গটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে , অর্থাৎ শক্তিটি পৌঁছে দিয়েছে।

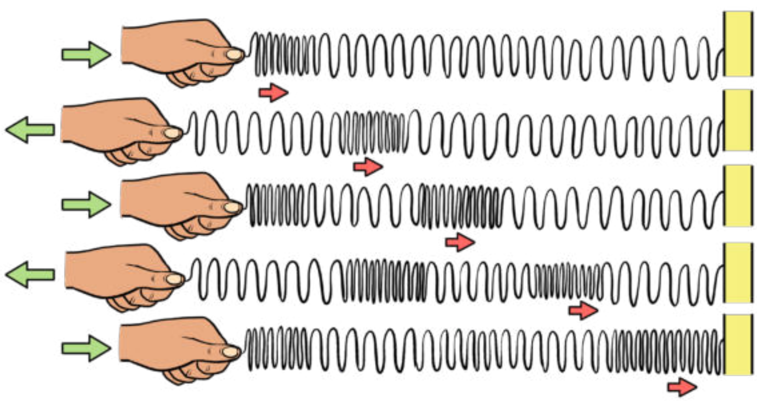

স্প্রিংয়ের একপ্রান্ত প্রসারিত এবং সংকুচিত করে তার ভেতর একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।

তোমরা এবারে নিশ্চয়ই তরঙ্গের সঙ্গে সরল স্পন্দন গতির সম্পর্কটা বুঝতে পারবে। যখন কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে একটি তরঙ্গ এগিয়ে যায় তখন তুমি যদি সেই মাধ্যমের কোনো একটি নির্দিষ্ট

বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকো তাহলে তুমি সেই বিন্দুটির একটি সরল স্পন্দন গতি হতে দেখবে। মাধ্যমের একটি বিন্দুর সরল স্পন্দন গতি হওয়ার সময়ে সেটি তার পাশের বিন্দুতে সরল স্পন্দন গতি সৃষ্টি করে এবং এভাবে একটি তরঙ্গ এগিয়ে যায়। সরল স্পন্দন গতি তরঙ্গ নয় কিন্তু তরঙ্গের প্রত্যেকটা বিন্দু আলাদা আলাদাভাবে একটি করে সরল স্পন্দন গতি।

যদিও আমরা তরঙ্গের প্রবাহের বেলায় একটি মাধ্যমের কথা বলেছি, কিন্তু কিছু তরঙ্গ আছে যার প্রবাহের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আলো সেরকম একটি তরঙ্গ, এবং আমরা জানি সূর্য থেকে আলো মহাকাশের ভেতর দিয়ে কোনো মাধ্যম ছাড়াই পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। এই অধ্যায়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা যে সকল তরঙ্গের মাধ্যমের প্রয়োজন হয় শুধু সেই সকল তরঙ্গের মাঝে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

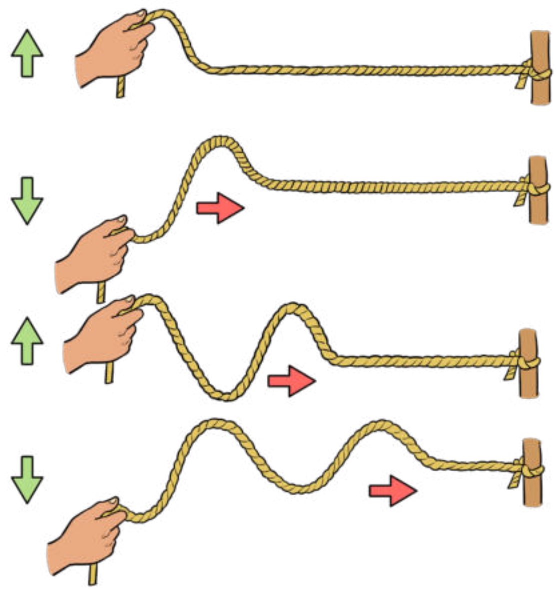

দড়ির একপ্রান্ত উপর-নিচ করে তার ভেতর একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।

6.2.2 তরঙ্গের প্রকারভেদ

তরঙ্গের ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, এখানে মাধ্যম তার নিজের অবস্থানে থেকেই কম্পনের মাধ্যমে শক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। মাধ্যমের কণাগুলোর দুভাবে কম্পন হতে পারে। লম্বা একটা স্প্রিঙের একপ্রান্ত কোনো একটা জায়গায় শক্ত করে আটকে নিয়ে অন্য প্রান্তটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে সামনে পিছনে করলে তুমি দেখবে সংকোচন ও প্রসারণের একটি তরঙ্গ স্প্রিঙের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকোচন ও প্রসারণ হচ্ছে স্প্রিঙের স্পন্দন। একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো, এখানে তরঙ্গটি যেদিকে গেছে, স্প্রিঙের স্পন্দন বা কম্পনও সেই রেখা বরাবরই হয়েছে। এই ধরনের তরঙ্গকে 'অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ' (longitudinal wave) বলা হয়। স্প্রিঙের তরঙ্গের মতো শব্দও একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, বাতাসে প্রসারণ ও সংকোচন করে শব্দ এগিয়ে যায়।

আবার মোটামুটিভাবে লম্বা একটা দড়ির একপ্রান্ত যদি কঠিন কোনো কিছুতে টানটান করে অন্যপ্রান্ত নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উপরে নিচে কর তাহলে কী হবে? এবারেও তুমি একটা তরঙ্গকে দড়ির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখবে। তবে এবারে দড়িটি ঢেউয়ের মতো উপরে উঠে এবং নিচে নেমে তরঙ্গটিকে এগিয়ে নেবে। একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো, এখানে তরঙ্গটি যেদিকে গেছে, দড়িটির স্পন্দন বা কম্পন হয়েছে তার সাথে লম্ব ভাবে। এই ধরনের তরঙ্গকে 'অনুপ্রস্থ তরঙ্গ' বা (transverse wave) বলা হয়। পানির ঢেউ একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। আমরা আলো দেখতে পেলেও

আলোর তরঙ্গটি দেখতে পাই না, সেটিও একধরনের অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। তোমাদের আশপাশের যে নানা ধরনের তরঙ্গ রয়েছে তুমি কি তাদের ভেতর থেকে অনুপ্রস্থ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গগুলো আলাদা করতে পারবে?

» একটি তরঙ্গের মাধ্যম যখন তরঙ্গের দিকে স্পন্দিত হয়ে এগিয়ে যায় তখন তাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। তরঙ্গের মাধ্যম যখন তরঙ্গের সঙ্গে লম্বভাবে স্পন্দিত হয়ে এগিয়ে যায় তখন তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে।

6.2.3 তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কিছু রাশি

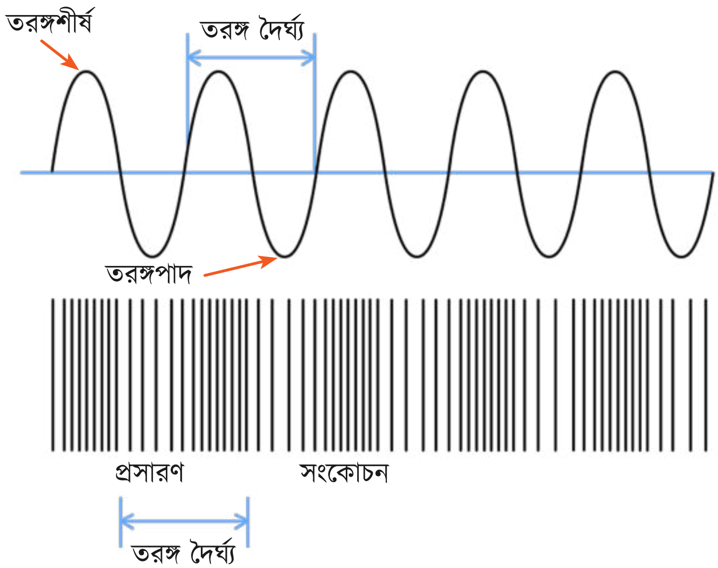

তরঙ্গশীর্ষের শুরু থেকে ঠিক পরের তরঙ্গপাদের শেষ অংশটাকে বলে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য'

পাশের ছবিতে একটি অনুপ্রস্থ এবং একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের ছবি দেওয়া হয়েছে। তরঙ্গ দুটি দেখতে একেবারে ভিন্ন হলেও তাদের ভেতর একটি বড়ো মিল রয়েছে, সেটি হচ্ছে দুটি তরঙ্গেই তাদের স্পন্দনটির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পন বা স্পন্দনের যে অংশ সাম্য অবস্থার সবচেয়ে উপরে থাকে তাকে বলে তরঙ্গশীর্ষ। আবার যে অংশ সাম্য অবস্থার সবচেয়ে নিচে থাকে তাকে বলে তরঙ্গপাদ। একইভাবে অনুদৈর্ঘ্য তরঙের বেলায় কম্পন বা স্পন্দনের যে অংশ সাম্য অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি সংকুচিত থাকে তাকে বলে তরঙ্গশীর্ষ। আবার যে অংশ সাম্য অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত থাকে তাকে বলে তরঙ্গপাদ। একটা তরঙ্গশীর্ষ থেকে শুরু থেকে ঠিক পরের তরঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্য বা একটা তরঙ্গপাদ থেকে শুরু থেকে ঠিক পরের তরঙ্গপাদের দৈর্ঘকে বলে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য' (wavelength)। এটি যেহেতু আসলে একটি দৈর্ঘ্য, তাই একে মাপা হয় সেন্টিমিটার কিংবা মিটারে, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের এককে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে গাণিতিকভাবে প্রকাশের জন্য সাধারণত গ্রিক λ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়, এর উচ্চারণ ল্যাম্বডা।

দড়ি কিংবা পানির ঢেউয়ের ক্ষেত্রে একটা বিষয় নিশ্চয়ই বুঝেছ যে তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তিটুকু বয়ে নিতে একটু সময়ের প্রয়োজন। শব্দ কিংবা আলোর বেলায় আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু সেখানেও তরঙ্গকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ঠিক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাণ দূরত্ব সরতে

যেটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে 'পর্যায়কাল' (period) বলে। এটি যেহেতু একটি সময়, তাই একে মাপা হয় মিনিট কিংবা সেকেন্ডে, অর্থাৎ সময়ের এককে। পর্যায়কালকে গাণিতিকভাবে প্রকাশের জন্য ইংরেজি T অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়। আবার, এক সেকেন্ডে যে কয়টা তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট অবস্থান অতিক্রম করে তাকে কম্পাঙ্ক (frequency) বলা হয়। কম্পাঙ্ক গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি f অক্ষরটি দিয়ে, আর একে মাপা হয় হার্টজ (Hertz) এককে। একটি তরঙ্গের কম্পন যত কম তার পর্যায়কাল তত বেশি, কারণ কম্পাঙ্ক হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে পর্যায়কালের সংখ্যা, অর্থাৎ,

$$f = \frac{1}{T}$$

যেহেতু T-এর একক হচ্ছে সেকেন্ড বা s, তাই হার্টজের এককটি আসলে s^{-1} বা 'প্রতি সেকেন্ড' নির্দেশ করে। অর্থাৎ একটি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 100 হার্টজ কথাটির অর্থ হচ্ছে তরঙ্গটির একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে তাকিয়ে থাকলে আমরা তার বিস্তারকে প্রতি সেকেন্ডে 100 বার কম্পিত হতে দেখব।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে তরঙ্গের কয়েকটি রাশিমালা আমরা সরল স্পন্দন গতির বেলাতেও ব্যবহার করেছিলাম। তরঙ্গ ও সরল স্পন্দন গতি, দুটিতেই পর্যায়কাল বা দোলনকাল রয়েছে, দুটিতেই আমরা কম্পাঙ্কের ধারণা ব্যবহার করতে পারি, এবং দুটির জন্যই বিস্তার রাশিটি প্রযোজ্য। তবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রাশিটি শুধু তরঙ্গের বেলায় প্রযোজ্য সরল স্পন্দন গতির কোনো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নেই। ঠিক একইভাবে তরঙ্গের বেগ বলে একটি রাশিও শুধু তরঙ্গের বেলায় প্রযোজ্য সরল স্পন্দন গতির কোনো বেগ নেই।

এক সেকেন্ডে একটি তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটিই হচ্ছে তার বেগ। যেহেতু একটি তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে f সংখ্যক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে কাজেই তরঙ্গটি প্রতি সেকেন্ডে f দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ তরঙ্গের বেগ v হচ্ছে,

$$v = f\lambda \text{ m/s}$$

তরঙ্গের বেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গদৈর্ঘ্য

যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ নির্দিষ্ট হয়, কাজেই কম্পাঙ্ক যত বেশি হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম হবে, আবার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি হবে কম্পাঙ্ক তত কম হবে। শব্দের কম্পাঙ্ক এর তীক্ষ্ণতা নির্ধারণ করে, আবার আলোর কম্পাঙ্ক আলোর রঙ নির্ধারণ করে। নীল আলোর কম্পাঙ্ক বেশি তাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম, আবার উল্টোদিকে লাল আলোর কম্পাঙ্ক কম কাজেই এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি।

৬.3 শব্দের উৎপত্তি

ধাতব কোনো পদার্থের তৈরি থালা তোমরা সবাই দেখেছ। এরকম একটি থালা হাত থেকে পড়ে গেলে ঝনঝন করে শব্দ হয়। এরকম একটা থালা খুঁজে হাতে নিয়ে তার এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে চামচ দিয়ে মাঝখানে একটা আঘাত দিলে তোমরা একটা ধাতব শব্দ শুনতে পাবে, তখন ভালো করে তাকালে দেখবে থালাটা কাঁপছে। থালার মাঝে হাত দিয়ে কম্পনটি থামিয়ে দিলে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে শব্দটিও থেমে গেছে। এখান থেকেই বোঝা যায় যে কম্পনের সাথে শব্দের একটা সম্পর্ক আছে। কথা বলার সময় গলার নিচে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে দেখবে সেখানে এক ধরনের কম্পন হয়। এখানে 'স্বরতন্ত্রী' (Vocal Chord) নামে একটা পর্দা কাঁপিয়ে আমরা কথা বলে থাকি। যে কোনো বস্তুর কম্পন থেকেই উৎপন্ন হতে পারে 'শব্দ' যা মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণী কানের মাধ্যমে অনুভব করে। শব্দ আসলে বস্তুর কম্পন থেকে পার্শ্ববর্তী মাধ্যমে সৃষ্ট অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। সব কম্পাঙ্কের শব্দ শোনা যায় না। মানুষের শ্রাব্যতার সীমা 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ, অর্থাৎ মানুষ সাধারণত 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পায়। অন্যান্য প্রাণীদের কান এর চেয়েও সংবেদনশীল হতে পারে। 20 হার্টজ থেকেও কম কম্পাঙ্কের কম্পনকে সাবসনিক (subsonic) আর 20000 হার্টজ থেকেও কম কম্পাঙ্কের কম্পনকে আলট্রাসনিক (ultrasonic) কম্পন বলে।

বিড়ালের শ্রাব্যতার সীমা 48 হার্টজ থেকে 85,000 হার্টজ পর্যন্ত!

৬.৫ শব্দের গতি

একটু আগেই আমরা জেনেছি যে তরঙ্গের বেগ আছে। শব্দ যেহেতু একটি তরঙ্গ তাই কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দেরও একটি নির্দিষ্ট বেগ রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমের সংকোচন-প্রসারণ যেহেতু একইভাবে হয় না, তাই মাধ্যমভেদে শব্দের বেগও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কঠিন পদার্থের অণুগুলো যেহেতু শক্তভাবে পদার্থের একটি খণ্ড হিসেবে যুক্ত থাকে তাই এক টুকরো কঠিন পদার্থের একপ্রান্তে নাড়ালে সেই কম্পনটি খুব দ্রুত অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যায়। সে কারণে কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি। আবার তরল পদার্থের অণুগুলো একটু ঢিলেঢালাভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই তরল পদার্থের একপ্রান্তে সৃষ্ট কম্পন অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে একটু দেরী হয়। অর্থাৎ, তরল মাধ্যমে শব্দের বেগ কঠিন মাধ্যমের চেয়ে কম। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে, বায়বীয় পদার্থের একপ্রান্তে সৃষ্ট সংকোচন-প্রসারণ অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে, তাই বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম। কাজেই দেখতে পাচ্ছ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বেগে যায়। যেখানে বাতাসে শব্দের বেগ 332 m/s, সেখানে পানিতে শব্দের বেগ প্রায় চারগুণ বেশি, 1481 m/s এবং লোহাতে শব্দের বেগ পানি থেকে প্রায় আরও তিনগুণ বেশি, 5120 m/s!

উদাহরণ : সুর শলাকা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কম্পনের শব্দ তৈরি করা যায়। 830 Hz কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকা কম্পিত করা হলে এই শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত? (ধরে নাও বাতাসে শব্দের বেগ 332 m/s)

সমাধান : এখানে, সুরশলাকার কম্পাঙ্ক f = 830 Hz, আর বাতাসে শব্দের বেগ, v = 332 m/s, বের করতে হবে বাতাসে এই শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত।

শব্দের বেগ যেহেতু $v=f\lambda$ বা $\lambda = v/f$

কাজেই,

$$\lambda = \frac{332}{830} = 0.4m$$

শব্দ যেহেতু তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত এক প্রকার শক্তি, তাই অন্যান্য তরঙ্গের মতো শব্দতরঙ্গও বাধা পেলে আবার উল্টো দিকে ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়, এক্ষেত্রে অনেক সময় একই শব্দ আবার শোনা যায়, যাকে বলা হয় প্রতিধ্বনি। এজন্য বড়ো একটি খালি ঘরের মাঝখানে শব্দ করলে একধরনের গমগমে শব্দ শোনা যায়। যথেষ্ট দূরে বড়ো দেয়াল কিংবা পাহাড়ের সামনে শব্দ করলেও অনেক সময় পরিষ্কার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। পর্যাপ্ত গভীরতার কুয়ার মুখে শব্দ করলেও প্রতিধ্বনি ঘটতে পারে। প্রতিধনির ক্ষেত্রে শব্দকে উৎস থেকে বাধা পর্যন্ত দূরত্ব একবার যেতে হয়, আবার একই দূরত্ব ফিরে আসতে হয়। অর্থাৎ, উৎস থেকে বাধার মাঝের যে দূরত্ব, এর ঠিক দ্বিগুণ দুরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হয়। আমরা যদি মূল শব্দের আর প্রতিধ্বনির মাঝে সময়ের পার্থক্যটুকু সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারি, তবে এ থেকেই শব্দের বেগ নির্ণয় করে ফেলা যায়। তাহলে উৎস থেকে বাধাটি d দূরত্বে অবস্থিত হলে এবং শব্দ ও প্রতিধ্বনির মাঝে t পরিমাণ সময়ের পার্থক্য থাকলে লেখা যায় :

$$\text{শব্দের বেগ, } v = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{প্রয়োজনীয় সময়}} = \frac{\text{উৎস ও বাধার দূরত্বের দ্বিগুণ}}{\text{মূল শব্দ ও প্রতিধ্বনির সময় পার্থক্য}} = \frac{2d}{t}$$

উদাহরণ : মানুষ 0.1 সেকেন্ডের ভেতর আসা দুটি শব্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না তাই প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস থেকে বাধার দূরত্ব কমপক্ষে কত হতে হবে?

সমাধান : শব্দটি কমপক্ষে 0.1 সেকেন্ড পরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে হবে। শব্দের বেগ 332 m/s ধরে নিলে আমরা বলতে পারি শব্দটিকে 332 x 0.1 = 33.2 m দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। শব্দটিকে যেহেতু উৎস থেকে বাধায় পৌঁছে আবার উৎসে ফিরে আসতে হয়, অর্থাৎ উৎস থেকে বাধার দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে কাজেই প্রকৃত দূরত্ব হবে 33.2 m এর অর্ধেক বা 17 মিটারের কাছাকাছি।

আবার, মাধ্যমে শব্দের বেগ যদি আগেই জানা থাকে তাহলে প্রতিফলিত শব্দ কত সময় পরে ফিরে এসেছে সেখান থেকে উৎস থেকে বাধার দূরত্ব $d = vt/2$ বের করা যায়।

$$\text{উৎস থেকে বাধার দূরত্ব} = \frac{\text{মাধ্যমে শব্দের বেগ} \times \text{শব্দ ও প্রতিধ্বনির সময় পার্থক্য}}{2}$$

অর্থাৎ, শব্দের প্রতিধ্বনি থেকে কেবল ঘড়ি ধরে সময়ের পার্থক্য মেপেই আমরা বাধাটি কত দূরে আছে, সেটা বের করে ফেলতে পারব। সত্যি বলতে কি, পানির নিচে চলমান ডুবোজাহাজ ঠিক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বাধা এড়িয়ে চলাচল করে থাকে। যে যন্ত্রে খুব সূক্ষ্মভাবে সময় মেপে এই দূরত্ব নির্ণয় করা হয় তার নাম সোনার (Sonar)। প্রকৃতিতেও বাদুড় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শিকারের দূরত্ব কিংবা সামনে থাকা বাধা কত দূরে আছে, সেটা নির্ণয় করে। সমুদ্রের গভীরতা মাপতেও প্রতিধ্বনির ব্যবহার আছে। বিজ্ঞানীরা একই পদ্ধতিতে মাটির কত নিচে পানির স্তর কিংবা খনিজ পদার্থের স্তর আছে, সেটিও পরিমাপ করে থাকেন।

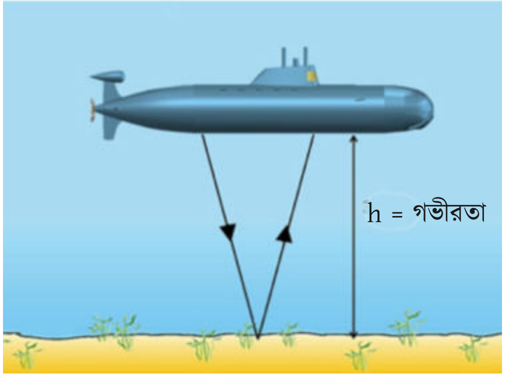

ডুবোজাহাজ প্রতিধ্বনির সময় থেকে গভীরতা পরিমাপ করে।

উদাহরণ : তুমি একটি পাহাড় থেকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে একটি হাততালি দেয়ার ঠিক 6 s পরে আরেকটি হাততালির শব্দ শুনতে পেলে। তুমি পাহাড় থেকে কতদূরে আছ বলতে পারবে? (বাতাসে শব্দের বেগ হিসেবে 332 m/s ব্যবহার করতে পারো।)

সমাধান : এখানে, বাতাসে শব্দের বেগ v = 332 m/s আর প্রয়োজনী সময় t = 6 s, বের করতে হবে দূরত্ব d কত? আমরা জেনেছি,

$$d = \frac{vt}{2} = \frac{332 \times 6}{2} = 996\ m$$

অধ্যায় ৭

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ

অধ্যায় ৭ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ চাঁদের সৃষ্টি
- ☑ সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের অবস্থান
- ☑ উপছায়া ও প্রচ্ছায়া
- ☑ সূর্যগ্রহণ
- ☑ আংশিক, পূর্ণগ্রাস ও বলয় সূর্যগ্রহণ
- ☑ পরিবেশের উপর সাময়িক প্রভাব: পশুপাখি এবং তাপমাত্রা
- ☑ সূর্য সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ, এনালেমা
- ☑ চন্দ্রগ্রহণ: পূর্ণ এবং আংশিক চন্দ্রগ্রহণ
- ☑ পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব
- ☑ পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের পরিবর্তন

আমরা আগের শ্রেণিতে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা পেয়েছি, এই অধ্যায়ে আমরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে আরও একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব। গ্রহণের সময় সূর্য অথবা চন্দ্র সাময়িকভাবে আকাশে ঢাকা পড়ে যায়। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে যে কক্ষপথে ঘোরে তা ঠিক সুষম বৃত্তাকার নয়, বরং সামান্য চ্যাপ্টা বা উপবৃত্তাকার। ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় একইরকম থাকে না। সূর্যের চারপাশে একটি পূর্ণ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতে পৃথিবীর সময় লাগে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 47 সেকেন্ড। এই সময়কে পৃথিবীর হিসেবে আমরা এক বছর বলি। পৃথিবী যেভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঠিক তেমনি পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদও পৃথিবীকে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। তবে চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের সাথে প্রায় 5° হেলানো অবস্থায় থাকে। চাঁদের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে 27 দিনের কিছু বেশি (27.3 দিন) সময় লাগে। কিন্তু চান্দ্রমাস পূর্ণ হতে আরও দুইদিন বেশি প্রয়োজন

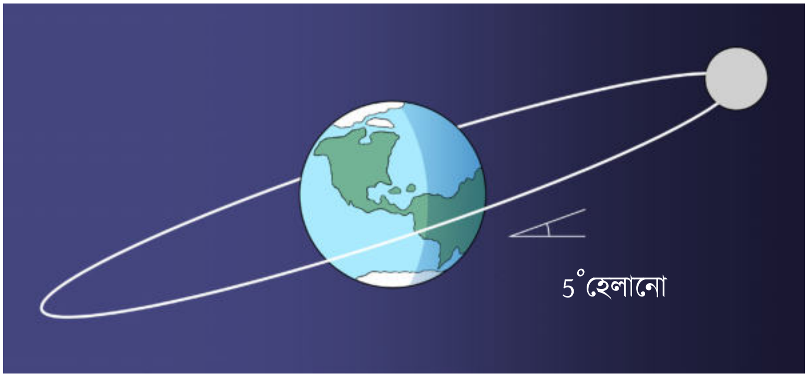

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

হয়, কারণ 27.3 দিনে পৃথিবীটা সূর্যকে ঘিরে আরও খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এই দূরত্ব অতিক্রম করে পৃথিবীকে তার নতুন অবস্থানে যাওয়ার জন্য চান্দ্রমাস শুরুর নতুন চাঁদ দেখার জন্য আরও বাড়তি দুইদিন অপেক্ষা করতে হয়। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ এবং পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের প্রদক্ষিণ করার ফলে কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে যার কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হলো।

7.1 চাঁদের উৎপত্তি

চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মতবাদটি হচ্ছে 'সংঘর্ষ' মতবাদ। চন্দ্রাভিযানের পর চাঁদ থেকে নিয়ে আসা চাঁদের মাটি বিশ্লেষণ করে তার সাথে পৃথিবীর মাটির বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। সেজন্য অনুমান করা হয় সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রথমিক সময়টিতে 'থিয়া' নামের প্রায় মঙ্গল গ্রহের সমান একটি গ্রহের সাথে পৃথিবীর একটি ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে পৃথিবীর একটি অংশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করে, যেটাকে আমরা এখন চাঁদ বলি। তোমরা যারা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, চাঁদ সব সময় তার একটি পৃষ্ঠ পৃথিবীর দিকে মুখ করে প্রদক্ষিণ করে, সেজন্য আমরা সব সময় চাঁদের একটি পৃষ্ঠই দেখতে পাই, অন্য পৃষ্ঠটি কখনো দেখতে পাই না।

7.2 সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের অবস্থান

পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় 109 গুণ বেশি। আবার চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের মাত্র 27%। অর্থাৎ চাঁদের তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় 400 গুণ বেশি। অপরদিকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যে গড় দূরত্ব (1,500 লক্ষ কিলোমিটার) সেটি পৃথিবী ও চাঁদের মাঝে গড় দূরত্ব (3.84 লক্ষ কিলোমিটার) থেকে 400 গুণ বেশি। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ একই সরলরেখায় অবস্থান করে। ফলে কখনো পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে যেটি হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ আবার কখনো চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে যেটি হচ্ছে সূর্যগ্রহণ। সূর্যের আলো পৃথিবী কিংবা চাঁদে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই ছায়া সৃষ্টি করে। আলোর উৎস যদি একটি বিন্দু হয় তাহলে সেটি সুস্পষ্ট (sharp) ছায়া সৃষ্টি করে, কিন্তু সূর্যের আকার অতিকায় তাই তোমরা দেখেছ সূর্যের আলোতে সৃষ্ট ছায়া কিনারায় একটুখানি অস্পষ্ট। তার কারণ সূর্য দুই ধরনের ছায়া তৈরি করে, উপছায়া এবং প্রচ্ছায়া।

উপছায়া (Penumbra)

যখন একটি বস্তু আলোর উৎসের একটি অংশকে বাধাপ্রাপ্ত করে ছায়া তৈরি করে কিন্তু আলোর উৎসের অন্য অংশ এই ছায়াতে পতিত হয়ে আংশিক ভাবে আলোকিত করে তখন তাকে উপছায়া বলে। সে কারণে এই ছায়া আংশিক অন্ধকার হয়। স্বাভাবিকভাবেই উপছায়া অনেক বড়ো অংশ জুড়ে অবস্থান করে।

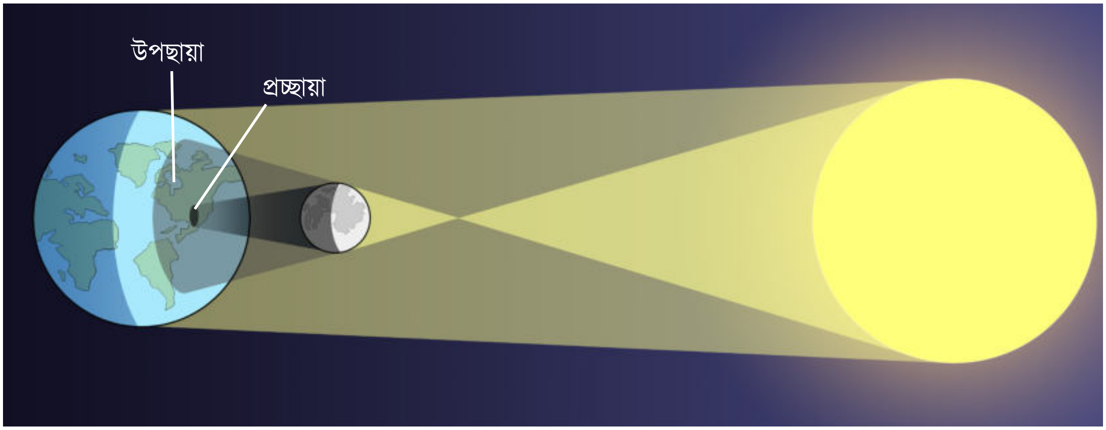

সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই সরলরেখায় থাকে। ফলে চাঁদের উপছায়া ও প্রচ্ছায়া পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে। এখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখানো হয়েছে।

প্রচ্ছায়া (Umbra)

যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের কারণে উৎস থেকে আলোটি সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছায়া তৈরি করে তখন তাকে প্রচ্ছায়া বলে। এই ছায়া গাঢ় ধরনের হয় এবং গ্রহণের সময় প্রচ্ছায়া অঞ্চল কিছু সময়ের জন্য গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়। প্রচ্ছায়া, উপছায়ার তুলনায় অনেক কম এলাকা জুড়ে অবস্থান করে।

7.3 সূর্যগ্রহণ

যখন চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময়ে ঠিক সূর্য ও পৃথিবীর মাঝামাঝি এসে পড়ে তখন সেটি সূর্যের আলোকে পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয়—অর্থাৎ চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কিছু অংশের উপরে পড়ে। এ ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলে।

এ সময় সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে। সূর্যগ্রহণ বিভিন্ন রকম হতে পারে; যেমন—আংশিক, পূর্ণগ্রাস, বলয় এবং হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাস থেকে 400 গুণ বড়ো, তারপরেও চাঁদ কীভাবে সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারে? কারণটি সহজ, চাঁদ সূর্যের তুলনায় ছোট হলেও এটি পৃথিবীর 400 গুণ কাছে অবস্থান করে সেজন্য পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চাঁদ ও সূর্যকে প্রায় একই আকারে দেখা যায়। চাঁদের কক্ষপথ খানিকটা উপবৃত্তাকার, এটি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হয় 3.63 লক্ষ কিমি, যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হয় 4.05 লক্ষ কিমি। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচাইতে বেশি হলে তাকে বলে অপভূ (apogee) এবং চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্ব সবচাইতে কম হলে তাকে বলে অনুভূ (perigee)।

7.3.1 আংশিক সূর্যগ্রহণ (Partial solar eclipse)

পৃথিবী ও সূর্যের মাঝামাঝি অবস্থানকালে চাঁদ যদি সূর্যের খানিকটা অংশ ঢেকে ফেলে তবে আংশিক সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে যে স্থানে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যায় সেখানে সূর্যকে চাঁদ দ্বারা আংশিক ঢাকা অবস্থায় দেখা যায়। আংশিক সূর্যগ্রহণের সময় মূলত উপছায়ার প্রাধান্য বেশি থাকে।

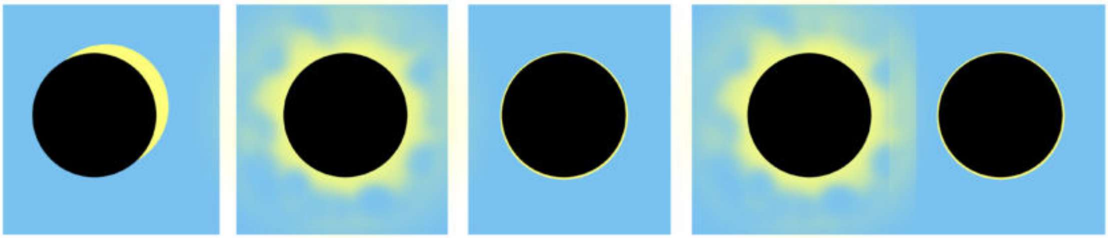

বিভিন্ন প্রকার সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী থেকে সূর্যকে বিভিন্ন রকম দেখায়। (ক) আংশিক সূর্যগ্রহণ (খ) পূর্ণ সূর্যগ্রহণ (গ) বলয় সূর্যগ্রহণ (ঘ) হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ: যেখানে পৃথিবীর কোথাও পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এবং কোথাও বলয় সূর্যগ্রহণ।

7.3.2 পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ (Total solar eclipse)

গ্রহণের সময় সূর্য যদি চাঁদের দ্বারা সম্পূর্ণ ঢেকে যায় তবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। আমরা জানি, চাঁদ পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। ফলে কখনো কখনো চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করে (অনুভূ) তখন চাঁদকে তুলনামূলকভাবে বড়ো দেখা যায়। চাঁদ অনুভূ অবস্থানে থাকার সময় যদি সূর্যগ্রহণ হয় তবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। এরকম সময়ে যে সকল স্থানে প্রচ্ছায়া পড়ে সেই সকল স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্যের চারপাশে তার করোনা দেখা যায়। শুধু এই সময়েই খালি চোখে সূর্যের করোনা দেখা সম্ভব হয় যেটি অন্য কখনো দেখার সৌভাগ্য হয় না।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের শুরু এবং শেষ মূহুর্তে সৃষ্ট ডায়মন্ড রিং

প্রচ্ছায়া খুব সামান্য অংশ জুড়ে থাকে, আবার পৃথিবীও তার নিজ অক্ষে ঘুরতে থাকে। তার ফলে প্রচ্ছায়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে না, এটি পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি রেখাপথ (একে আমরা পূর্ণগ্রাস গ্রহণরেখা বলতে পারি) বরাবর সরতে থাকে। এই রেখাপথ ভূপৃষ্ঠের যে সকল স্থানে পড়ে সে সকল স্থানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ঠিক শুরুর মুহূর্তে যখন পুরো সূর্যটা

ঢেকে গিয়ে শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশ ঢেকে যাওয়া বাকী থাকে এবং শেষ হওয়ার পরের মুহূর্তে যখন পুরোটা ঢেকে যাওয়ার পর ক্ষুদ্র একটা অংশ বের হয়ে আসে তখন সেই অংশে সূর্যের তীব্র আলো দৃশ্যমান হয় এবং সেটি দেখতে অনেকটা হীরার আংটির মতো দেখা যায় বলে তাকে ডায়মন্ড রিং বলে।

7.3.3 বলয় সূর্যগ্রহণ (Annular solar eclipse)

অনেক সময় উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণ কালে চাঁদ এমন অবস্থানে থাকে যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সেটি সম্পূর্ণ সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। তখন চাঁদের চারপাশে সূর্যকে আংটির মতো দেখা যায়। এই ধরনের বলয় আকৃতির সূর্যগ্রহণকে বলয় সূর্যগ্রহণ বলে।

প্রশ্ন: এটা কি কখনো সম্ভব, যে কোনো একটি সূর্যগ্রহণের সময় একইসঙ্গে পৃথিবীর কোনো স্থানে পূর্ণগ্রাস, কোনো স্থানে আংশিক আবার কোনো স্থানে বলয় সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে?

7.3.5 সূর্যগ্রহণের প্রভাব ও গুরুত্ব

সূর্যগ্রহণের সময় পরিবেশের উপর সাময়িক প্রভাব পড়ে। আংশিক গ্রহণ অনেকটা সময় জুড়ে চলতে পারে কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এর সময় সূর্য মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ ঢেকে যেতে পারে। পূর্ণগ্রাস গ্রহণকালীন সময়ে হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় পশুপাখিরা হতচকিত হয়ে যায়। অসময়ে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় অনেক পাখি ভয় পেয়ে ডাকাডাকি বন্ধ করে দেয়, ঝিঁঝিঁ পোকা শব্দ করা শুরু করতে পারে, উদ্ভিদে ফুল বুজে যাওয়া শুরু হতে পারে। কিছু কিছু স্থানে বায়ুর তাপমাত্রাও সামান্য কমে যেতে পারে।

তবে সূর্যগ্রহণ সূর্য সংক্রান্ত গবেষণার কিছু দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন সূর্যের করোনা নিয়ে তথ্য সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো সুযোগ সূর্যগ্রহণের সময় আসে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত হওয়ায় এবং চাঁদ দ্বারা সূর্য ঢেকে যাওয়ার ফলে তখন সূর্যের করোনা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। গ্রহণের সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের অংশে সূর্যের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে বিভিন্ন ধরনের চার্জযুক্ত কণা তৈরি হয়। এই অংশে পৃথিবীর অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ অবস্থান করায় তা পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

7.3.6 সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা

একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে সূর্য থেকে অনেক ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীতে আসে, যার একটি হচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি। আমরা যেহেতু অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পাই না, তাই না জেনে তার দিকে তাকিয়ে চোখের ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারি। সরাসরি সূর্যের দিকে তাকালে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে

চোখের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। সূর্যগ্রহণের সময় সরাসরি সূর্যের দিকে না তাকিয়ে, কোথাও সূর্যের প্রতিচ্ছবি ফেলে সেটা দেখা সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। পিনহোল ব্যবহার করে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা সহজ, একটি শক্ত কাগজে ছোট একটি ছিদ্র করে তার মধ্যে গ্রহণের সময় সূর্যের আলো অপর একটি পর্দায় ফেললে সেখানে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

৭.৫.৫ চন্দ্রগ্রহণ

চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে চলে আসে যে চাঁদ এবং সূর্যের মাঝামাঝি পৃথিবী অবস্থান করে। এক্ষেত্রে সূর্য পৃথিবী এবং চাঁদ এক সরলরেখায় থাকে, ফলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় কখনো পৃথিবীর উপছায়া কখনো প্রচ্ছায়া কিংবা কখনো দুটিই চাঁদের উপর পড়ে।

চন্দ্রগ্রহণ তিন রকম হতে পারে : পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, আংশিক চন্দ্রগ্রহণ এবং উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ।

৭.৫.১ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ (Total lunar eclipse)

পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার মাঝে অবস্থান করে। এ সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা সূর্যের আলোর অপেক্ষাকৃত ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি (যেমন: বেগুনি, নীল ইত্যাদি রঙের আলো) বাইরের দিকে বিচ্ছুরিত হয়। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল আলো ভিতরের দিকে প্রতিসরিত হয়ে চাঁদের উপরে পড়ে, ফলে চাঁদকে তার স্বাভাবিক সাদাটে ধূসর বর্ণের পরিবর্তে লাল বর্ণের দেখা যায়। শুধু পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে তবে চাঁদের কক্ষপথ প্রায় 5° বাঁকানো থাকায় প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় না। সূর্যগ্রহণের তুলনায় চন্দ্রগ্রহণ দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়ে থাকে।

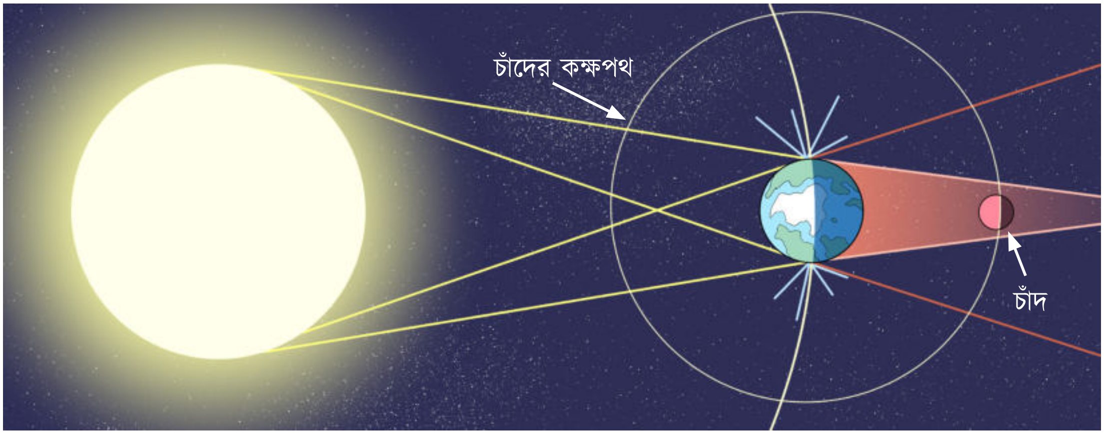

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা সূর্যের আলোর নীল অংশ বাইরের দিকে বিচ্ছুরিত হয় বলে ভিতরের দিকের আলো লালাভ হয়। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় সেই আলোতে চাঁদকে লালচে দেখায়।

7.4.2 আংশিক চন্দ্রগ্রহণ (Partial lunar eclipse)

আংশিক চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ এমনভাবে অবস্থান করে যে চাঁদের কিছু অংশ পৃথিবীর প্রচ্ছায়া এবং বাকি অংশ উপছায়া দ্বারা আবৃত হয়। এক্ষেত্রে চাঁদের কিছু অংশ গাঢ় ছায়ায় আবৃত দেখা যায়।

7.4.3 উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ (Penumbral lunar eclipse)

চাঁদ পৃথিবীর উপছায়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেহেতু উপছায়া প্রচ্ছায়ার তুলনায় হালকা তাই এই ধরনের চন্দ্রগ্রহণ খুব ভালো করে না দেখলে বোঝা যায় না। এ সময় চাঁদকে তার স্বাভাবিক বর্ণের তুলনায় হালকা গাঢ় বর্ণের দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরনের চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবী থেকে যেমন দেখা যায়: যথাক্রমে উপছায়া, আংশিক এবং পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। লক্ষণীয় যে চাঁদের প্রাকৃতিক যে সাদাটে ধূসর বর্ণ, পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় তা থেকে চাঁদকে ভিন্ন রকম দেখা যায়।

7.5 অ্যানালেমা (Analemma)

তোমরা যদি কোনো বিল্ডিং, দেওয়াল, জানালা কিংবা অন্য কোনো স্থাপনার ছায়া একই জায়গায় একই সময় নিয়মিতভাবে দেখে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, সেটি বছরের সব সময় একই রকমভাবে এক জায়গায় দেখা যায় না। বছরের বিভিন্ন সময়ে সেটি ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করে। তার কারণ সূর্য প্রতিদিন একই সময়ে আকাশের একই স্থানে অবস্থান করে না। জুন মাসের 21 তারিখ সূর্য ঠিক কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে থাকে, যেহেতু কর্কটক্রান্তি রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে তাই ঐ সময়ে আমরা সূর্যকে ঠিক মাথার উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি। যতই দিন যেতে থাকে সূর্যটি ততই দক্ষিণ দিকে হেলে যেতে থাকে। ছয় মাস পর ডিসেম্বরের 22 তারিখ সূর্য ঠিক মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে থাকে তাই আমাদের দেশ থেকে আমরা সূর্যকে সবচেয়ে বেশি

হেলানো অবস্থায় পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখি। তারপর সূর্য আবার উত্তর দিকে ফিরে আসতে থাকে এবং ছয় মাস পর আবার ঠিক আমাদের মাথার উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়।

তুমি যদি প্রতিদিন একই সময়ে আকাশের একই দিকে সুনির্দিষ্টভাবে ক্যামেরা বসিয়ে সূর্যের ছবি তোল এবং বছর শেষে সবকটি ছবি একত্র করে একটি ছবি তৈরি কর তাহলে তুমি সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনটি দেখবে, পাশের ছবিতে সেটি দেখানো হয়েছে। বছরের ভিন্ন সময়ে আকাশে এই পর্যায়ক্রমিক সূর্যের অবস্থানকে অ্যানালেমা বলে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এবং তার অক্ষের কাত হওয়ার কারণে অ্যানালেমা বা সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনটি দেখায়। অ্যানালেমার আকৃতি বাংলা চার (4) কিংবা ইংরেজি আটের মতো।

সারা বছর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে আকাশে সূর্যের ছবি তোলা হলে অ্যানালেমা পাওয়া যায়। অ্যানালেমা দেখতে 4 এর মতো। এটি পুরো সৌরবছরে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের অবস্থান নির্দেশ করে।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ অ্যানালেমার দুইটি লুপের মাঝে নিচেরটি বড়ো এবং উপরেরটি ছোটো। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর কক্ষপথ যদি উপবৃত্তাকার না হয়ে বৃত্তাকার হতো তাহলে দুটি লুপের আকার সমান হতো। আবার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হলেও পৃথিবীর অক্ষ যদি 23.5 ডিগ্রিতে হেলানো না হয়ে খাড়া হতো তাহলে অ্যানালেমাটি হতো একটি সরল রেখা। যদি খাড়া অক্ষ এবং একই সাথে বৃত্তাকার কক্ষপথ হতো তাহলে আমরা অ্যানালেমার কোনো আকার পেতাম না, সারা বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যটি স্থান পরিবর্তন না করে একই অবস্থানে থাকতো।

অ্যানালেমা একটি চমকপ্রদ বিষয় যেটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। এটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, এটি সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীর কক্ষপথ এবং অক্ষীয় হেলানোর (Tilt) পরিবর্তনগুলোও শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

7.6 পৃথিবীর কক্ষপথ ও অক্ষের পরিবর্তন

আমরা পৃথিবীর নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনকে আহ্নিক গতি এবং সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণনকে বার্ষিক গতি বলি। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর কাল্পনিক রেখাটি হচ্ছে পৃথিবীর অক্ষ। এই অক্ষটি পৃথিবীর কক্ষপথের সমতলের সাপেক্ষে 23.5° কোণে হেলে থাকে। এই হেলানো অক্ষ নিয়ে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ভ্রমণ করে। যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই কক্ষপথ কিংবা হেলানো কক্ষপথের কোনো পরিবর্তন দেখি না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এবং হেলানো অক্ষ খুবই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। যেহেতু পৃথিবীর কক্ষপথ এবং হেলানো অক্ষ ঋতু পরিবর্তন এবং দিনের আলোর সময়ের দৈর্ঘ্যের জন্য দায়ী, তাই কক্ষপথ ও অক্ষের সূক্ষ্ম পরিবর্তন এই গ্রহের দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু এবং ভূপৃষ্ঠের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে।

7.6.1 কক্ষপথের পরিবর্তন

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ভ্রমণ করে, যার অর্থ সূর্য থেকে এর দূরত্ব সবসময় এক নয়। কখনো এটি সূর্যের একটু কাছে থাকে, কখনো একটু দূরে থাকে। কক্ষপথের যে বিন্দুতে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তাকে অনুসুর (Perihelion) বলা হয়, আর যে বিন্দুতে সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তাকে বলা হয় অপসুর (Aphelion)। অনুসুর ঘটে জানুয়ারির প্রথমদিকে, তখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 14.7 কোটি কিলোমিটার এবং অপসুর ঘটে জুলাইয়ের শুরুর দিকে তখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 15.2 কোটি কিলোমিটার। যখন পৃথিবী অনুসুরে থাকে, তখন এটি অপসুরের

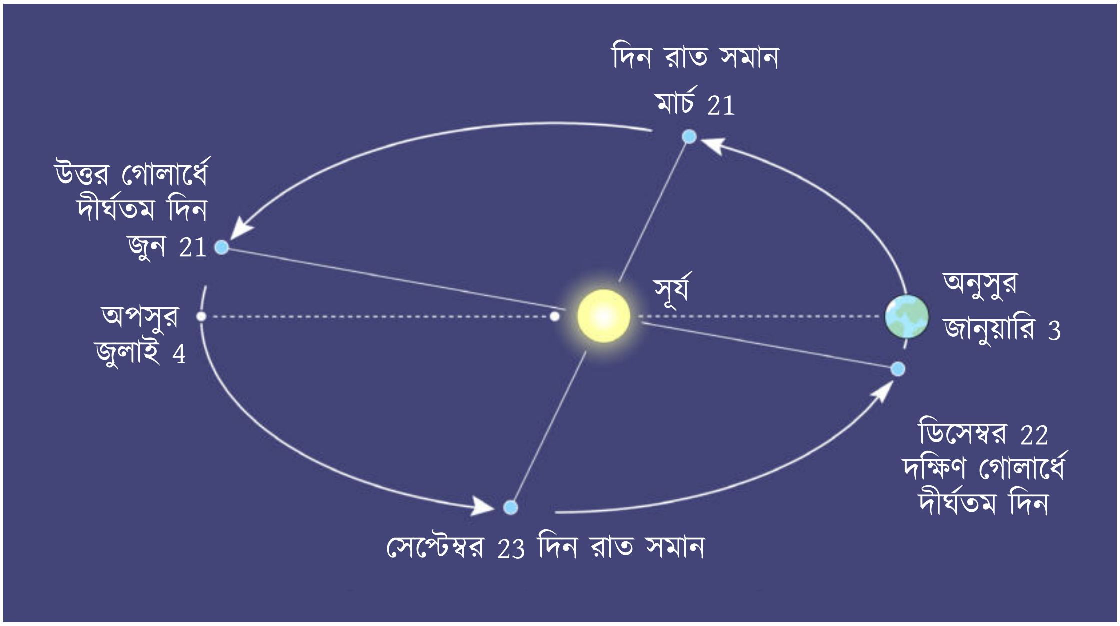

অনুসুর পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে এবং অপসুর সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে।

তুলনায় 3% কাছে থাকলেও প্রায় 7% বেশি সৌর বিকিরণ পায়। এটি একটি ছোট পার্থক্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আসলে পৃথিবীর জলবায়ুর উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার বলা হলেও বর্তমানে এটি আসলে প্রায় বৃত্তাকার। তবে এই কক্ষপথের আকৃতি সবসময় একইরকম থাকে না। প্রতি 90 থেকে 100 হাজার বছরে পৃথিবীর কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার আকৃতি (অর্থাৎ যখন অনুসুর ও অপসুরে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের পার্থক্য সবচেয়ে কম) থেকে সর্বোচ্চ উপবৃত্তাকার আকৃতির (অর্থাৎ যখন অনুসুর ও অপসুরে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের পার্থক্য সবচেয়ে বেশি) মাঝে পরিবর্তিত হয়। সর্বোচ্চ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে থাকা অবস্থায় পৃথিবীর অনুসুর ও অপসুরে সৌর বিকিরণ পাওয়ার পার্থক্য 20% থেকে 30% পর্যন্ত হতে পারে, কাজেই এই দুই অবস্থানে থাকাকালে পৃথিবীর আবহাওয়ার পার্থক্য হবে সবচেয়ে বেশি।

7.6.2 পৃথিবীর অক্ষের অগ্রগতি (Precession)

কখনো কোনো লাটিম ঘুরতে দেখলে খেয়াল করবে এটি একেবারে স্থির হয়ে ঘোরে না, এটি কিছুটা টলমল করে ঘুরতে থাকে। পৃথিবীর অক্ষও ঠিক সেরকম। লাটিমের মাথা টলমল করে ঘুরতে ঘুরতে তার মাথার উপরে শূন্যে একটা কাল্পনিক বৃত্ত তৈরি করে আবার সে তার আগের জায়গায় ফিরে আসে। ঠিক সেরকম পৃথিবীর অক্ষও প্রতি 26 হাজার বছরে মহাকাশীয় গোলকের গায়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। পৃথিবীর উত্তর মেরু যে বিন্দু বা নক্ষত্র বরাবর থাকে সেটাকেই আমরা ধ্রুবতারা বলি। দেখা যাচ্ছে ধ্রুবতারা নামে ধ্রুব হলেও সেটা আসলে পৃথিবীর অক্ষের পরিবর্তনের কারণে সময়ের সাথে পাল্টাচ্ছে। পৃথিবীর অক্ষের এই ঘূর্ণনকে 'পৃথিবীর অক্ষের অগ্রগতি' বলা হয়।

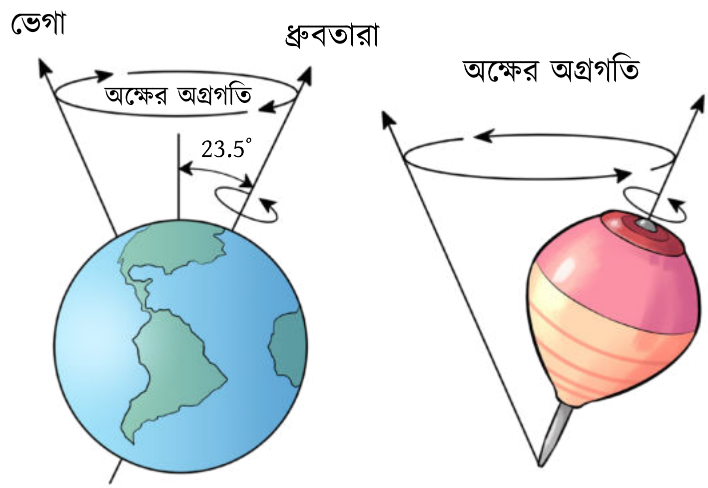

পৃথিবীর অক্ষ 26 হাজার বছরে একবার ঘুরে আসে। অক্ষটি বর্তমানে 23.5° হেলানো আছে, এটি প্রতি 41 হাজার বছরে 22.1° থেকে 24.5°—এর মাঝে পরিবর্তিত হয়।

বর্তমানে পৃথিবীর উত্তরমেরু পোলারিস নক্ষত্রকে নির্দেশ করে বলে সেটাই আমাদের ধ্রুবতারা। আজ থেকে 14 হাজার বছর পরে এটি ভেগা নক্ষত্রের দিকে নির্দেশ করবে, তখন সেটাই হবে নতুন ধ্রুবতারা।

7.6.3 পৃথিবীর অক্ষের তির্যকতা (Obliquity) :

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষপথের সমতলের সাপেক্ষে 23.5° হেলানো অবস্থায় আছে, কক্ষপথের সাপেক্ষে এই হেলানোর পরিমাপকে পৃথিবীর অক্ষের তির্যকতা বলা হয়। পৃথিবীর অক্ষের এই তির্যকতাও খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর তির্যকতা 23.5° কিন্তু এটি খুব ধীরে ধীরে কমছে। প্রায় 41,000 বছরের একটি চক্রে পৃথিবীর তির্যকতা 22.1° থেকে 24.5°—এর মাঝে পরিবর্তিত হয়। এই তির্যকতা যত বেশি হয় ঋতুগুলোর মাঝে আবহাওয়ার পার্থক্য তত বেশি হয়, অর্থাৎ তখন গ্রীষ্মকাল বেশি গরম এবং শীতকালে বেশি শীত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : পৃথিবীর কক্ষপথ সবচেয়ে বেশি উপবৃত্তাকার হওয়া, পৃথিবীর অক্ষের অগ্রগতি এবং পৃথিবীর অক্ষের তির্যকতার হ্রাস-বৃদ্ধি, এই তিনটি পরিবর্তনের মাঝে কোনটি জলবায়ুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করবে এবং কেন?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ৮

রাসায়নিক বিক্রিয়া

অধ্যায় ৮ রাসায়নিক বিক্রিয়া

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ প্রতীক, সংকেত ও যোজনী
- ☑ রাসায়নিক সমীকরণ ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া
- ☑ রাসায়নিক পরিবর্তন
- ☑ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তির রূপান্তর
- ☑ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে, লোহার জিনিসপত্রে মরিচা পড়লে, কোথাও কিছু আগুনে পুড়ে গেলে, কিংবা দেহে আমাদের খাদ্য পরিপাকের সময় আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নতুন পদার্থ তৈরি করে থাকেন। এইসব নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কখনো শক্তি উৎপন্ন হয়, কখনো আমাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র তৈরি হয় আবার কখনো নতুন কোনো ঔষধ তৈরি করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া বোঝার জন্য আমাদের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এই অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

8.1 প্রতীক, সংকেত, যোজনী

আগের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর সকল পদার্থকে তাদের গঠন অনুসারে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, আর তা হচ্ছে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মোট 118টি মৌলিক পদার্থের (elements) সন্ধান পেয়েছেন। সাধারণত এইসব মৌলের পুরো নাম না লিখে ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের প্রথম একটি অথবা দুইটি অক্ষর দিয়ে সংক্ষেপে মৌলটিকে প্রকাশ করানো হয়। মৌলের পুরো নামের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলা হয়। যেমন—হাইড্রোজেন (Hydrogen) এর প্রতীক হচ্ছে H, অক্সিজেন (Oxygen)-এর প্রতীক O, ইত্যাদি।

আবার কোনো মৌল বা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্ত রূপকে সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোনো অণুর সংকেত থেকে এতে বিদ্যমান পরমাণুগুলোর সংখ্যা বোঝা যায়। যেমন—হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2 অর্থাৎ হাইড্রোজেন অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুর সংকেত HCl অর্থাৎ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি ক্লোরিন পরমাণু রয়েছে, ইত্যাদি।

কোনো যৌগের সংকেত লেখার জন্য সেই যৌগের মৌলগুলোর যোজনী সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। মৌলগুলো একে অন্যের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে এবং যোজনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কীভাবে একটি মৌলের পরমাণু অন্য মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হবে। আরও সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা মৌলিক পদার্থের যোজনীকে একেকটি হাতের সাথে তুলনা করতে পারি। যে মৌলের যতগুলো হাত তার যোজনী হবে তত। যেমন— হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন উভয়ের যোজনী এক, তাই উভয়কে আমরা এক হাতবিশিষ্ট মৌল হিসেবে কল্পনা করতে পারি। অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন পরমাণু তার একটি হাত দিয়ে ক্লোরিন পরমাণুর একটি হাতকে ধরে রাখবে। তাই হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন দিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত হচ্ছে HCl। অক্সিজেনের যোজনী দুই, কাজেই আমরা কল্পনা করতে পারি অক্সিজেনের একটি পরমাণুর দুইটি হাত রয়েছে যার মাধ্যমে অক্সিজেন একযোজী বা এক হাতবিশিষ্ট দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে। এ কারনে পানির সংকেত H_2O। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও পানির অণুকে নিম্নরূপভাবে দেখানো হলো :

H-Cl	H-O-H
(হাইড্রোজেন ক্লোরাইড)	(পানি)

উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে, কোনো মৌলের যোজনী হলো ঐ মৌলের একটি পরমাণু কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে সক্ষম। উল্লেখ্য, কোনো যৌগ গঠনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মৌলের সবকটি যোজনী কাজে লাগে বা কোনো হাত ফাঁকা না থাকে!

নিজে করো :

নাইট্রোজেন যোজনী 3 এবং কার্বনের যোজনী 4। তোমরা কি যোজনী ব্যবহার করে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত অ্যামোনিয়ার সংকেত লিখতে পারবে? একইভাবে তোমরা কি কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত মিথেনের সংকেত লিখতে পাবে?

উল্লেখ্য কোনো কোনো মৌলের একাধিক যোজনী থাকতে পারে। যেমন—সালফারের যোজনী 2 ও 4; আয়রনের যোজনী 2 ও 3। নিচের ছকে কিছু মৌলের প্রতীকসহ যোজনী উল্লেখ করা হলো :

মৌলের নাম, তাদের যোজনী ও প্রতীক

মৌল	প্রতীক	যোজনী
হাইড্রোজেন	H	1
ক্লোরিন	Cl	1
সোডিয়াম	Na	1
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	2
সালফার	S	2, 4

মৌল	প্রতীক	যোজনী
অক্সিজেন	O	2
নাইট্রোজেন	N	3
অ্যালুমিনিয়াম	Al	3
আয়রন	Fe	2, 3
কার্বন	C	4

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মতো কিছু পরমাণুগুচ্ছ যৌগ গঠনে অংশ নেয় এবং তারা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। এ জাতীয় পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বা radical বলে। যেমন : SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, NO_3^-, NH_4^+। এখানে, উদাহরণস্বরূপ কিছু যৌগমূলকের যোজনী উল্লেখ করা হলো। যেমন : নাইট্রেট (NO_3^-) ও অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) উভয়ের যোজনী 1, কার্বনেট (CO_3^{2-}) এর যোজনী 2, ফসফেট (PO_4^{3-}) এর যোজনী 3।

৪.1.1 যোজনী ব্যবহার করে যৌগের আণবিক সংকেত লেখার নিয়ম

1) আণবিক সংকেত একটি যৌগের মধ্যে উপস্থিত মৌলের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করে। প্রথমে মৌলগুলোকে তাদের নিজ নিজ প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যৌগে উপস্থিত মৌলসমূহ বা যৌগমূলকের যোজনী সমান হলে সংকেতে যোজনী লেখার প্রয়োজন হয় না। শুধু মৌল বা মূলকগুলো পাশাপাশি লিখতে হবে। যেমন : CaO (ক্যালসিয়াম অক্সাইড), NH_4Cl (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড), ইত্যাদি।

2) উভয় মৌলের বা মূলকের যোজনী কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক হলে ঐ সংখ্যা দিয়ে যোজনীকে ভাগ করে মৌলসমূহের মধ্যে বিনিময় করে লিখতে হবে। যেমন : কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে কার্বন (C) ও অক্সিজেনের (O) যোজনী যথাক্রমে 4 এবং 2। সুতরাং কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত হওয়ার কথা C_2O_4 কিন্তু আমরা দুটি যোজনীকেই 2 দিয়ে ভাগ দিয়ে লিখি CO_2।

3) উভয় মৌলের বা মূলকের যোজনী ভিন্ন বা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক না হলে, অর্থাৎ A মৌলের যোজনী x এবং B মৌলের যোজনী y হলে A ও B মৌল দ্বারা গঠিত যৌগটির সংকেত হবে A_yB_x। A মৌলের যোজনী সংখ্যা B মৌলের ডানপাশে সাবস্ক্রিপ্ট (subscript) হিসেবে এবং B মৌলের যোজনী সংখ্যা A মৌলের ডানপাশে সাবস্ক্রিপ্ট (subscript) হিসেবে লিখতে হবে। যেমন—অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)। এখানে অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেনের যোজনী যথাক্রমে 3 ও 2।

৪.2 রাসায়নিক সমীকরণ

একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, যে পদার্থগুলো বিক্রিয়া করে সেগুলোর অণুগুলোর ভেতর যে বন্ধন থাকে সেগুলো ভেঙে নতুন পদার্থ গঠিত হয় এবং উৎপন্ন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে নতুন বন্ধন তৈরি হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া বর্ণনা করার সময় আমরা রাসায়নিক সমীকরণ দিয়ে এই বিক্রিয়াকে প্রকাশ করি।

একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়, এক অংশে বিক্রিয়ক এবং অন্য অংশে বিক্রিয়ার ফলে নবগঠিত পদার্থ থাকে। সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করার সময় বিক্রিয়কগুলো সমীকরণের বাম দিকে থাকে এবং একটি তীর চিহ্ন দিয়ে ডানদিকে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নতুন পদার্থগুলো দেখানো হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেখানো হলো:

$$A + B \longrightarrow C + D$$

এখানে, A এবং B হলো বিক্রিয়ক, যা বিক্রিয়া করে এবং C এবং D হচ্ছে উৎপন্ন পদার্থ। একটি প্রকৃত রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়কগুলোকে তাদের রাসায়নিক সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ:

S	+	O_2	$\longrightarrow$	SO_2
(সালফার)		(অক্সিজেন)		(সালফার ডাইঅক্সাইড)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু তৈরি বা ধ্বংস করা যায় না, শুধু তাদের পুনর্বিন্যাস ঘটে। অতএব, বিক্রিয়ার আগে বিক্রিয়কগুলোতে যে পরমাণুগুলো যতগুলো করে থাকে, বিক্রিয়ার পর উৎপন্ন পদার্থেও ঠিক সেই পরমাণুগুলো ততগুলো করে থাকে। কাজেই এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন পদার্থকে প্রতীক, সংকেত ও কিছু গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। যেমন—

Zn	+	H_2SO_4	$\longrightarrow$	$ZnSO_4$	+	H_2
(জিঙ্ক)		(সালফিউরিক এসিড)		(জিঙ্ক সালফেট)		(হাইড্রোজেন)

৪.2.1 রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম

রাসায়ানিক সমীকরণ লেখার নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো :

1) রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়কগুলোর প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির তীর চিহ্নের ($\longrightarrow$) বামদিকে লিখতে হবে। উল্লেখ্য, একটি তীর চিহ্ন ($\longrightarrow$) বিক্রিয়ককে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ থেকে আলাদা করে। বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা পদার্থগুলোর প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির তীর চিহ্নের ($\longrightarrow$) ডানদিকে লিখতে হবে।

2) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ একাধিক হলে তাদের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) দেওয়া হয়।

3) রাসায়নিক সমীকরণে তীর চিহ্নের ($\longrightarrow$) পরিবর্তে সমান (=) চিহ্নও ব্যবহার করা হয়, তবে এক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর মধ্যে উপস্থিত পরমাণুর 'সমতাকরণ' প্রয়োজন হয়।

সমতাকরণ

সমতাকরণ বলতে বোঝানো হয়, রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়কের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে, বিক্রিয়ার পরে গঠিত বিক্রিয়াজাত পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকবে। তাই সমীকরণের উভয় পক্ষে (বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ) মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমতা আনার জন্য প্রতীক ও সংকেতগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

যেমন—হাইড্রোজেন ও পানির বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয়। সুতরাং, রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম অনুযায়ী বামদিকে হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) অণুর সংকেত এবং ডানদিকে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পানির (H_2O) অণুর সংকেত বসিয়ে আমরা লিখতে পারি :

$$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$$

এখন লক্ষ করো যে, বিক্রিয়ার আগে যত সংখ্যক H এবং O পরমাণু আছে বিক্রিয়ার পরেও বিক্রিয়াজাত পদার্থে তত সংখ্যক H পরমাণু থাকলেও ততসংখ্যক O পরমাণু নেই। তাই বিক্রিয়ার সমতাকরণের জন্য H_2 অণু, O_2 অণু ও H_2O অণুর সংখ্যা এবং সমীকরণ হবে নিম্নরূপ :

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

এই সমীকরণে বিক্রিয়ার আগে এবং পরে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মোট পরমাণুর সংখ্যা সমান, অর্থাৎ এই সমীকরণে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর মধ্যে উপস্থিত পরমাণুর সমতাকরণ করা হয়েছে।

৪.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক পরিবর্তন

রাসায়নিক পরিবর্তন বলতে বোঝানো হয় এক বা একাধিক পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন এক বা একাধিক পদার্থে পরিবর্তিত হওয়া। রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় বিক্রিয়কের অণু-পরমাণুগুলো নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়, যে কারণে এই নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। রাসায়নিক পরিবর্তনে প্রায় সময়েই শক্তি বিনিময় হয়ে থাকে, কখনো তাপ সৃষ্টি হয় কখনো তাপ শোষিত হয়, যার ফলে বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন পদার্থ তৈরি হয় প্রায় সময়েই সেগুলোর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন এবং এই পরিবর্তন সাধারণত অপ্রত্যাবর্তী (irreversible)। রাসায়নিক বিক্রিয়া নানাভাবে সংগঠিত হতে পারে। এখানে সংক্ষেপে সংযোজন, দহন, প্রতিস্থাপন এবং বিয়োজন বিক্রিয়া আলোচনা করা হলো।

৪.3.1 সংযোজন বিক্রিয়া (Addition reaction):

সংযোজন বিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া যেখানে দুই বা ততোধিক বিক্রিয়ক (reactant) একত্রিত হয়ে নতুন একটি বিক্রিয়াজাত পদার্থ (product) তৈরি করে।

ল্যাবরেটরির নিরাপদ পরিবেশে একটি টেস্ট টিউবে লোহার গুঁড়া এবং সালফার পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে দুটি বিক্রিয়ক (আয়রন এবং সালফার) একত্রিত হয়ে বিক্রিয়াজাত পদার্থ ফেরাস সালফাইড তৈরি হয়। টেস্ট টিউব থেকে যে বস্তু পাওয়া যায় সেটি দেখতে গাঢ় ধূসর বর্ণের, এখানে

হালকা হলুদ রঙের সালফার বা লোহার (আয়রন) গুঁড়া কোনোটিই দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ, এখানে আয়রন ও সালফার একে অপরের সাথে মিলে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ ফেরাস সালফাইড (FeS) তৈরি করেছে।

$$\underset{\text{(আয়রন)}}{Fe} + \underset{\text{(সালফার)}}{S} \longrightarrow \underset{\text{(ফেরাস সালফাইড)}}{FeS}$$

এ ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশিষ্টের নতুন পদার্থ তৈরি করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। একইভাবে জিঙ্ক (Zn) ও সালফার (S) বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফাইড (ZnS) তৈরি করে। এটিও একটি সংযোজন বিক্রিয়া।

$$\underset{\text{(জিঙ্ক)}}{Zn} + \underset{\text{(সালফার)}}{S} \longrightarrow \underset{\text{(জিঙ্ক সালফাইড)}}{ZnS}$$

উপরোল্লেখিত দুটি বিক্রিয়াতেই মৌল থেকে যৌগ তৈরির মাধ্যমে সংযোজন বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। তবে দুটি যৌগ যুক্ত হয়েও সংযোজন বিকিয়ার মাধ্যমে নতুন একটি যৌগ গঠন করতে পারে। যেমন, অ্যামোনিয়ার (NH_3) সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) উৎপন্ন করে। নিচে এই সংযোজন বিক্রিয়াটি দেখানো হলো :

$$\underset{\text{(অ্যামোনিয়া)}}{NH_3} + \underset{\text{(হাইড্রোজেন ক্লোরাইড)}}{HCl} \longrightarrow \underset{\text{(অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড)}}{NH_4Cl}$$

8.3.2 দহন বিক্রিয়া (combustion reaction)

দহন বিক্রিয়া হলো এমন এক ধরনের বিক্রিয়া যেখানে কোনো পদার্থ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আলো এবং তাপ উৎপন্ন করে। দহন বিক্রিয়ায় অবশ্যই অক্সিজেন (O_2) থাকতে হবে, যেখানে অক্সিজেন একটি বিক্রিয়ক হিসেবে কাজ করে। তোমরা তোমাদের চারপাশে সব সময়েই দহন প্রক্রিয়ার অনেক উদাহরণ দেখেছ, মোমবাতির জ্বলন, চুলার আগুন বা গাড়ির ইঞ্জিন চলা এগুলো সবই দহন বিক্রিয়ার উদাহরণ।

তোমরা যদি অন্ধকার ঘরে একটা মোমবাতি জ্বালাও তাহলে দেখবে তার আলোতে ঘর আলোকিত হয়ে উঠেছে, আলোর শিখার কাছে হাত নিলে তার তাপটাও অনুভব করবে। মোমটিকে ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে মোমের কিছু অংশ গলে নিচে গড়িয়ে পড়ে ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেলেও বেশিরভাগ উৎপন্ন তাপে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে। এই বাষ্পীভূত মোম দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে যার ফলে তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে।

মোমের পরিবর্তে যদি কখনো সালফার বা গন্ধককে উত্তপ্ত করা হয় তাহলেও তোমরা দেখতে পাবে

যে, প্রথমে সালফার গলে যাবে; তারপর সেখানে নীল আগুনের শিখা দেখা যাবে। তাপ দেওয়ার ফলে একসময় সালফার (S) বাতাসের অক্সিজেনের (O_2) সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস তৈরি করতে শুরু করবে।

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2$$
(সালফার) (অক্সিজেন) (সালফার ডাইঅক্সাইড)

সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) একটি বিষাক্ত গ্যাস তাই শুধু ল্যাবরেটরির নিরাপদ পরিবেশ ছাড়া এই দহন প্রক্রিয়া করা সম্ভব নয়।

8.3.3 প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (substitution reaction)

যে বিক্রিয়ায় একটি মৌল কোনো যৌগ থেকে অপর একটি মৌলকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে নিয়ে নতুন একটি যৌগ তৈরি করে, তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে। প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সম্বন্ধে বোঝার জন্য নিচের সহজ কিন্তু সুন্দর পরীক্ষাটি করে দেখতে পারো। এই পরীক্ষাটি করার জন্য তোমাকে শুধু একটুখানি তুঁতে বা কপার সালফেট ($CuSO_4$) জোগাড় করতে হবে অন্য সবকিছু তুমি তোমার হাতের কাছে পেয়ে যাবে।

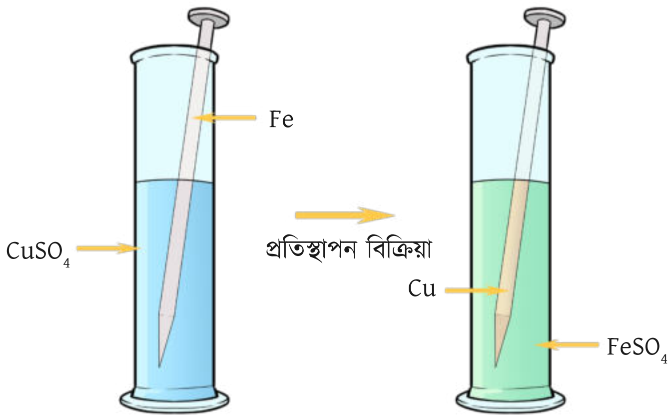

লোহা দিয়ে কপারের প্রতিস্থাপন পরীক্ষা

প্রথমে একটি কাচের গ্লাসে খানিকটা পানি নিয়ে সেখানে তুঁতে যোগ করে পানিটি ভালো করে নাড়িয়ে তুঁতের দ্রবণ তৈরি কর। তোমরা সুন্দর নীল বর্ণের একটি দ্রবণ দেখতে পাবে। এবারে একটি লোহার পেরেক ভালোভাবে পরিষ্কার করে সেই দ্রবণে খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে দেখবে ডুবে থাকা অংশে মরিচা পড়ার মতো রং ধারণ করেছে। তবে এটি আসলে মরিচা নয়, এটি লোহার পেরেকের উপর কপারের একটি আস্তরণ। লোহা কপার থেকে বেশি বিক্রিয়াশীল হওয়ার কারণে সেটি নিচের বিক্রিয়ার মাধ্যমে লোহা (Fe) কপার সালফেটের কপারকে (Cu) প্রতিস্থাপন করেছে।

$$Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$$
(আয়রন) (কপার সালফেট) (ফেরাস সালফেট) (কপার)

এই বিক্রিয়াটি যেহেতু ধীর গতিতে সম্পন্ন হয় তাই তুমি যদি কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা কর এবং মাঝে মাঝে গ্লাসটিকে নেড়ে পেরেকের উপরে জমা হওয়া কপারকে সরিয়ে দাও তাহলে দেখবে নিচে কপারের কণা জমা হতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয় তুমি দেখবে নীল কপার সালফেটের ($CuSO_4$) দ্রবণ হাল্কা সবুজ রঙে ফেরাস সালফেটের ($FeSO_4$) দ্রবণে পাল্টে গেছে।

তুঁতের পরিবর্তে জিঙ্ক সালফেট ($ZnSO_4$) অথবা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$) দিয়েও এই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করা সম্ভব।

৪.৩.৫ বিযোজন বিক্রিয়া (decomposition reaction)

বিযোজন বিক্রিয়া হচ্ছে সংযোজন বিক্রিয়ার বিপরীত। এখানে একটি বিক্রিয়ক ভেঙে নিচে দেখানো প্রক্রিয়ায় দুটি বা ততোধিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ তৈরি হয়।

$$AB \longrightarrow A + B$$

এখানে AB হলো একটি বিক্রিয়ক, AB ভেঙে A এবং B দুইটি বিক্রিয়াজাত পদার্থ তৈরি হয়েছে। বিযোজন বিক্রিয়া আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য নিচের পরীক্ষাটি করে দেখতে পার।

ল্যাবরেটরির নিরাপদ পরিবেশে একটি টেস্ট টিউবে যদি কেউ খানিকটা চুনাপাথর ($CaCO_3$) বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে উত্তপ্ত করে তাহলে দেখবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভেঙ্গে বা বিযোজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস তৈরি হচ্ছে। নিচে বিক্রিয়াটি দেখানো হলো:

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

(ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) → (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) + (কার্বন ডাইঅক্সাইড)

উৎপন্ন গ্যাসটি কার্বন ডাইঅক্সাইড কি না সেটিও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। নির্গত গ্যাসটিকে সংগ্রহ করে স্বচ্ছ চুনের পানি দিয়ে প্রবাহিত করলে দেখা যাবে যে চুনের পানি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ চুনের পানি হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$), এটি কার্বন ডাইঅক্সাইডের (CO_2) সাথে বিক্রিয়া করে অস্বচ্ছ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে তাই চুনের পানি ঘোলা হয়ে যায়।

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$

(কার্বন ডাইঅক্সাইড) + (ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড) → (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) + (পানি)

যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিযোজিত করা হয়েছে সেটি আবার ফিরে এসেছে।

৪.৫ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তির রূপান্তর

শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেমন—তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, স্থিতি শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে শক্তিকে সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস করা যায় না, এটিকে কেবল এক ধরনের শক্তি থেকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

তাপশক্তি:

আমরা আমাদের চারপাশে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি তাপ শক্তিতে রূপান্তর দেখে অভ্যস্ত। যে কোন দহন প্রক্রিয়া হচ্ছে এর উদাহরণ। মোমবাতি কিংবা চুলায় এভাবে তাপ উৎপন্ন করা হয়, এমনকি আমাদের শরীরেও এভাবে তাপ শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। গাড়ির ইঞ্জিনেও রসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে তাপ শক্তির সৃষ্টি হয় সেই শক্তি দিয়ে গাড়িকে চলমান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে বিপরীত প্রক্রিয়াও ঘটে থাকে যেখানে তাপ শক্তি গ্রহণ করে বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। যেমন বেকিং সোডার মাঝে লেবুর রস দেওয়া হলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বুদ্বুদ আকারে বের হয়ে আসে, তখন এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তাপ নিয়ে নেওয়ার কারণে মিশ্রণের তাপমাত্রা কমে যায়।

আলোক শক্তি

মোমবাতির শিখায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ শক্তি সৃষ্টি করে সেই তাপ শক্তি থেকে আলোক শক্তি সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে কোন তাপ শক্তি সৃষ্টি না করে সরাসরি আলোক শক্তি সৃষ্টি করা যায়। তার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে জোনাকি পোকা, সেটি তার শরীরে লুসিফেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আলো সৃষ্টি করে।

বিদ্যুৎ শক্তি

আমরা ব্যাটারিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিদ্যুৎ শক্তি পেয়ে থাকি। সাধারণ শুষ্ক কোষে জিঙ্ক, এমোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি হয়ে থাকে। লিথিয়াম আয়ন জাতীয় রিচার্জ করার উপযোগী ব্যাটারিতে এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি ঘটানো হয়, যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ করে বিপরীত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি করার উপযোগী করে রাখা হয়।

শব্দ শক্তি

বাজি বা পটকা ফুটিয়ে শব্দ তৈরি করা হয়। এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে তখন গ্যাসের দ্রুত প্রসারণে এই শব্দের সৃষ্টি হয়।

রাসায়নিক বিভব শক্তি:

রাসায়নিক বন্ধনে শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং এই বন্ধন ভেঙে শক্তি পাওয়া যায়। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে জীব জগতের কোষে সঞ্চিত এটিপি নামক অণু যেটি জীবদের দেহে শক্তি সৃষ্টি করে। এই অণু তার রাসায়নিক বন্ধনে শক্তি সঞ্চিত রাখে বলে এটি জৈব মুদ্রা নামে পরিচিত।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে রাসায়নিক শক্তিকে নানা ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব যেটি শিল্প—কলকারখানা থেকে শুরু করে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণ হিসেবে রাসায়নিক শক্তির বিভিন্ন রূপান্তরের মাঝে শুষ্ক কোষ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

৪.৫.1 ইলেক্ট্রোলাইট (electrolyte) এবং ইলেক্ট্রোলাইসিস (electrolysis)

শুষ্ক কোষ সম্বন্ধে জানতে হলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেক্ট্রোলাইট (electrolyte) এবং তড়িৎ বিশ্লেষণ বা ইলেক্ট্রোলাইসিস (electrolysis) সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে। যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা বিগলত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অন্য পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে ইলেক্ট্রোলাইট বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে ইলেক্ট্রোলাইসিস বলে।

ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহ করে আয়নিক যৌগকে তাদের মৌলে বিয়োজন করা যায়। ছবিতে দেখানো উপায়ে দুটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎ দ্বারকে ইলেক্ট্রোলাইট দ্রবণে নিমজ্জিত করে তাদের মাঝে ডিসি বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হলে ইলেক্ট্রোলাইটের ক্যাটায়ন ক্যাথোড এবং অ্যানায়ন অ্যানোডে জমা হবে। বিশুদ্ধ পানিতে অল্প অ্যাসিড বা লবণ মিশিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী করে সেটিকে ইলেক্ট্রোলাইসিস করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিয়োজন করা যায়। তরল সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ইলেক্ট্রোলাইসিস করা হলে সেখান থেকে সোডিয়াম ধাতু এবং ক্লোরিন গ্যাস পাওয়া সম্ভব।

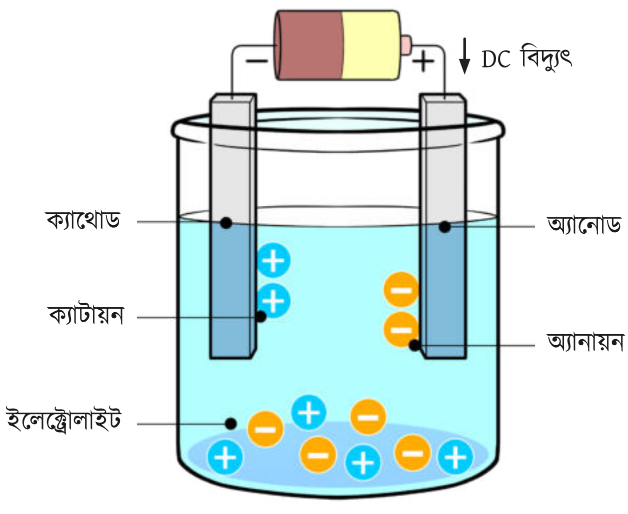

ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়া

শুষ্ক কোষ (Dry cell)

তোমরা সবাই কখনো না কখনো টর্চ লাইট, খেলনা, রিমোট কন্ট্রোল অথবা অন্য কোথাও ব্যাটারি সেল বা শুষ্ক কোষ ব্যবহার করেছ। এই শুষ্ক কোষে একটি এনোড, একটি ক্যাথোড এবং তার মাঝে ইলেক্ট্রোলাইট রয়েছে। এখানে এনোড

হিসেবে কাজ করে একটি দস্তার ধাতব আবরণ। ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইডের পেস্ট দিয়ে ঘিরে থাকা মাঝখানের কার্বন দণ্ডটি। এনোড এবং ক্যাথোডের মাঝখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বৈদ্যুতিক চার্জের বাহক হিসেবে কাজ করে কারণ, এতে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত (Cl^-) এবং ধনাত্মক চার্জযুক্ত (Zn^{2+}, NH^{4+}) আয়ন রয়েছে।

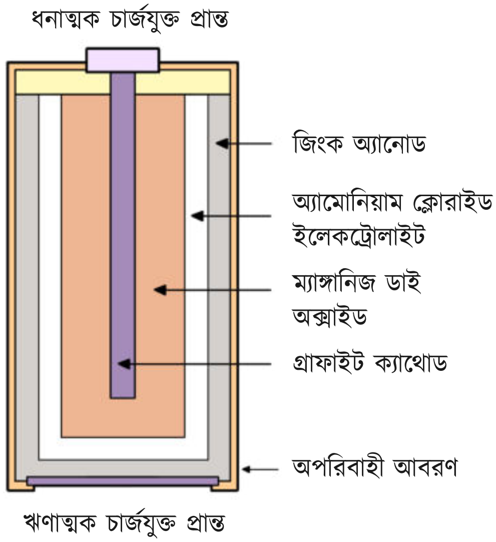

শুষ্ক কোষ

শুষ্ক কোষের কাজ :

এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, জিঙ্ক এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই কারণে কোষের দুই প্রান্তে 1.5 ভোল্টের একটি বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। যেটি দুই প্রান্তে সংযুক্ত কোনো সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পারে।

উপরে বর্ণিত কোষকে জিঙ্ক-কার্বন কোষও বলা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে যদি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে (KOH) ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন এই কোষকে এলক্যালাইন (alkaline) কোষ বলা হয়। এলক্যালাইন কোষ বহুল ব্যবহৃত জিঙ্ক-কার্বন কোষ থেকে অনেক বেশি কার্যকর।

৪.5 রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের সংরক্ষণ

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়, পরমাণু তৈরি বা ধ্বংস হয় না। বিক্রিয়কগুলোর পরমাণুসমূহ কেবল বিক্রিয়াজাত পদার্থ তৈরি করার জন্য পুনর্বিন্যাস হয়। তাই পুরোপুরি আবদ্ধ পরিবেশে—যেখানে কোনো কিছু বাইরে যেতে পারে না বা বাইরে থেকে কোনো কিছু আসতে পারে না, সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। এটিকে ভর সংরক্ষণের সূত্র (Law of conservation of mass) বলে।

যেহেতু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভর তৈরি বা ধ্বংস করা যায় না। সুতরাং, বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের ভরের যোগফল অপরিবর্তিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নিচের বিক্রিয়াটি লক্ষ করতে পারো।

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

100 গ্রাম   56 গ্রাম + 44 গ্রাম

এখানে বিক্রিয়কের ভর 100 গ্রাম এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের ভরের যোগফলও (56 + 44 =) 100 গ্রাম। কাজেই উপরোল্লিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

অধ্যায় ৯

অম্ল, ক্ষার ও লবণ

অধ্যায় ৯ অম্ল, ক্ষার ও লবণ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ অম্ল, ক্ষার, এবং নির্দেশক
- ☑ অম্ল ও ক্ষারের বিক্রিয়া, লবণ
- ☑ অম্ল ও ক্ষারের গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম
- ☑ অম্ল ও ক্ষারের ব্যবহার
- ☑ অম্ল ও ক্ষার শনাক্তকরণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে অম্ল বা অ্যাসিড, ক্ষার এবং লবণ রয়েছে। এসবের মধ্যে অনেক অ্যাসিড, ক্ষার এবং লবণ প্রাকৃতিকভাবেই (naturally) পাওয়া যায়। যেমন, লেবুর রস ও কমলাতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড, তেঁতুলে থাকে টারটারিক অ্যাসিড এবং দুধে থাকে ম্যালিক অ্যাসিড। একইভাবে চুনের পানি হচ্ছে ক্ষার। সমুদ্রের পানিতে থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড যা পরিশোধিত করে আমরা খাবার লবণ হিসেবে ব্যবহার করি। এইসব অম্ল, ক্ষার ও লবণের রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন, কাজেই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার রয়েছে।

9.1 অম্ল বা অ্যাসিড (Acid)

তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো অ্যাসিডের নাম শুনেছ। অ্যাসিড হচ্ছে এমন এক ধরনের পদার্থ, যার জলীয় দ্রবণ টক স্বাদযুক্ত, এটি নীল লিটমাস পেপারকে লাল করতে পারে এবং ক্ষারকে প্রশমিত (neutralize) করতে পারে। লিটমাস পেপার হচ্ছে বিশেষ একধরনের কাগজ, যেখানে লাইকেন (lichen) নামক এক ধরনের গাছ থেকে প্রাপ্ত রং মেশানো হয়। কোনো দ্রবণ অ্যাসিডিক না ক্ষারীয় তা পরীক্ষা করতে লিটমাস পেপার ব্যবহার করা হয়। অম্লীয় বা অ্যাসিডিক দ্রবণ নীল লিটমাস পেপারকে লাল করে এবং ক্ষারীয় দ্রবণ লাল লিটমাস পেপারকে নীল করে।

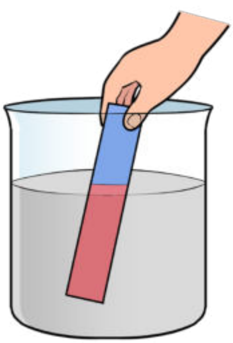

অ্যাসিড
(নীল লিটমাস পেপারের রং লাল হয়েছে)

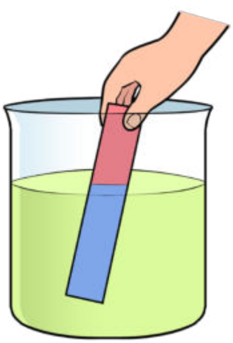

ক্ষার
(লাল লিটমাস পেপারের রং নীল হয়েছে)

অম্লীয় এবং ক্ষারীয় দ্রবণে লিটমাস পেপারের রঙ পরিবর্তন

লেবুর রসে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। তোমার কাছে যদি একটি লাল ও একটি নীল রঙের লিটমাস পেপার থাকে তাহলে তুমি দেখবে যদি লেবুর রসে লাল লিটমাস পেপার ডুবানো হয় তাহলে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না, যার ফলে লিটমাস পেপারের রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে, যখন নীল লিটমাস পেপার লেবুর রসে ডুবানো হয়, তখন লিটমাসের সাথে লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে কাগজের রঙের পরিবর্তন হয়ে লাল হয়ে যায়।

লেবুর রসের মতো আমলকী, করমচা, কামরাঙা, বাতাবি লেবু, ইত্যাদি ফলগুলো টক স্বাদযুক্ত হয়, তার কারণ এই ফলগুলোতেও নানা রকমের অ্যাসিড থাকে। তোমরা এখন লেবুর রসের পরিবর্তে আমলকী, পেয়ারা, ইত্যাদি ফল নিয়ে লিটমাস পেপার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারো লিটমাস পেপারের রঙের কী পরিবর্তন ঘটে।

পাশের টেবিলে কয়েকটি অ্যাসিডের নামসহ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে। টেবিলে উল্লেখিত সবকটি অ্যাসিডের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে, সেটি হচ্ছে এই অ্যাসিডের সবগুলোর মধ্যেই এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু (H) আছে এবং এরা প্রত্যেকেই পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। কাজেই আমরা বলতে পারি, অ্যাসিড হলো ঐ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে।

কিছু অ্যাসিডের নাম ও সংকেত

অ্যাসিডের নাম	সংকেত
ভিনেগার বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড	CH_3COOH
অক্সালিক অ্যাসিড	HCOO-COOH
সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4
নাইট্রিক অ্যাসিড	HNO_3

উদাহরণস্বরূপ, পানিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ও এসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH)-এর রাসায়নিক সমীকরণ দুটি লক্ষ করতে পারো :

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

$$CH_3COOH \xrightarrow{H_2O} H^+ + CH_3COO^-$$

এই দুটি অ্যাসিডই পানির সংস্পর্শে এসে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করেছে। তবে পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলেই সেটি অ্যাসিড হবে না। তোমরা নিশ্চয়ই মিথেন গ্যাসের নাম শুনেছ, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের পুরোটাই মিথেন এবং এর সংকেত হচ্ছে CH_4। এতে 4টি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে কিন্তু মিথেন অ্যাসিড নয়, কারণ মিথেন পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে না।

সতর্কতা: অ্যাসিড ও ক্ষারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় যথাক্রমে তার টক ও কটু স্বাদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কমলা বা লেবু এরকম পরিচিত ফলমূল ছাড়া কখনোই অন্য কোনো অ্যাসিড বা ক্ষারের স্বাদ পরীক্ষা করার চেষ্টা করো না।

৭.২ ক্ষার (Base)

ক্ষার হচ্ছে এমন এক ধরনের পদার্থ যার জলীয় দ্রবণ তিক্ত স্বাদযুক্ত হয়, লাল লিটমাস পেপারকে নীল করে এবং যা অ্যাসিডকে প্রশমিত (neutralize) করতে পারে।

চুনের পানি হচ্ছে এক ধরনের ক্ষার, এখানে রয়েছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$)। তোমার কাছে যদি একটি লাল ও একটি নীল রঙের লিটমাস পেপার থাকে তাহলে তুমি আবার একটি পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। তুমি যদি চুনের পানিতে নীল লিটমাস পেপার ডুবাও তুমি দেখবে তাহলে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না, যার ফলে লিটমাস পেপারের রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে, যদি লাল লিটমাস পেপার চুনের পানিতে ডুবানো হয়, তখন লিটমাসের সাথে চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে লিটমাস পেপারের রঙের পরিবর্তন হয়ে নীল হয়ে যায়।

এখানে চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$) -এর মতো যে সকল রাসায়নিক পদার্থ লাল লিটমাস পেপারকে নীল করে তাদেরকে আমরা কখনো কখনো ক্ষারক বলে থাকি। কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় (যেমন : $NaOH$, NH_4OH, $Ca(OH)_2$), আবার কিছু কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না (যেমন, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Al(OH)_3$)। যে সকল ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয়, তাদেরকে ক্ষার বলে। সুতরাং, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$), অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$) হচ্ছে ক্ষার জাতীয় ক্ষারক। অন্যদিকে, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Al(OH)_3$) হচ্ছে ক্ষারক কিন্তু যেহেতু পানিতে দ্রবীভূত হয় না তাই এটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অতএব, বলা যায় যে, "সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক ক্ষার নয়"।

ক্ষারক হলো সেই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে অক্সিজেন (O) ও হাইড্রোজেন (H) পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) তৈরি করতে পারে, যেমন :

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

$$NH_4OH \xrightarrow{H_2O} NH_4^+ + OH^-$$

$$Ca(OH)_2 \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+} + 2OH^-$$

এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$) এর মধ্যে অক্সিজেন (O) ও হাইড্রোজেন (H) পরমাণু রয়েছে এবং এরা পানিতে (H_2O) হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করেছে। সুতরাং এরা ক্ষারক।

তবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন : ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) বা অ্যামোনিয়া (NH_3) যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যে কোন একটি রয়েছে কিন্তু এরা পানিতে OH^- আয়ন তৈরি করতে পারে, তাই এদেরকেও ক্ষারক বলা হয়। পানিতে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও অ্যামোনিয়া (NH_3) -এর বিক্রিয়া দুটি দেখানো হলো :

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$
$$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4OH$$

তোমার সবাই জানো যে সাবান স্পর্শ করলে পিচ্ছিল মনে হয়। এর কারণ হলো সাবানে ক্ষার থাকে। তাহলে ক্ষার ও ক্ষারক উভয়েরই একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা পিচ্ছিল হয় এবং এরা কটু স্বাদযুক্তও হয়।

৭.৩ লবণ (salt)

দৈনন্দিন কথাবার্তায় লবণ বলতে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) বা যে লবণ আমাদের খাওয়ার সময় ব্যবহার করে থাকি সেটা বুঝিয়ে থাকি, কিন্তু লবণ শব্দটি বিজ্ঞানে আর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লবণ হচ্ছে একটি আয়নিক যৌগ যেখানে একটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন (ক্যাটায়ন) ও ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন (অ্যানায়ন) সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন অ্যাসিড এবং ক্ষারের মধ্যে প্রশমন বা নিরপেক্ষকরণ (neutralization) বিক্রিয়ার ফলে নানা ধরনের লবণ এবং একই সাথে পানিও উৎপন্ন হয়। লবণ একটি নিরপেক্ষ পদার্থ যার জলীয় দ্রবণ লিটমাস পেপারের রঙের কোনো পরিবর্তন করে না। সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) সবচেয়ে পরিচিত লবণের একটি উদাহরণ, এই লবণ খাদ্যে ব্যবহার ছাড়াও প্রতিদিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে লাগে। তোমরা হয়তো জানো যে সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) রয়েছে এবং এই কারণে সমুদ্রের পানি নোনতা বা লবণাক্ত স্বাদযুক্ত হয়।

নিচের সমীকরণে অ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়ার ফলে লবণ তৈরির একটি উদাহরণ দেখানো হলো :

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$$

(অ্যাসিড) + (ক্ষার) (লবণ) + (পানি)

৭.৪ অ্যাসিড ও ক্ষারকের ব্যবহার

আমদের দৈনন্দিন জীবনে অ্যাসিড ও ক্ষার বা ক্ষারক জাতীয় পদার্থের নানা ধরণের ব্যবহার রয়েছে।

নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আলোচনা করা হলো :

9.৫.1 অ্যাসিডের ব্যবহার

1) ভিনেগার বা এসিটিক অ্যাসিড খাবার সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করা হয়। এসিটিক অ্যাসিড কালি এবং রঙের জন্য দ্রাবক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

2) ফলমূল এবং সবজিতে যে সকল অ্যাসিড পাওয়া যায় তাদেরকে জৈব অ্যাসিড বলে। যেমন লেবু, কমলা এবং অন্যান্য সাইট্রাস (citrus) জাতীয় ফল এবং সবজিতে সাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। খাদ্য শিল্পে কিছু কিছু নির্দিষ্ট খাবারের স্বাদ বাড়াতে এবং ক্ষতিকারক জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য সাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। জৈব অ্যাসিডের মধ্যে কোনো কোনোটি মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন, এসকরবিক অ্যাসিডকে (ascorbic acid) আমরা ভিটামিন সি বলে থাকি, এর অভাবে মানবদেহে স্কার্ভি রোগ হয়ে থাকে।

অ্যাসিড দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা:

যদি কখনো কারো ত্বক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে কম পক্ষে 20 মিনিট একটানা পানির প্রবাহ দিয়ে সমস্ত অ্যাসিড ধুয়ে ফেলতে হয়। যদি কাপড়ে অ্যাসিড লেগে থাকে তাহলে সেগুলো সরাসরি শরীরে স্পর্শ না করে সরিয়ে ফেলতে হয়। অ্যাসিড দিয়ে যেহেতু মারাত্মকভাবে দগ্ধ হওয়া সম্ভব তাই সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুচিকিৎসা দেওয়ার জন্য হাসপাতালে নিতে হবে। এসিডের ব্যবহার নিয়ে আমাদের সবাইকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে এবং অন্যদের সচেতন করতে হবে।

3) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিডের ব্যবহার রয়েছে। টয়লেট পরিষ্কারের জন্য যে সমস্ত পরিষ্কারক ব্যবহার করা হয় তাতে অ্যাসিড থাকে। সোনার গহনা তৈরি করার সময় স্বর্ণকারগণ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার উৎপাদনের জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খনি থেকে সোনার মতো মূল্যবান ধাতু আহরণে ও রকেটের জ্বালানির সাথে HNO_3 ব্যবহার করা হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ছাড়া সালফিউরিক অ্যাসিডেরও (H_2SO_4) ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন : আইপিএস, গাড়ি, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, তাতে H_2SO_4 থাকে। এছাড়া, ডিটারজেন্ট, নানা রকমের রং, কীটনাশক, কাগজ ও বিস্ফোরক তৈরিতে প্রচুর H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়। একটি দেশ কতটুকু H_2SO_4 ব্যবহার করে তা থেকে দেশটি কতটুকু শিল্পোন্নত সেটি বোঝা যায়!

4) আমরা যে খাবার খাই তা হজম করার জন্য পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) রয়েছে। এছাড়া ইস্পাত তৈরির কারখানা, ঔষধ, চামড়া শিল্পেও HCl ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কোমল পানীয়তে অন্যতম উপাদান হিসেবে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) ও অল্প পরিমাণ ফসফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) থাকে।

যেসব অ্যাসিড প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানা রকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয় তাদেরকে খনিজ অ্যাসিড (mineral acids) বলে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ইত্যাদি হলো খনিজ অ্যাসিডের উদাহরণ। এই অ্যাসিডগুলো খাওয়ার উপযোগী নয় এবং এরা মানবদেহের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব অ্যাসিড আমাদের ত্বকে লাগলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতিসাধন হয়।

9.৫.2 ক্ষার বা ক্ষারকের ব্যবহার

1) ব্লিচিং পাউডার আমাদের সবার কাছেই পরিচিত। এই বহুল ব্যবহৃত ব্লিচিং পাউডার তৈরি হয় ক্ষারক ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$) ও ক্লোরিন (Cl_2) গ্যাসের বিক্রিয়ার মাধ্যমে। $Ca(OH)_2$ -এর পাতলা দ্রবণ যা চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার (lime water) নামে পরিচিত, সেটি ঘরবাড়ি চুনকাম করতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, $Ca(OH)_2$ ও পানির সমন্বয়ে তৈরি পেস্ট যা মিল্ক অব লাইম (milk of lime) নামে পরিচিত, তা পোকামাকড় দমনে ব্যবহার করা হয়।

2) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) সাবান এবং কাগজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি রেয়ন উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

3) আমাদের পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটি হলে আমরা এন্টাসিড ঔষধ খেয়ে থাকি। এই এন্টাসিড ঔষধ হলো মূলত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Mg(OH)_2$) যা সাসপেনশানও ট্যাবলেট দুভাবেই পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাসপেনশান মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া (milk of magnesia) নামে পরিচিত। কখনো কখনো এন্টাসিড ঔষধে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও ($Al(OH)_3$) থাকে।

4) গবেষণাগারে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) একটি অতি প্রয়োজনীয় বিকারক।

9.5 অ্যাসিড ও ক্ষারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিড ও ক্ষারের কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো:

9.5.1 ধাতুর সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়া

ধাতু, যেমন : দস্তা (Zn) ও সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) -এর বিক্রিয়ায় লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) উৎপন্ন হয়। নিচে বিক্রিয়াটি দেখানো হলো:

$$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

সালফিউরিক অ্যাসিডের মতো প্রায় সকল অ্যাসিডই ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। ধাতু ও অ্যাসিডের আরও একটি বিক্রিয়া নিচে দেখানো হলো:

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$$

9.5.2 অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের বিক্রিয়া

H_2SO_4 একটি অ্যাসিড এবং $Ca(OH)_2$ একটি ক্ষার, এই দুটি বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) ও পানি উৎপন্ন করে। নিচের বিক্রিয়াটি দেখানো হলো :

$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O$$
(ক্ষার) + (অ্যাসিড) (লবণ) + (পানি)

এখানে উৎপন্ন $CaSO_4$ হলো একটি লবণ। অর্থাৎ অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রধান উপাদানটি হচ্ছে লবণ। অ্যাসিড ও ক্ষারের আরও একটি বিক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো:

$$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$$
(ক্ষার) + (এসিড) (লবণ) + (পানি)

9.5.3 কার্বনেটের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া

প্রায় সকল অ্যাসিডই কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। নিচে চুনাপাথরের ($CaCO_3$) সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) বিক্রিয়াটি দেখানো হলো :

$$CaCO_3 + HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

কখনো কখনো অ্যাসিডের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন CO_2 আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

নিচে খাবার সোডা ($NaHCO_3$) ও HCl -এর বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হয় সেটি দেখানো হল :

$$NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$$

নিজে করো:

উপরের বিক্রিয়াগুলোর বেশকিছু সমতাকরণ না করে দেখানো হয়েছে। তোমরা কী এগুলো সমতাকরণ করতে পারবে?

অধ্যায় ১০

জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি

অধ্যায় ১০ জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস
- ☑ উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি
- ☑ প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি
- ☑ প্রাণিজগতের শ্রেণিভিত্তিক শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ও তাদের উদাহরণ
- ☑ কীটপতঙ্গ
- ☑ স্তন্যপায়ী প্রাণী
- ☑ প্রানিজগতে মানুষের অবস্থান

10.1 জীবের শ্রেণিবিন্যাস

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই জীবজগৎ বৈচিত্র্যময়। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় ৪7 লক্ষ প্রজাতির জীব বাস করে, শুধু তাই নয় প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন জীব আবিষ্কৃত হচ্ছে। নানা ধরনের জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে জীবজগতে বৈচিত্র দেখা যায় আবার সকল জীব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই জীবজগতের অবদান অসীম। এসব জীবে রয়েছে নানা ধরনের ভিন্নতা, এদের গঠন ভিন্ন, আবাসস্থল ভিন্ন, কেউ উপকারী আবার কেউ অপকারী। এ কারণে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের সুসংবদ্ধ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা এই বিশাল সংখ্যক জীবদের শত শত বৎসর থেকে শ্রেণিবিন্যাস করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সঠিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা থাকলে তার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজে, স্বল্প পরিশ্রমে ও কম সময়ে পৃথিবীর সকল প্রজাতি সম্বন্ধে জানা যায়। নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতেও শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জীবের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন তথ্য এবং উপাত্ত পাওয়া যায় এবং ধীরে ধীরে তাদের মাঝে যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

একসময় ধারণা করা হতো পৃথিবীর জীবকুল উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুই রাজত্বে বিভক্ত। কিন্তু যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকে বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে অনুভব করতে শুরু করেন যে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুইটি রাজত্ব যথেষ্ট নয়। যেমন : ছত্রাক উদ্ভিদ থেকে যথেষ্ট ভিন্ন, এর মাঝে ক্লোরোফিল নেই এবং উদ্ভিদের মতো নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না, তাই ছত্রাককে

একটি আলাদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর অণুজীবের একটি বিশাল জগৎ আবিষ্কৃত হয় এবং বিজ্ঞানীরা কোষের গঠন সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই এককোষী জীবের জন্য একটি ভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এককোষী জীবদের মাঝেও কোষের গঠনের উপর নির্ভর করে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ রয়েছে। একটি প্রোক্যারিওট (জীবকোষে অগঠিত নিউক্লিয়াস) এবং অন্যটি ইউক্যারিওট (জীবকোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস)। সে কারণে প্রোক্যারিওট এককোষীদের জন্য মনেরা এবং ইউক্যারিওট এককোষীদের জন্য প্রোটিস্টা নামে দুইটি ভিন্ন রাজ্যতে ভাগ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন মনেরা রাজ্যের প্রোক্যারিওট এককোষী প্রাণীদের মাঝে আর্কিব্যাক্টেরিয়া এবং ইউব্যাক্টেরিয়া নামে দুইটি সুস্পষ্ট বিভাজন আছে এবং তারা এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই বর্তমানে মনেরার পরিবর্তে আর্কিব্যাক্টেরিয়া এবং ইউব্যাক্টেরিয়া নামে দুইটি ভিন্ন রাজ্যের কথা বলা হয়। কাজেই জীবজগতকে সব মিলিয়ে প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক, প্রোটিস্টা, ইউব্যাক্টেরিয়া এবং আর্কিব্যাক্টেরিয়া এই ছয়টি রাজ্যে ভাগ করা হলে সকল জীবকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব।

জীবজগতের শ্রেণিবিভাগের জন্য নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয়।

- ☑ 1। কোষের সংখ্যা (এককোষী নাকি বহুকোষী)
- ☑ 2। কোষের ধরন (প্রোক্যারিওটিক নাকি ইউক্যারিওটিক)
- ☑ 3। পুষ্টির ধরন (স্বভোজী নাকি পরভোজী)

একইসঙ্গে জিনেটিকসের অগ্রগতি হতে থাকে এবং জীবদের জিনেটিক গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ইউকেরিয়া, ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কি এই তিনটি তিনটি ডোমেইন বা অধিজগতে ভাগ করা হয়। পাশের ছবিতে ছয়টি রাজ্য বিবর্তিত হয়ে তিনটি ডোমেইনে কীভাবে বিভক্ত করা হয়েছে সেটি দেখানো হয়েছে।

নিচে ছয়টি রাজ্যের সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে জীবজগৎ এত বৈচিত্র্যময় যে উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে অনেক ব্যতিক্রম পাওয়া

জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস, রাজত্ব এবং ডোমেইনে বিভাজন

যায়। যেমন—প্লাটিপাস নামে একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যেটি ডিম পারে, ঘোস্ট প্লান্ট নামে উদ্ভিদ আছে যেখানে ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, কেল্প নামে প্রোটিস্টা আছে যেটি বিশাল এলাকা জুড়ে থাকে, সী স্লাগ নামে প্রানির একধরণের প্রজাতি আছে যারা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে-ইত্যাদি।

প্রাণী

এটি সর্ববৃহৎ রাজ্য, এখানে প্রায় 10 লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। এটি বহুকোষী, ইউক্যারিওটিক, চলতে সক্ষম, পরভোজী এবং যৌন প্রজনন দিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদ

উদ্ভিদের প্রায় 2.5 লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। এটিও বহুকোষী, ইউক্যারিওটিক এবং স্বভোজী। উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে এবং সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে নিজের খাবার তৈরি করে এবং জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্য সরবরাহ করে। শুধু তাই নয় উদ্ভিদ অক্সিজেন সৃষ্টি করে জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখে।

ছত্রাক

ছত্রাকের প্রায় 1.5 লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। এগুলো সাধারণত বহুকোষী, ইউক্যারিওটিক এবং পরভোজী জীব। পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে ছত্রাক পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করে পরিবেশ রক্ষা করে।

প্রোটিস্টা

বেশিরভাগ প্রোটিস্টা এককোষী, ইউক্যারিওটিক এবং পরভোজী। প্রোটিস্টা প্রাণী সদৃশ, উদ্ভিদ সদৃশ কিংবা ছত্রাক সদৃশ হতে পারে।

ইউব্যাক্টেরিয়া

ইউব্যাক্টেরিয়া প্রোক্যারিওট এককোষী এবং পরভোজী। এরা বাইনারি ফিশান বা অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে অযৌন প্রজনন করে থাকে। এরা মানুষকে রোগাক্রান্ত করতে পারে।

আর্কিব্যাক্টেরিয়া

আর্কিব্যাক্টেরিয়া প্রোক্যারিওটিক, এককোষী এবং আদিব্যাক্টেরিয়া। উষ্ণ প্রস্রবণ, সমুদ্রের গভীরে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, অতি লবণাক্ত স্থান এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও আর্কিব্যাক্টেরিয়া পাওয়া গেছে। এরা মানুষকে রোগাক্রান্ত করতে পারে না। যেহেতু এগুলো ব্যাকটেরিয়া থেকে অনেক ভিন্ন সেজন্য অনেক সময় এদের শুধু আর্কিয়া বলা হয়।

তোমরা সবাই জানো , উপরে উল্লেখিত এই ছয়টি রাজ্য ছাড়াও অকোষীয় (noncellular) অণুজীবের আরেকটি বড়ো জগত রয়েছে। জীবজগতের বাইরে জীব ও জড়ের মাঝমাঝি এই অণুজীবের একটি উদাহরণ হচ্ছে ভাইরাস।

আগের শ্রেণিতে তোমরা ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এবং প্রোটিস্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ, এই অধ্যায়ে তোমরা উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানবে।

10.2 উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি

উদ্ভিদের নানা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—আমাদের চারপাশে কিছু কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় যাদের জীবনকাল এক বছর আবার তাদের পাশাপাশি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদও দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদ ফুল ধারণ করে, আবার অনেক উদ্ভিদ ফুলহীন। উদ্ভিদের আকার আকৃতিতেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। খাদ্য প্রস্তুত ও গ্রহণেও উদ্ভিদের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে জর্জ বেনথাম (1800-1884) এবং স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (1817-1911) নামক দুজন ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন। তাদের ল্যাটিন ভাষায় রচিত এবং তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'জেনেরা প্ল্যান্টেরাম' (Genera Plantarum) নামক বইতে প্রথম উদ্ভিদের এই প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বেনথাম ও হুকারের প্রস্তাবিত উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করা হলো। তারা সমস্ত উদ্ভিদজগৎকে অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ এই দুটি উপজগতে ভাগ করেন।

10.2.1 অপুষ্পক উদ্ভিদ (Cryptogamae)

যে সকল উদ্ভিদে কখনো ফুল হয় না তারাই অপুষ্পক উদ্ভিদ। রেণু বা স্পোরের দ্বারা এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে অপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

1। সমাঙ্গবর্গ
2। মসবর্গ
3। ফার্নবর্গ

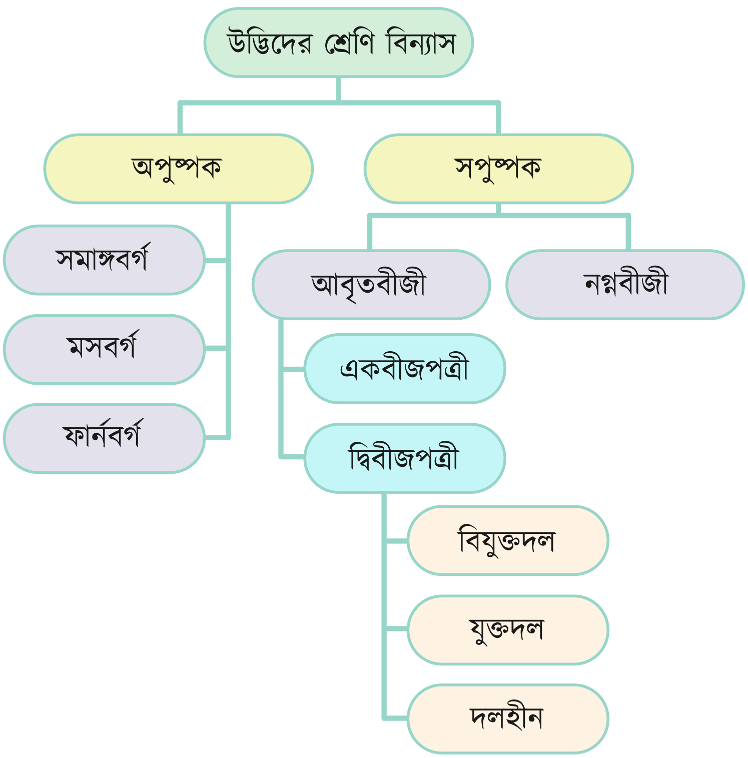

1। সমাঙ্গবর্গ (Thallophyta) :

যে সকল উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় ভাগ করা যায় না সে সকল উদ্ভিদকে এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের কোনো পরিবহণ তন্ত্র নেই। জননাঙ্গ সাধারণত এককোষী। সমাঙ্গবর্গ উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার।

2। মসবর্গ (Bryophyta) : এই বর্গের উদ্ভিদরা নরম কাণ্ড ও পাতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এদের

দেহে মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড নামক মূল রোমের মতো ফিলামেন্ট থাকে এবং এর মাধ্যমেই এরা মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে। এদের দেহে কোনো পরিবহণ তন্ত্র দেখা যায় না। মসবর্গীয় উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় তেইশ হাজার।

3। ফার্নবর্গ (Pteridophyte) : ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এদের দেহে পরিবহণ রয়েছে। ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদের মোট প্রজাতির সংখ্যা দশ হাজার।

10.2.2 সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogamae):

যে সকল উদ্ভিদের ফুল (এবং বীজ) হয় তারাই এই উপজগতের অন্তর্ভুক্ত। বীজের মাধ্যমেই এরা বংশবিস্তার করে থাকে। যেমন—পাইন, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি বীজযুক্ত উদ্ভিদের উদাহরণ। এই উপজগৎ দুই ভাগে বিভক্ত :

1) নগ্নবীজী উদ্ভিদ
2) আবৃতবীজী উদ্ভিদ

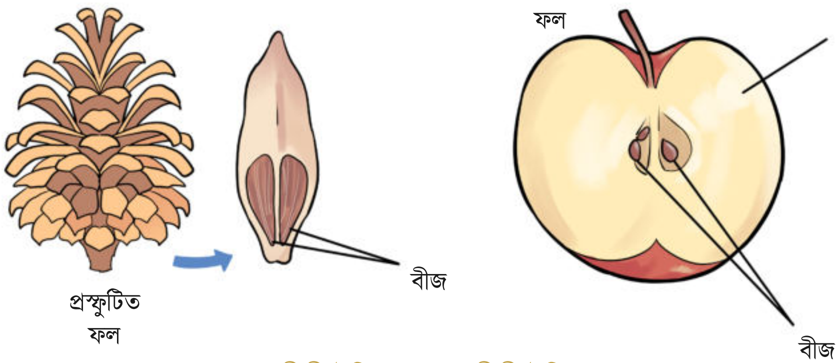

নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ

1) নগ্নবীজী উদ্ভিদ (Gymnospermae) : এই বিভাগের উদ্ভিদের ফুলের স্ত্রীস্তবকে গর্ভাশয় থাকে না, তাই এদের ফল তৈরি হয় না। গর্ভাশয় না থাকায় বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে, যার ফলে এদেরকে নগ্নবীজি উদ্ভিদ বলে। নগ্নবীজী উদ্ভিদের সাইকাস, পাইনাস প্রভৃতি নগ্নবীজী উদ্ভিদের উদাহরণ।

2) আবৃতবীজী উদ্ভিদ (Angiospermae) : এসব উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় আছে, তাই ফল তৈরি হয় এবং বীজ ফলের ভেতরে আবৃত থাকে। বীজে বীজপত্রের উপর ভিত্তি করে এই বিভাগকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে—

ক) একবীজপত্রী উদ্ভিদ
খ) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ

ক) একবীজপত্রী উদ্ভিদ (Monocotyledons) : যে সকল উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে সেগুলোকে একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। এদের মূল হয় গুচ্ছমূল জাতীয় এবং পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস থাকে। কাণ্ডে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ ক্যাম্বিয়ামবিহীন ও বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো। পৃথিবীতে প্রায় 18000 একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রজাতির রয়েছে। ধান, গম, কলা, কচু , নারিকেল ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ।

খ) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (Dicotyledons) : যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে সেগুলোকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা সাধারণত জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত হয়ে থাকে এবং একটি প্রধান মূল থেকে শাখা-প্রশাখা মূল বের হয়ে মূলতন্ত্র গঠন করে। এসকল উদ্ভিদের কাণ্ডে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ ক্যাম্বিয়ামযুক্ত ও বৃত্তাকারে সাজানো। কাঁঠাল, লিচু, রাই সরিষা, ধুতুরা ইত্যাদি হচ্ছে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ। পৃথিবীতে প্রায় 80 হাজার দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ রয়েছে। ফুলের পাপড়ির উপস্থিতি, অনুপস্থিতি এবং সংযুক্তির উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিকে আবার তিনটি উপ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে —

ক) বিযুক্তদল উদ্ভিদ
খ) যুক্তদল উদ্ভিদ
গ) দলহীন উদ্ভিদ

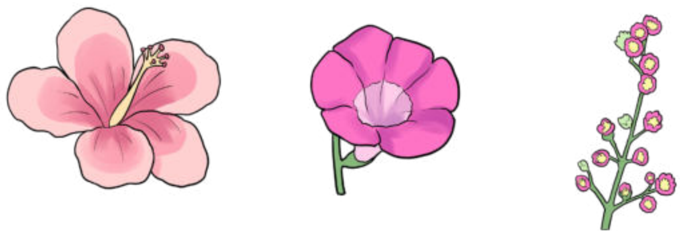

বিযুক্তদল উদ্ভিদ, যুক্তদল উদ্ভিদ এবং দলহীন উদ্ভিদ

ক) **বিযুক্তদল উদ্ভিদ (Polypetalae) :** এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুলের পাপড়ি পৃথক বা সংযুক্ত থাকে না। যেমন— সরিষা।

খ) **যুক্তদল উদ্ভিদ (Gamopetalae) :**

এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুলের পাপড়ি পরস্পর যুক্ত অবস্থায় থাকে, যেমন— ধুতুরা।

গ) **দলহীন (Monochlamydae) :** এ সকল উদ্ভিদের ফুলে পাপড়ি দেখা যায় না। যেমন— কাঁঠাল।

এখানে উল্লেখ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের জৈব রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা হওয়ার কারণে জেনেটিক্স এবং বিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ভিদের নতুন ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করার কাজ শুরু হয়েছে।

10.3 প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি

প্রাণিজগৎ একটি সুবিশাল রাজ্য, এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এদেরকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করার চেষ্টা করা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে, আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে বিভিন্নভাবে এই প্রাণীরা নিজেদের অভিযোজিত করেছে। ফলে অসম্ভব বৈচিত্র্যময় যে প্রাণিজগৎ আমরা এখন

দেখতে পাই তাদেরকে হাতেগোনা কয়েকটা পর্বে ভাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদও আছে।

সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707 (1798-প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুসংবদ্ধ উপায়ে প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস করেন। তিনি তাঁর Systema Naturae বইয়ের দশম সংস্করণে সর্বপ্রথম দ্বিপদ নামকরণের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাই পরবর্তীকালে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন হওয়ার পরেও তাঁকে শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যার জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

10.3.1 প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর এ পর্যন্ত শনাক্তকৃত সকল প্রাণীকে তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়টি বড়ো পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণীর এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য (Taxonomic characteristics) বলা হয়। প্রথমেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে একটু জেনে নেয়া যাক।

কয়েকটি প্রধান শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

1. কোষের বিন্যাস

বিভিন্ন প্রাণীর গঠনের বিন্যাস অনুযায়ী তাদের আলাদা করা যায়। অপেক্ষাকৃত আদিম ও সরল বহুকোষী প্রাণী, যেমন—স্পঞ্জের গঠন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদের শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয় কোষীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ কোষগুলো অবিন্যস্ত থাকে এবং আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে। এর চাইতে একটু জটিল প্রাণী, যেমন—জেলিফিশের ক্ষেত্রে কোষগুলো একত্র হয়ে কলা বা টিস্যু হিসেবে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়। এর চেয়ে জটিলতর প্রাণীর ক্ষেত্রে একাধিক টিস্যু বা কলা মিলে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য অঙ্গ গঠন করে। মানুষ বা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কলা বা টিস্যুগুলো শুধু যে সুসংবদ্ধ হয়ে অঙ্গ তৈরি করে তাই নয়, একাধিক অঙ্গ আবার একসঙ্গে মিলে এক একটা তন্ত্র গঠন করে, যা আবার সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পন্ন করে।

2. দেহের প্রতিসাম্য (Symmetry)

দেহের প্রতিসাম্যের ভিত্তিতে প্রাণীদের আলাদা করা যায়। কোনো কোনো প্রাণী একেবারে অপ্রতিসম, যেমন স্পঞ্জ। এদের দেহকে হুবহু একই রকম একাধিক অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। আবার তেলাপোকা, পাখি বা মানুষকে লম্বালম্বি হুবহু একইরকম দুভাগে ভাগ করা সম্ভব। ,   এই প্রাণীরা দ্বি-পার্শ্বীয়

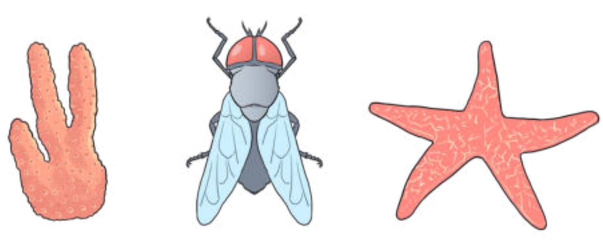

প্রতিসাম্যবিহীন বা অপ্রতিসম স্পঞ্জ , দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম মাছি এবং অরীয় প্রতিসাম্যযুক্ত তারা মাছ

প্রতিসম। আবার তারামাছ, জেলিফিশ ইত্যাদি বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের দেহকে চার, পাঁচ বা আরও বেশি অভিন্ন অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। এদের প্রতিসাম্যের ধরন হলো radial বা অরীয় প্রতিসাম্য।

3. দেহগহ্বর বা সিলোম (coelom)

প্রাণিদেহে বিশেষভাগে গঠিত দেহগহ্বর আছে কি নেই, থাকলে এর গঠন কেমন সেটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এর ওপর ভিত্তি করেও বিভিন্ন প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রাণিদেহে এই বিশেষ দেহগহ্বরের ভূমিকা অনেক। এই গহ্বর বা সিলোমে দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অঙ্গ (বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গসমূহ) একত্র হয়ে আবদ্ধ থাকে। এর ফলে এই অঙ্গসমূহ যেমন সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। এই দেহগহ্বরের ভেতরে অঙ্গসমূহ এক ধরনের তরলে নিমজ্জিত থাকে বলে বাইরের চাপ বা ধাক্কা থেকেও সেগুলো সুরক্ষিত থাকে। প্রবাল বা ফিতাকৃমির মতো সরল জীবসমূহের শরীরে সুগঠিত দেহগহ্বর দেখা যায় না, অন্যদিকে মানুষসহ অন্য জটিলতর জীবে বা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

৭. দেহখণ্ডের উপস্থিতি

কোনো কোনো প্রাণীর দেহ একাধিক খণ্ডে বিভক্ত থাকে, যেমন—কীট পতঙ্গের দেহ তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু মাকড়শার দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত। অনেক ক্ষেত্রে এরকম একাধিক খণ্ডে আবার একই অঙ্গের ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। প্রাণীর শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে এটাও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

5. কঙ্কালতন্ত্রের ধরন

কোনো প্রাণীর কঙ্কালতন্ত্র আছে কি নেই, থাকলে তার ধরন কেমন—শ্রেণিবিন্যাস করার সময় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। কোনো কোনো প্রাণীর দেহের ভেতরে সুগঠিত কঙ্কালতন্ত্র থাকে, যেমন—মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী। আবার কোনো কোনো প্রাণীর দেহের ভেতরে এরকম কঙ্কাল না থাকলেও দেহের বাইরে বহির্কঙ্কাল দেখা যায়, যেমন—শামুক বা কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী। আবার কচ্ছপের মতো ব্যতিক্রমী উদাহরণও আছে যার অন্তঃকঙ্কাল, বহির্কঙ্কাল দুটিই আছে।

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর বাইরে খাদ্য পরিপাকের প্রক্রিয়া, দেহের সংবহন প্রক্রিয়া, প্রজননের ধরন—ইত্যাদিও প্রাণিকুলের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

10.3.2 প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যের সকল প্রাণীদের নয়টি মূল পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই নয়টি পর্বের প্রথম আটটি পর্বের প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী এবং শেষ পর্বের প্রাণীরা সাধারণত মেরুদণ্ডী। এখন খুব সংক্ষেপে এই নয়টি পর্বের প্রাণীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পর্ব 1: পরিফেরা (Porifera)

পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের প্রাণিজগতের সবচেয়ে সরল ও আদিম সদস্য বলা চলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সদস্য হচ্ছে স্পঞ্জ। এই প্রাণীদের উদ্ভব সামুদ্রিক পরিবেশে, পৃথিবীর সকল সমুদ্রে এবং কিছু মিঠা পানির জলাশয়েও এদের দেখা যায়। বহুকোষী হলেও এদের গঠন অতি সরল। এদের দেহের কোষগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, সুবিন্যস্ত হয়ে নির্দিষ্ট টিস্যু গঠন করতে বা অঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারেনা।

Porus শব্দের অর্থ ছিদ্র এবং ferre শব্দের অর্থ বহন করা, এই দুই মিলে পরিফেরা। এই পর্বের প্রাণীদের দেহে অসংখ্য ছিদ্র এবং নালিকা আছে, যেগুলোর মাধ্যমে ক্রমাগত এদের দেহের ভেতরে পানি প্রবাহিত হয়; আর এই প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পানি থেকে খাদ্যকণা ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহের বর্জ্য বাইরে বের করে দেয়। পানি প্রবেশ করার জন্য এদের দেহপ্রাচীরের যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে যেগুলোকে অস্টিয়া (Ostia) বলে। ভেতরের প্রকোষ্ঠটি কোয়ানোসাইট নামে সূক্ষ্ম চুলের মতো ফ্লাজেলা যুক্ত বিশেষ কোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। কোয়ানোসাইটগুলো তাদের ফ্লাজেলা ক্রমাগত নাড়িয়ে ভেতরে একধরনের পানির প্রবাহ তৈরি করে এবং পানি উপরের গর্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়েই কোয়ানোসাইট পানি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

গঠন ও কোষের বিন্যাস : বহুকোষী হলেও কোষগুলো সুবিন্যস্ত নয় তাই এদের সুনির্দিষ্ট টিস্যু কিংবা অঙ্গ নেই। তাই এই পর্বের প্রাণীদের বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন হয় কোষীয় পর্যায়ে।

দেহের প্রতিসাম্য : অপ্রতিসম।

দেহগহ্বর: নেই।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন: অন্তঃকঙ্কাল রয়েছে।

পরিফেরা পর্বের প্রাণী স্পঞ্জ

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: সাধারণত প্রাণিমাত্রই আমরা চলাচলে সক্ষম ধরে নিই। কিন্তু পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা প্রায় সবাই পূর্ণবয়সে পৌঁছার আগেই চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। লার্ভা অবস্থায় এরা চলনক্ষম থাকলেও পরিণত বয়সে এরা সমুদ্রের কঠিন তলদেশে স্থায়ীভাবে আটকে থাকে।

পর্ব 2 : নিডেরিয়া (Cnidaria)

নিডারিয়া পর্বের প্রাণীরা পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রাণী। এই পর্বের প্রাণীদের কোষসমূহ টিস্যু বা কলা তৈরি করে কাজ করতে পারে, তবে এদেরও সুনির্দিষ্ট অঙ্গ নেই।

দেহের ভেতরে সিলেন্টেরন নামে একটি প্রশস্ত গহ্বর থাকে যার ভেতরে খাদ্য পরিপাক ও পরিবহণ ঘটে। (তবে এই গহ্বর সিলোম বলতে তোমরা যে দেহগহ্বরের কথা জেনেছ সেটি নয়।) সিলেন্টেরনের ভেতরে আলাদা করে কোনো পরিপাক অঙ্গ থাকে না, বরং খাদ্য এই গহবরে পৌঁছার পর এর প্রাচীরের কোষের সাহায্যে সেখান থেকে পুষ্টি শোষিত হয়। একটিমাত্র মুখছিদ্র থাকলেও এই পর্বের প্রাণীদের আলাদা করে কোনো পায়ুপথ নেই। সাধারণত মুখের আশপাশে শিকার ধরার জন্য শুঁড়ের মতো টেন্ট্যাকল থাকে।

নিডেরিয়া পর্বের প্রাণী জেলিফিশ

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক,

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক কোষের সমন্বয়ে টিস্যু থাকলেও নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট অঙ্গ নেই।

দেহের প্রতিসাম্য : অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর : নেই।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : হাড়ের তৈরি দৃঢ় কঙ্কালতন্ত্র নেই। তবে সিলেন্টেরন নামক গহ্বর পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে যা দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : তবে নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহত্বকে নিডোব্লাস্ট (Cnidoblast) নামক কোষ থাকে, এর সাহায্যে এরা সকলেই বিষাক্ত হুল বা কাঁটা ছুড়ে শিকার করতে বা আত্মরক্ষা করতে পারে। তাই এই পর্বের নামটাও এসেছে গ্রিক Knide অর্থ রোমকাঁটা এবং aria অর্থ সংযুক্ত থেকে। এই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–জেলিফিশ, প্রবাল, হাইড্রা ইত্যাদি।

পর্ব 3: প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)

প্লাটিহেলমিনথেস নামটা কঠিন মনে হলেও এই পর্বের প্রাণীও আমাদের খুব অপরিচিত নয়। চ্যাপ্টা বা ফিতা কৃমি এই পর্বের প্রাণী তাই প্লাটিহেলমিনথেস নামটিও এসেছে গ্রিক platy অর্থ চ্যাপ্টা এবং helminthes অর্থ কৃমি থেকে। এদের গঠন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের তুলনায় অনেক অনেক সরল হলেও আগের পরিফেরা এবং এনিলিডা পর্বের প্রাণীদের থেকে কিছুটা জটিল। এই পর্বের প্রাণীরা অনেক ক্ষেত্রেই পরজীবী, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহের ভেতরে বাস করে। স্বাধীনভাবে বাস করে এমন প্রাণীও আছে, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জলাশয়ে বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে বাস করে। এই পর্বের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার থেকে শুরু করে প্রায় 20 মিটার (66 ফুট) পর্যন্ত হতে পারে!

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক–

গঠন ও কোষের বিন্যাস : কিছু কিছু তন্ত্র গঠিত হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে চলন ও রেচনের মতো শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। শ্বসনতন্ত্র ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্র নেই। পেশিতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র থাকলেও পূর্ণাঙ্গ পরিপাকতন্ত্র গঠিত হয়নি। এদের দেহের পেশিগুলো স্তরে স্তরে ও গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর: নেই।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : নেই।

পর্ব ৫ : নেমাটোডা (Nematoda)

গ্রিক nema শব্দের অর্থ সুতা। এই পর্বের প্রাণীরা নলাকার, সরু ও লম্বা হয়ে থাকে। চ্যাপ্টা বা ফিতাকৃমির সাথে এদের পার্থক্য হলো এদের এই নলাকার গঠন; আর এই গঠন স্থায়ীত্ব পায় এদের দেহের ভেতরে থাকা গহবরের জন্য। গহবরের ভেতরে পানিপূর্ণ থাকার কারণে তা এদের গঠনকে দৃঢ়তা প্রদান করে ও কঙ্কালের মতো কাজ করে। এদের দেহে পরিপাকনালি রয়েছে, এর গঠন সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বের প্রাণীরাও অনেক ক্ষেত্রেই পরজীবি, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহের ভেতরে বাস করে। যেমন—হুকওয়ার্ম এই পর্বের একধরনের কৃমি, এরা মানুষের অন্ত্রে বাস করে। এদের দেহ পুরু কিউটিকল নামক পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে। ফলে পোষক দেহের পরিপাকনালির ভেতরে থাকলেও পরিপাকনালির যে তীব্র পাচক রস বা এনজাইম, তাতে এদের কোনো ক্ষতি হয় না। স্বাধীনভাবে বাস করে এমন প্রাণীও আছে, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিঠা পানির পরিবেশে বাস করে। এই পর্বের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার থেকে শুরু করে প্রায় 7 মিটার (23 ফুট) পর্যন্ত হতে পারে।

এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

গঠন ও কোষের বিন্যাস : সরল তবে মুখ ও পায়ুপথ সহ পূর্ণাঙ্গ পরিপাকতন্ত্র আছে। তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক, রেচন ও চলনের মতো শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। তবে ফিতাকৃমিদের মতো এদেরও শ্বসনতন্ত্র ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্র নেই।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর: সুগঠিত সিলোম বা দেহগহ্বর না থাকলেও ছদ্মসিলোম (pseudo-coelom) রয়েছে। এর ভেতরে পরিপাকতন্ত্রের অবস্থান।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : হাড়ের তৈরি কঙ্কালতন্ত্র নেই। তবে দেহ গহ্বরের ভেতরে পানিপূর্ণ থাকায় তা দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

পর্ব 5 : অ্যানিলিডা (Annelida)

কেঁচো বা জোঁকের শরীরের গঠন কেমন কখনো খুব ভালো করে খেয়াল করেছ? লক্ষ করলে দেখবে এই প্রাণীদের সারা শরীর অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত, মনে হয় যেন অনেকগুলো ক্ষুদ্র আংটি পর পর জোড়া দিয়ে শরীরটা তৈরি। ঠিক এই কারণেই কেঁচো ও এই ধরনের প্রাণীদের নিয়ে যে পর্ব গঠিত তার নাম রাখা হয়েছে 'অ্যানিলিডা', এই শব্দটা এসেছে ল্যাটিন annulus থেকে যার অর্থ হচ্ছে আংটি। এই পর্বের প্রাণীদের দেহের গঠন লম্বা নলাকৃতির। প্রায় ক্ষেত্রেই এই প্রাণীদের দেহে চুলের মতো শক্ত লোম বা সিটি (setae) থাকে যা তাদের চলনে সাহায্য করে।

অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণী জোঁক

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর : সত্যিকারের দেহগহ্বর আছে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি আছে।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : হাড়ের তৈরি দৃঢ় কঙ্কালতন্ত্র নেই। তবে দেহাভ্যন্তরে তরলে পূর্ণ গহ্বর থাকে যা দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে।

পর্ব 6 : আর্থ্রোপোডা (Arthropda)

আর্থ্রোপোডা শব্দটা এসেছে গ্রিক arthro ও poddos থেকে, যার অর্থ হলো যথাক্রমে 'সন্ধি' ও 'পা'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই পর্বের প্রাণীদের সন্ধিযুক্ত পা থাকে। আর্থ্রোপোডা প্রাণীরাজ্যের সর্ববৃহৎ পর্ব, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের 80% প্রাণীই এই পর্বের। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যত বৈচিত্র্যময় জীবের প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে তার বেশিরভাগই এই পর্বের, আর এই সংখ্যাটা 12 লক্ষেরও বেশি। সকল কীটপতঙ্গ (যেমন—তেলাপোকা, ফড়িং ইত্যাদি), অ্যারাকনিড (যেমন—মাকড়শা, বিছা, উকুন ইত্যাদি), এবং ক্রাস্টাসিয়ান (যেমন—কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি) এই পর্বের প্রাণী।

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর: দেহ গহ্বর থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেহগহ্বর রক্তে পূর্ণ থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : পুরো দেহ কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত থাকে।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : কাইটিন দিয়ে তৈরি বহির্কঙ্কাল বা খোলস রয়েছে। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কঙ্কালের বৃদ্ধি ঘটে না। কাজেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে এরা এই কঙ্কাল মুক্ত করে দেয়, এবং নতুন করে তা আবার জন্মায়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে। এন্টেনা এবং চোখ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে পুঞ্জাক্ষি থাকে (যেমন—মাছি)।

পর্ব 7 : মোলাস্কা (Mollusca)

মোলাস্কা পর্বের প্রাণী অক্টোপাস

Molluscus শব্দ থেকে এই পর্বের নামকরণ, যার শাব্দিক অর্থই হলো 'নরম'। মোলাস্কা পর্বের প্রাণীদের দেখলেই এই নামের কারণ বোঝা যায়, আমাদের পরিচিত প্রাণীদের মধ্যে শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস ইত্যাদি এই পর্বের অন্তর্গত। এদের প্রত্যেকের দেহ নরম ও মাংসল। এদের প্রশস্ত মাংসল পা থাকে, এবং দেহ ম্যান্টেল (mantle) নামক পেশিযুক্ত আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। আর্থ্রোপোডার পরে মোলাস্কা দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব, এখন পর্যন্ত এই পর্বের এক লাখের বেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা মূলত নিশাচর, পৃথিবীর প্রায় সকল মিঠা ও লোনা পানির জলীয় পরিবেশে এদের দেখা যায়, তবে বেশ কিছু স্থলচর প্রজাতিও রয়েছে। এই পর্বের প্রাণীরা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, এগুলো নানা বর্ণ ও আকৃতির হয়ে থাকে; অতিক্ষুদ্র শামুক থেকে শুরু করে অতিকায় স্কুইড পর্যন্ত এই পর্বের অন্তর্গত।

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে সুগঠিত তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর : সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : অনেকেরই ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি শক্ত বহির্কঙ্কাল থাকে (যাকে আমরা ঝিনুক বা শামুকের খোলক হিসেবে দেখি) যা এদের নরম দেহকে সুরক্ষা দেয়। অনেকের আবার এরকম কঙ্কাল নেই, যেমন অক্টোপাস, স্কুইড, সী স্লাগ ইত্যাদি।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : সুস্পষ্ট মস্তিষ্ক বিদ্যমান। সুগঠিত স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণীর (যেমন—স্কুইড ও অক্টোপাস) স্নায়ুতন্ত্র অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত।

পর্ব ৪: একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

যথারীতি এই পর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রেও নামের অর্থ বুঝলেই বৈশিষ্ট্যগুলো আন্দাজ করা যায়। গ্রিক শব্দ echinos এর অর্থ হচ্ছে কাঁটা, আর derma শব্দের অর্থ হলো ত্বক। নাম দেখেই বুঝতে পারছ এই পর্বের প্রাণীদের দেহত্বক কাঁটা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। একাইনোডার্মাটা পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক পরিবেশে বাস করে। এদের আলাদা মাথা নেই। প্রধান যে বৈশিষ্ট্য এই পর্বের সকল প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় তা হলো অরীয় প্রতিসাম্য। এছাড়া এই পর্বের প্রাণীদের আরেকটা অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেটা হলো এদের সারা দেহে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত পানি সংবহন তন্ত্র। এই তন্ত্রের মাধ্যমে এদের শ্বসন, খাদ্যগ্রহণ ও রেচনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয়, এই তন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে অসংখ্য পেশিবহুল নলাকৃতির পা। এই নলগুলোতে পানির চাপ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে এগুলোর সংকোচন-প্রসারণ ঘটে, আর এর মাধ্যমেই এই প্রাণীরা চলাচল করে। এই পর্বের প্রাণীর মধ্যে আছে স্টার ফিশ বা তারা মাছ, সি অর্চিন, সি কিউকাম্বার ইত্যাদি। এই প্রাণীরা দেখতে অতি বিচিত্র হলেও এই একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীদের সঙ্গেই আমাদের কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের (মানুষও যেই পর্বের অন্তর্ভুক্ত) বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায়!

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক,

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে সুগঠিত তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : ভ্রুণ থাকা অবস্থায় এদের দেহে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়, তবে পূর্ণবয়স্ক প্রাণীদের দেহ অরীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর : সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : দেহের অভ্যন্তরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি অন্তঃকঙ্কাল থাকে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : সুগঠিত পানি সংবহনতন্ত্র রয়েছে যা বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে সহায়তায় করে। এদের অনেক প্রাণীর দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তা পুনর্গঠন করার ক্ষমতা আছে।

পর্ব ৭ : কর্ডাটা (Chordata)

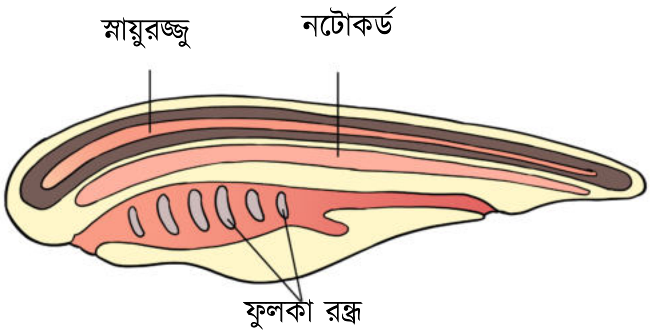

নটোকর্ড এবং নার্ভকর্ড

প্রাণিজগতের সকল পর্বের মধ্যে এই কর্ডাটা পর্বের সাথেই আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত, কারণ আমরা নিজেরা, অর্থাৎ মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি, কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীই কিন্তু মেরুদণ্ডী নয়। chorda শব্দের মানে হলো রজ্জু বা নালি। এই পর্বের সকল প্রাণীর দেহে পিঠ বরাবর লম্বালম্বি একটি নালি দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, একে বলা হয় নটোকর্ড (Notochord)। এটি নিরেট ও দণ্ডাকৃতির। আর এই নটোকর্ডের ঠিক উপরে সমান্তরালভাবে আরেকটা দণ্ডাকৃতির নালি থাকে, এটি হলো স্নায়ুরজ্জু বা নার্ভকর্ড। তবে এটি নটোকর্ডের মতো নিরেট নয়, বরং ফাঁপা নলের মতো হয়ে থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নটোকর্ড আরো বিকশিত হয়ে শক্ত মেরুদণ্ডে রূপ নেয়। আর নার্ভকর্ড বিকশিত হয়ে দেহের উপরে বা সামনের দিকে সুগঠিত মস্তিষ্ক গঠন করে।

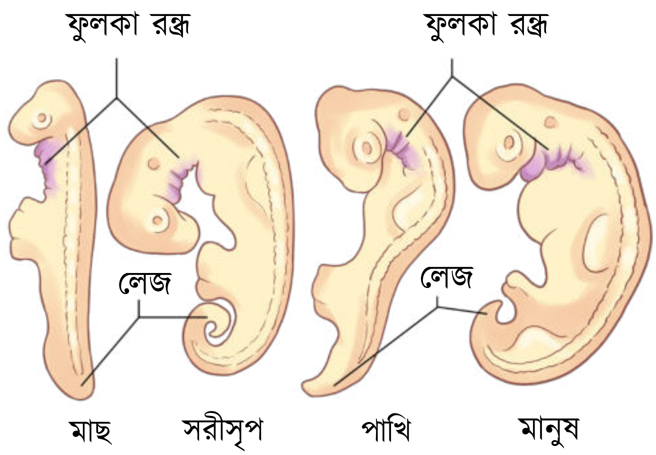

ভ্রূণ অবস্থায় মানুষ, পাখিসহ কর্ডাটা পর্বের সব প্রাণীরই লেজ ও ফুলকা রন্ধ্র রয়েছে।

কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীর দেহে লেজ, এবং গলবিলের দুইপাশে ফুলকা রন্ধ্রের (Gill slits) উপস্থিতি দেখা যায়। এটা জেনে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ, কারণ মানুষ এবং অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে আমরা এর কোনোটাই দেখিনা। সত্যি বলতে কী, ভ্রূণ অবস্থায় যদি মানুষ, পাখিসহ কর্ডাটা পর্বের যে কোনো প্রাণীকে দেখো; দেখবে প্রত্যেকেরই লেজ ও ফুলকা রন্ধ্র রয়েছে। বেড়ে ওঠার একটা পর্যায়ে মানুষের ক্ষেত্রে এই ফুলকা রন্ধ্র পরিবর্তিত হয়ে কানের অংশ ও টনসিল গঠন করে। অন্যদিকে মাছের ক্ষেত্রে পানির নিচে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই অঙ্গ আরো সুগঠিত হয়ে ফুলকায় রূপ নেয়। লেজের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। ভ্রূণ অবস্থায় মানুষ, পাখি ইত্যাদি সকল প্রাণীর লেজ স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু মানুষসহ অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এগুলো লুপ্ত হয়ে যায়।

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে সুগঠিত তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে জটিল শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : এদের দেহে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর : সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি বিদ্যমান।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : দেহের অভ্যন্তরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি অন্তঃকঙ্কাল থাকে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : সুগঠিত ও সম্পূর্ণ পরিপাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এদের সবার দেহে লেজ ও ফুলকা গ্রন্থি দেখা যায়।

কর্ডাটা পর্বকে আবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপপর্বে ভাগ করা যায়:

ক. ইউরোকর্ডাটা (Urochordata):

এরা চলনক্ষম নয়, সামুদ্রিক উদ্ভিদের মতোই কোনো শক্ত বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে দেহকে আটকে রাখে। ফোলানো শরীর আর নলের মতো গঠন এদের পানি সংবহন করতে সাহায্য করে। লার্ভা অবস্থায় নটোকর্ড আর স্নায়ুরজ্জু থাকলেও পরিণত বয়সে এই দুটোই বিলুপ্ত হয়। এদের গঠন নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে। উদাহরণ : অ্যাসিডিয়া।

খ. সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata) :

সারাজীবনই এদের দেহে নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দেখতে মাছের মতো। এই উপপর্বের প্রাণীদের বিবর্তনের ধারায় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের সবচেয়ে কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে ধারণা করা হয়। উদাহরণ: অ্যাম্ফিঅক্সাস।

গ. ভার্টিব্রাটা **(Vertebrata):**

এই উপ-পর্বের প্রাণীরাই মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। এদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এদের সুনির্দিষ্ট মস্তক থাকে, স্নায়ুরজ্জুর উন্নত রূপ হিসেবে স্পাইনাল কর্ড গঠিত হয় এবং স্পাইনাল কর্ডের সুরক্ষা দানের জন্য দৃঢ় মেরুদণ্ড থাকে। এছাড়া এদের মস্তিষ্ক শক্ত খুলির ভেতরে সুরক্ষিত থাকে, এবং স্পাইনাল কর্ডের সঙ্গে তা যুক্ত থাকে। অন্তঃকঙ্কাল এই প্রাণীদের চলনে সহায়তায় করে। গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের 7টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই সাতটি শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে। শ্রেণিগুলো হলো:

(1) চোয়ালবিহীন মাছ (Cyclostomata)

(2) অস্থিযুক্ত মাছ (Osteichthyes)

(3) কোমলাস্থিযুক্ত মাছ (Chondrichthyes)

(4) উভচর প্রাণী (Amphibia)

(5) সরীসৃপ (Reptilia)

(6) পাখি (Aves)

(7) স্তন্যপায়ী (Mammalia)

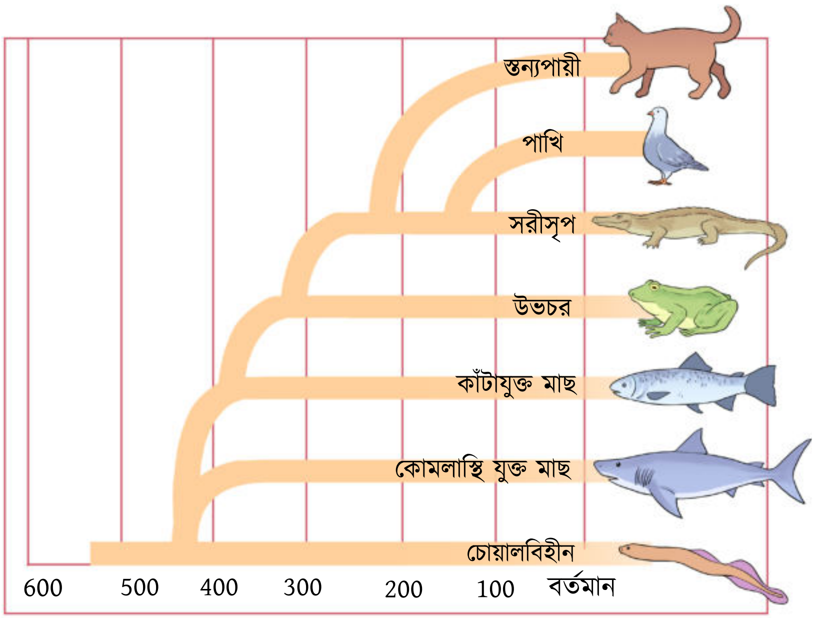

সময়ের সাথে বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব

10.3.3 স্তন্যপায়ী (Mammalia)

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রেণিও বৈচিত্র্যময়। এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার স্তন্যপায়ী প্রাণী শনাক্ত হয়েছে। যেসব প্রাণী মায়ের দুধ পান করে জীবনধারণ করে তাদের সাধারণ অর্থে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। এরা সন্তান প্রসব করে ও সন্তানকে দুধ পান করায়। স্তন্যপায়ী বা Mammal শব্দটা এসেছে mammary glands অর্থাৎ স্তনগ্রন্থি থেকে। তবে এরও ব্যতিক্রম আছে, যেমন—প্লাটিপাস ডিম পাড়ে, তবে এরাও সন্তানকে জন্মের পর দুধ খাওয়ায়। স্তন্যপায়ীদের শরীর লোমে আবৃত থাকে। সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী উষ্ণ রক্তের প্রাণী, এবং এদের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এদের ফুসফুস আছে।

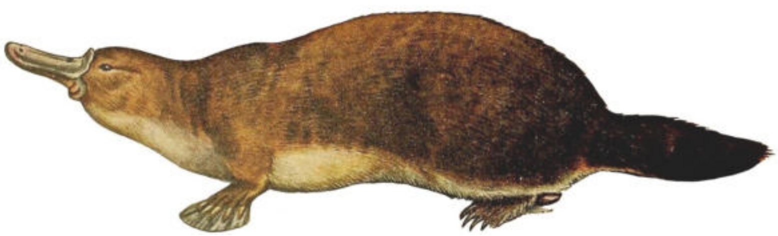

প্লাটিপাস মেরুদণ্ডী প্রাণী হলেও ডিম পাড়ে।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বভুক সব ধরনের প্রাণীই ধরেছে। প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মুখে দাঁত থাকে এই দাঁতের ধরন দেখেই প্রাণীটি খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শিকারী প্রাণী, যেমন বাঘ, বেড়াল, কুকুর, নেকড়ে এদের দাঁতের গঠন ভালো করে খেয়াল করে দেখো। অন্যদিকে গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি তৃণভোজীদের দাঁত লক্ষ করো, পার্থক্যটা সহজেই ধরতে পারবে।

যেহেতু উষ্ণ রক্তের প্রাণী, স্তন্যপায়ীদের শরীরে তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে চুল বা লোমের অস্তিত্ব দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ত্বকের নিচে চর্বির স্তরও এই প্রাণীদের শরীরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই কারণে শীতের দেশের প্রাণীদের লক্ষ করলে দেখবে, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের লোম ঘন ও বড়ো হয়।

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতোই, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কঙ্কাল ও পেশিতন্ত্র থাকে এবং এদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রাণীরা চলাচল করে। এদের পেশির কোষগুলোতে যে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, সেখানেই এই চলনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়।

বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই চার পায়ে চলাফেরা করে। তবে এখানেও ব্যতিক্রম আছে। বাদুড় স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু এদের সামনের দুই পা-ই আসলে বিবর্তিত হয়ে ডানায় রূপ নিয়েছে। আবার পানিতে বাস করা স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমি মাছ বা ডলফিনের কথা ভেবে দেখো। এদের সামনের পা দুইটি বিবর্তিত হয়ে পাখনায় রূপ নিয়েছে শুধু তাই নয়, কালক্রমে পেছনের পা দুইটির বিলুপ্তিও ঘটেছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সবচেয়ে জটিলভাবে বিবর্তিত প্রাণী বললে অত্যুক্তি হয় না। এদের মস্তিষ্ক জটিল বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এছাড়া এদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় থাকার কারণে এরা চারপাশের পরিবেশে থেকে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ ও সাড়া প্রদান করতে সক্ষম। পরবর্তী সময়ে তোমরা এই প্রাণীদের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানবে।

10.3.৫ কীটপতঙ্গ

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের বিচরণ। প্রায় 40 থেকে 45 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আগমন ঘটে। এরপর বড়ো একটা সময়জুড়ে পৃথিবীর প্রায় সব প্রতিবেশেই এদের আধিপত্য ছিল। ওইসময় কীটপতঙ্গ আকারেও বেশ বড়ো ছিল, এক একটি গঙ্গাফড়িং ছিল গাংচিল পাখির সমান। কালক্রমে বিবর্তনের ধারায় পৃথবীতে আবির্ভূত হয় পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। একসঙ্গে কমতে থাকে কীটপতঙ্গের প্রভাব। তবে আকারে ছোটোহয়ে গেলেও প্রজাতিবৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্যে এদের জুড়ি নেই। বর্তমান সময়েও আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির কীটপতঙ্গ। প্রাণিজগতে সবচেয়ে বেশি প্রজাতি আছে কীটপতঙ্গ শ্রেণিতে, পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রাণিজগতের প্রায় 80 শতাংশই কীটপতঙ্গ। এখন পর্যন্ত এদের প্রায় 10 লক্ষ প্রজাতির বর্ণনা হয়েছে।

কীটপতঙ্গের দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত: মাথা, বক্ষদেশ ও উদর। কাইটিন দ্বারা গঠিত শক্ত বহিঃকঙ্কালে দেহ আবৃত। বহিঃকঙ্কাল দেহকে সুরক্ষা করে; এটি বিভিন্ন পেশির জন্য সংযোগ বিন্দু হিসেবেও কাজ করে। বৃদ্ধির সময় নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বহিঃকঙ্কালের খোলস বদলায়। কীটপতঙ্গের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের মাত্র তিন জোড়া বক্ষদেশীয় পা এবং অধিকাংশ কীটপতঙ্গের দুই জোড়া বক্ষদেশীয় ডানা রয়েছে। কীটপতঙ্গ ব্যাপক বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আকারের দিক থেকে কোনো কোনোটি এক মিলিমিটারের কম, আবার বড়োদের দৈর্ঘ্য বা পাখার বিস্তৃতি কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এদের জীবনকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে বহু বছর পর্যন্ত হতে পারে; এরা বিচ্ছিন্ন বা সমাজবদ্ধভাবে থাকতে

পারে। কীটপতঙ্গ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী ও জৈব পদার্থ খেয়ে জীবন ধারণ করে; খাদ্য উৎসের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মিথোজীবিতা থেকে পরজীবিতা বা শিকার পর্যন্ত হতে পারে। কীটপতঙ্গের রয়েছে সুগঠিত পরিপাক, রক্তসংবহন, শ্বসন, স্নায়ু ও প্রজননতন্ত্র। পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয় প্রধানত খাদ্যনালির মধ্য অংশে।

কীটপতঙ্গ ছোটোআকারের প্রাণী হলেও এদের জীবনচক্র বেশ জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। প্রায় সব ধরনের কীটপতঙ্গ এদের জীবনচক্রে 3 বা 4টি ধাপ অতিক্রম করে। প্রজাপতি তার জীবদ্দশায় 4টি ধাপ সম্পন্ন করে। প্রথমে স্ত্রী প্রজাপতি ডিম দেয়, এরপর ডিম থেকে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা এবং পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিতে পরিণত হয়। ঘাসফড়িংজাতীয় পতঙ্গ জীবনে ডিম, নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ এ 3টি ধাপ সম্পন্ন করে। কীটপতঙ্গের জীবনচক্রের এ ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় রূপান্তর। অনেক কীটপতঙ্গ এককভাবে জীবনযাপন করলেও কোনো কোনো পতঙ্গ দলবদ্ধ হয়ে সামাজিক জীবনযাপন করে। এদের দলবদ্ধ বসবাস অনেকটা মানুষের সামাজিক জীবনযাপনের মতোই। কীটপতঙ্গের সামাজিক জীবনে কাজের দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। প্রতিটি দলের মধ্যে থাকে একটা রানী, কয়েকটা পুরুষ আর থাকে অসংখ্য শ্রমিক। সামাজিক জীবনযাপনের ফলে এদের মধ্যে এক ধরনের শ্রমবিভাগ দেখা যায়। শ্রমিকরা খাবার সংগ্রহ এবং বাসস্থানের দেখাশোনাসহ সব ধরনের কাজ করে থাকে। রানি ও পুরুষ মূলত বংশবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

ছোটো পিঁপড়া থেকে শুরু করে ঘরের কোণের আরশোলা এবং বাহারি প্রজাপতি ও ঘাসফড়িং সবই কীটপতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। মাটি থেকে শুরু করে গাছপালা, জলাশয়, ফসলের মাঠ এমনকি আমাদের বসতবাড়িতেও এদের দেখা যায়। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এ প্রাণীগুলো হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে যে আন্তঃসম্পর্ক ও খাদ্যজাল গড়ে উঠেছে তা কীটপতঙ্গ ছাড়া ভাবাই যায় না।

কীটপতঙ্গকে আমরা সাধারণত ক্ষতিকর হিসেবে জানলেও প্রকৃতিতে রয়েছে এদের অপরিসীম উপকারী ভূমিকা। উদ্ভিদের পরাগায়ন থেকে শুরু করে প্রতিবেশে সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা পায় কীটপতঙ্গের মাধ্যমে। অন্য প্রাণীর খাদ্য জোগান দিতেও রয়েছে কীটপতঙ্গের ভূমিকা। এই পোকামাকড় খেয়েই কিন্তু পাখি, বাদুড় এবং ছোট আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বেঁচে থাকে। সুতরাং পোকামাকড় না থাকলে পাখি, বাদুড়, ব্যাঙ এবং মিঠা পানির মাছও অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা নিজেরাই কখনো হয় অন্যের খাদ্য, কখনো বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানের মাধ্যমে তারা হয়ে উঠে বাস্তুতন্ত্র বা ecosytem-এর সেবক। কোনো কোনো পতঙ্গ ক্ষতিকর হলেও অধিকাংশ প্রজাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের উপকার করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মৌমাছি, প্রজাপতি, রেশমকীট, ঘাসফড়িং ইত্যাদি। মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে এবং মৌচাকে জমা করে। এ মধু আর মোম অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এছাড়া মৌমাছি বিভিন্ন ফসলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেশমকীট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পতঙ্গ। রেশমকীট পালনের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয় রেশম সুতা যা থেকে মূল্যবান বস্ত্রসামগ্রী তৈরি হয়। কীটপতঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো প্রজাপতি ও ঘাসফড়িং। রংবেরঙের প্রজাপতির ওড়াউড়ি নিমেষেই মুগ্ধ করে মানুষকে।

শুধু সৌন্দর্য আর বর্ণিল বাহার নয়, ফুলে ফুলে ঘুরে পরাগায়নের মাধ্যমে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এদের ভূমিকা অপরিসীম। পতঙ্গের আরেকটি সুপরিচিত দল পিঁপড়া। এরা মাটির গর্তে, গাছের কোটরে অথবা বিভিন্ন আসবাবপত্রের ফাঁকে বাসা বাঁধে। এরা খুবই সামাজিক। সারি বেঁধে চলাচল এবং খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের বাড়ি ফেরা ও খাবার সংগ্রহের জন্য সূর্যালোকের কৌণিকতা নিরূপণ করে চলে। এরা আমাদের উচ্ছিষ্ট খাবার এবং অন্য মৃত পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।

10.৫ প্রাণিজগতে মানুষের অবস্থান

জীববিজ্ঞানীরা জীবজগতকে বিভিন্ন প্রজাতিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। যেসব প্রাণী নিজেদের মধ্যে যৌনমিলনের মাধ্যমে এমন উত্তরসূরির জন্ম দিতে পারে যারা প্রজনন করতে পারে, তাদেরকে একই ‘প্রজাতি’র (species) অন্তর্ভূত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেসব প্রজাতি অতীতের একটি সাধারণ পূর্বসূরি থেকে উৎপত্তি লাভ করে কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে তাদেরকে ‘গণ’ (Genus) নামক দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাঘ, সিংহ, চিতা এবং জাগুয়ার প্রত্যেকে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী হলেও প্রত্যেকে ‘প্যানথেরা’ (Panthera) গণের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসের পদ্ধতি অনুসরণ করে জীববিজ্ঞানীরা প্রতিটি জীবকেই একটি দ্বিপদী ল্যাটিন নাম দিয়েছেন; যার প্রথমটি নির্দেশ করে গণ, পরেরটি প্রজাতি। উদাহরণস্বরূপ, সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম হলো ‘প্যানথেরা লিও’ (*Panthera leo*), যেখানে ‘*Panthera*’ ও ‘*leo*’ যথাক্রমে গণ ও প্রজাতিকে নির্দেশ করছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Homo sapiens*. এখানে ‘*Homo*’(মানব) হলো গণের নাম এবং ‘*sapiens*’ (জ্ঞানী) হলো প্রজাতি।

মানুষের নিকটবর্তী প্রজাতির মাঝে শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং ওরাংওটাং এখনও বেঁচে আছে। এরা সকলেই ‘*Homo*’ গণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী মানুষ হলো Chordata পর্বের, Vertebrata উপপর্বের অন্তর্গত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রেণি Mammalia-এর Primate বর্গের Hominidae গোত্রের *Homo* গণের *sapiens* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের শ্রেণিবিন্যাস :

পর্ব: Chordata

উপপর্ব: Vertebrata

শ্রেণি: Mammalia

বর্গ: Primate

গোত্র: Hominidae

গণ: *Homo*

প্রজাতি: *sapiens*

অধ্যায় ১১

ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ

ভৌগোলিকভাবে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, কর্কট ক্রান্তি এবং ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমার ছেদবিন্দু, বাংলাদেশের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় নির্মিত হতে যাচ্ছে একটি সুরম্য মানমন্দির; ছবিতে সেই মানমন্দিরের নকশা

অধ্যায় ১১ ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ ভৌগলিক স্থানাঙ্ক :
- ☑ অক্ষাংশ
- ☑ দ্রাঘিমাংশ
- ☑ মূল মধ্যরেখা
- ☑ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
- ☑ বিভিন্ন ধরণের ভৌগোলিক অঞ্চল
- ☑ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত ইস্যু ও মানুষের ভূমিকা

তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছ কোনো স্থান সম্পর্কে মানুষ কীভাবে একে অন্যকে জানায়? উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায় কারো বাড়ি খুঁজে পেতে হলে শুধু এলাকার নাম বললে অনেক সময় বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন কোনো একটা বড়ো গাছ, দোকান, ভবন এরকম বিশেষ কিছুর অবস্থানের সাপেক্ষে বাড়ির অবস্থান বলতে হয়, যেটাকে আপেক্ষিক অবস্থান (Relative Location) বলা হয়। এই পদ্ধতি কোনো একটি ছোট স্থানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পুরো পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর কোনো কিছুর অবস্থান এভাবে জানানো বেশ কঠিন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। সেক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে ভৌগলিক স্থানাঙ্ক বা প্রকৃত অবস্থান (Absolute Location)।

11.1 ভৌগলিক স্থানাঙ্ক (Geographic Grid)

পৃথিবীর কোনো স্থানের ভৌগলিক স্থানাঙ্ক বোঝার জন্য দুই ধরনের কাল্পনিক রেখা ব্যবহার করা হয়; সেগুলো হচ্ছে :

(1) অক্ষ রেখা।

(2) দ্রাঘিমা রেখা।

রেখাগুলো বোঝার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কাগজে আমরা যেভাবে একটা বৃত্ত এঁকে পৃথিবী বোঝানোর চেষ্টা করি বাস্তবে সেটা এরকম না, পৃথিবী বলের মত একটা ত্রিমাত্রিক গোলক। কাজেই আমরা যদি একটা বল কিংবা গোলাকার কিছু নিয়ে এর উপরে আড়াআড়িভাবে ডান থেকে বামে সমান্তরাল

কিছু দাগ দিতে থাকি তাহলে দাগগুলো হবে কিছু বৃত্ত, পৃথিবীর বেলায় এটাই হবে অক্ষ রেখা। এই বৃত্তগুলো গোলকের যতই প্রান্তের দিকে যাবে ততই ছোট হতে থাকবে। সবচেয়ে উপরে এবং সবচেয়ে নিচে সেটি হবে দুটি বিন্দু, পৃথিবীর বেলায় যেটি হবে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। এবার যদি লম্বালম্বিভাবে একই ধরনের কাজ করা হয়, অর্থাৎ উপর-নিচ করে দুই মেরু বরাবর দাগ দিতে থাকি তাহলে পৃথিবীর বেলায় সেটি হবে দ্রাঘিমা রেখা। অর্থাৎ আড়াআড়ি রেখাগুলোকে বলা হচ্ছে অক্ষ রেখা যা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম বরাবর গেছে। আর লম্বালম্বিগুলো হলো দ্রাঘিমা রেখা যেগুলো উত্তর দক্ষিণ বরাবর গিয়েছে।

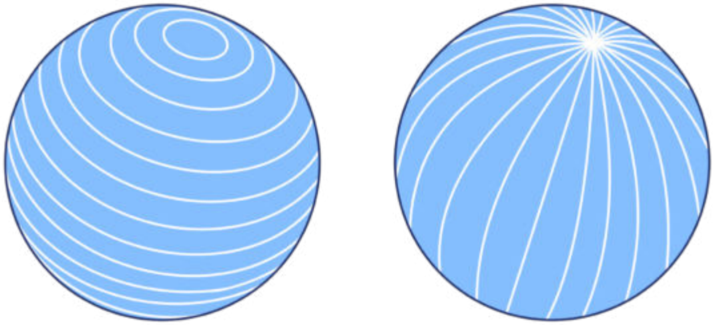

(a) (b)

(a) পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষ রেখা. সমান্তরাল পূর্ণবৃত্ত এবং তা মেরু অভিমুখে ক্রমাগত ছোট হতে হতে উভয় মেরুতে বিন্দুতে পরিণত হয়। (b) উত্তর দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত দ্রাঘিমা রেখাগুলো প্রত্যেকটি অর্ধবৃত্ত, সমান দীর্ঘ এবং তা এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত।

পৃথিবীর স্থানাঙ্ক বোঝানোর জন্য অক্ষ রেখা এবং দ্রাঘিমা রেখার পাশাপাশি তোমরা অক্ষাংশ (Latitude) আর দ্রাঘিমাংশের (Longitude) কথাও শুনে থাকবে, এই দুটির মাঝে পার্থক্য কী? প্রথমেই জেনে রাখো অক্ষ রেখা আর দ্রাঘিমা রেখা হচ্ছে রেখা, অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ হচ্ছে কোণ। একটা নির্দিষ্ট কোণের জন্য একটি নির্দিষ্ট অক্ষ রেখা আঁকা হয় তাই একটি অক্ষ রেখার প্রতিটি বিন্দুতে অক্ষাংশের মান সমান। একইভাবে, একটা নির্দিষ্ট কোণের জন্য একটি নির্দিষ্ট দ্রাঘিমা রেখা আঁকা হয় তাই একটি দ্রাঘিমা রেখার প্রতিটি বিন্দুতে দ্রাঘিমাংশের মান সমান। পৃথিবী পৃষ্ঠের যে কোনো স্থানের একটি অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ রয়েছে এবং এই দুটি স্থানাঙ্ক জানলেই স্থানটি কোথায় সেটি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যাবে।

কোনো স্থানের অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশের পরিমাপটি হচ্ছে দুটি সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ রেখা থেকে তাদের কৌণিক দূরত্ব—কৌণিক দূরত্ব বলতে দুটি রেখা বা তলের অন্তর্গত কোণকে বোঝায়। যেহেতু এসব ভৌগলিক স্থানাঙ্ক গুলো কোণ দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাই তার একক হচ্ছে ডিগ্রি। এখানে 90 ডিগ্রিতে এক সমকোণ, 60 মিনিটে 1 ডিগ্রী এবং 60 সেকেন্ডে 1 মিনিট। তবে এই সেকেন্ড আর মিনিটের সঙ্গে সময় পরিমাপের মিনিট এবং সেকেন্ডের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমরা এবারে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের আরও কিছু বিষয় বিশদ জেনে নেই।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

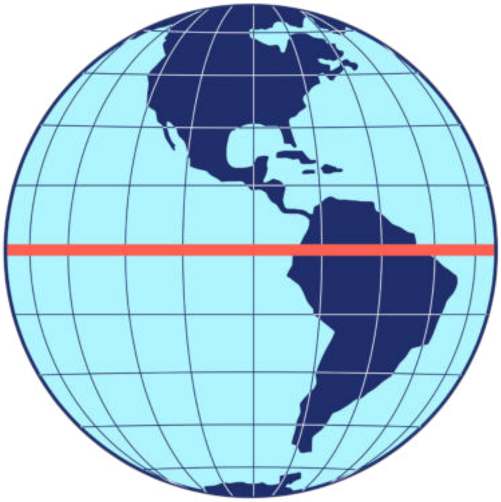

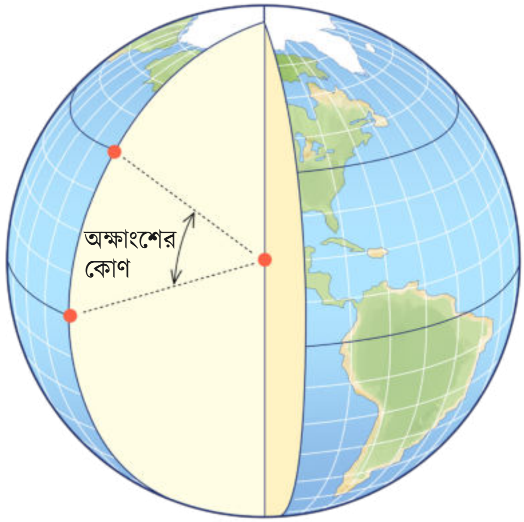

(ক) অক্ষাংশ পরিমাপ করা হয় বিষুব রেখার সাপেক্ষে। বিষুব রেখা হচ্ছে একটি কাল্পনিক রেখা যা পৃথিবীর মাঝামাঝি বরাবর পূর্ব পশ্চিমে ঘিরে রয়েছে। (খ) অক্ষাংশের কোণ পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে একই দ্রাঘিমা রেখার উপর বিষুব রেখার ছেদবিন্দু এবং সেই অক্ষাংশের জন্য নির্ধারিত অক্ষ রেখার ছেদবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর যোগ করলে যে কোণ পাওয়া যায় সেটিই হচ্ছে অক্ষাংশের কোণ।

11.2 অক্ষাংশ (Latitude)

পৃথিবীর কোনো স্থান বিষুব রেখা থেকে কতটা উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত তা অক্ষাংশ দ্বারা বোঝা যায়—এই তথ্যটি বোঝার জন্য বিষুব রেখা কী তা ভালো করে জানা প্রয়োজন। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে যে রেখা পৃথিবীকে ঠিক মাঝ বরাবর ঘিরে রয়েছে বলে কল্পনা করা হয় তাকে বিষুব রেখা বা সমাক্ষরেখা বলা হয়। বিষুব রেখা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। অক্ষাংশ নির্ধারণের জন্য বিষুব রেখাকে প্রসঙ্গ রেখা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিষুব রেখা থেকেই যেহেতু অক্ষাংশের কোণ মাপা হয় তাই তার নিজের অক্ষাংশ হচ্ছে শূন্য ডিগ্রী (0°)। অক্ষাংশ উত্তর ও দক্ষিণে সর্বোচ্চ 90° পর্যন্ত হতে পারে। (লেখা হয় যথাক্রমে 90° উত্তর বা উত্তর মেরু এবং 90° দক্ষিণ বা দক্ষিণ মেরু) তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে প্রতিটি অক্ষাংশের অক্ষ রেখাগুলো একে অপরের সঙ্গে সমান্তরাল, সেগুলো পূর্ণবৃত্ত এবং এই বৃত্তগুলো যতই বিষুব রেখা থেকে মেরুর দিকে আসে তারা ছোট হতে হতে একেকটা বিন্দুতে পরিণত হয়। ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু মূলত দুটি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়।

অক্ষাংশ কোণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রশ্ন করতে পারে কোন দুটি রেখা এই কোণ উৎপন্ন করে এবং সেই কোণটি কোথায় উৎপন্ন হয়। আমরা যে স্থানের অক্ষাংশ বের করতে চাই সেই স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর একটি রেখা (ছবি) কল্পনা করে নাও এবং কেন্দ্র থেকে বিষুব রেখা বরাবর আরেকটি রেখা কল্পনা করে নাও। দুটি রেখাই উত্তর দক্ষিণে একই তলে থাকতে

হবে। (আমরা একটু পরেই দেখব, উত্তর দক্ষিণে একই তলে থাকার অর্থ একই দ্রাঘিমা রেখায় থাকা) এই দুটি রেখা যে কোণ তৈরি করে সেটাই হচ্ছে অক্ষাংশ।

অক্ষাংশে 0° থেকে 90° পর্যন্ত অনেকগুলো সমান্তরাল অক্ষ রেখা থাকলেও কতকগুলো অক্ষ রেখা বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। (অক্ষ রেখাগুলো পৃথিবী বা গ্লোবে সমান্তরাল বৃত্ত হলেও মানচিত্রে সেগুলো সমান্তরাল রেখা হিসেবে দেখানো হয়) গুরুত্বপূর্ণ অক্ষ রেখাগুলো হচ্ছে :

11.2.1 বিষুব রেখা (Equator)

এটি হচ্ছে 0° অক্ষাংশ। বিষুব রেখা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর এবং এই রেখাটি পৃথিবীকে দুটি গোলার্ধে বিভক্ত করে যেগুলোকে যথাক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধ বলে। এখানে লক্ষণীয় যে 21 শে মার্চ এবং 23 শে সেপ্টেম্বর দুপুর 12.00টায় সূর্যের আলো এই রেখা বরাবর সকল স্থানে লম্বভাবে পড়ে। এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সমান হয়।

11.2.2 কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer)

এটি হচ্ছে বিষুবরেখার সাপেক্ষে 23·5° উত্তর অক্ষাংশ রেখা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে এই রেখা অতিক্রম করেছে। প্রতি বছর 21শে জুন দুপুর 12.00 টায় এই রেখার অন্তর্গত সকল স্থানে সূর্যের আলো লম্বভাবে পড়ে। এই তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য বা স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হয়।

11.2.3 মকরক্রান্তি রেখা (Tropic of Capricorn)

এটি হচ্ছে বিষুব রেখার সাপেক্ষে 23·5° দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখা। প্রতি বছর 22শে ডিসেম্বর সূর্যের আলো এই রেখার অন্তর্গত স্থানে দুপুর 12.00টায় লম্বভাবে পড়ে। এই তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য বা স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি হয় এবং উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হয়।

11.2.4 মেরু রেখা (Polar Circle)

উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 66.5° দুটি অক্ষাংশকে যথাক্রমে উত্তর মেরুরেখা (Arctic Circle) এবং দক্ষিণ মেরুরেখা (Antarctic Circle) বলে। কর্কটক্রান্তির উত্তরে এবং মকরক্রান্তির দক্ষিণে সূর্যের আলো কখনোই লম্বভাবে পড়ে না। এখানে গ্রীষ্মকালে অতিদীর্ঘ দিন এবং শীতকালে অতিদীর্ঘ রাত হয়। সত্যি কথা বলতে কী, দিন দীর্ঘ হতে হতে প্রতি বছর 21শে জুন উত্তর মেরুরেখা ঘেরা উত্তরের এলাকায় 24 ঘণ্টাই সূর্যের আলো থাকে, অর্থাৎ 24 ঘণ্টা দিন থাকে। একইভাবে 22শে ডিসেম্বর উক্ত স্থানে 24 ঘণ্টা রাত থাকে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ মেরুরেখা এলাকায় ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটে।

11.3 অক্ষাংশের তাৎপর্য ও ব্যবহার

কোনো স্থানের ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু জানা কিংবা বোঝার জন্য সেই স্থানের অক্ষাংশ জানা জরুরি। আমরা জানি যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ তার কক্ষপথের সঙ্গে খাড়াভাবে (90°তে) না থেকে 23.5° কোণে হেলানো অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষাংশে সূর্য থেকে আসা তাপ ও আলোকশক্তি (Insolation) ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়। সূর্যের এই বিকিরণের তীব্রতা বিভিন্ন স্থানে ও বছরের সময়ে ভিন্ন হয় এবং এ কারণেই আমরা বিভিন্ন ঋতু উপভোগ করি।

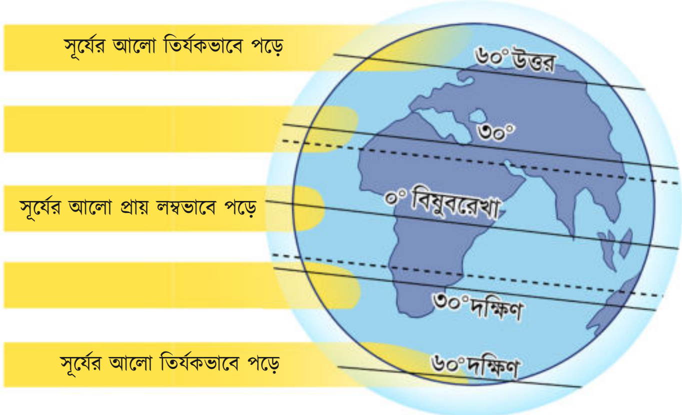

বিষুব রেখা বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে সূর্যের আলো প্রায় লম্বভাবে পরে। ফলে তা তুলনামূলকভাবে কম দূরত্ব অতিক্রম করে এবং কম ছড়ানোর ফলে ভূপৃষ্ঠ বেশি উত্তপ্ত হয়। অপরদিকে মেরু এলাকার কাছাকাছি সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। ফলে তা বায়ুমণ্ডলের মাঝে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ভূপৃষ্ঠে বেশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে সূর্যরশ্মির তীব্রতা বা তেজ কমে যায়। ফলে সেই সকল অঞ্চল শীতল হয়ে থাকে।

যেহেতু কোনো স্থানের অক্ষাংশের উপর সেখানে সূর্যালোক কতটা আসবে তার পরিমাণ নির্ভর করে সেহেতু সেসব স্থানের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণও এই অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয় বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্র স্রোতের পরিবর্তনও অক্ষাংশ দিয়ে প্রভাবিত হয়। এমনকি কোনো জায়গার ভূমি কেমন হবে বা এর জীবজগতের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার উপরেও অক্ষাংশের প্রভাব রয়েছে।

11.3.1 অক্ষাংশের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ

অক্ষাংশের ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই সকল অঞ্চলে জলবায়ু, গাছপালা, পশুপাখি এমনকি ভূমিরূপও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে যা অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা। গুরুত্বপূর্ণ অক্ষ রেখার ভিত্তিতে ভাগ করা অঞ্চলগুলো হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এবং মেরু অঞ্চল। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণের কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মাঝখানের অঞ্চলটি হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল। কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে উত্তর মেরুরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল হচ্ছে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। একইভাবে মকরক্রান্তি রেখা থেকে দক্ষিণ মেরুরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। দুইটি মেরু রেখার উত্তরে এবং দক্ষিণের অঞ্চলকে বলে মেরু অঞ্চল। আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি গিয়েছে তাই এই দেশের দক্ষিণাঞ্চল হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল এবং

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

উত্তরাঞ্চল হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।

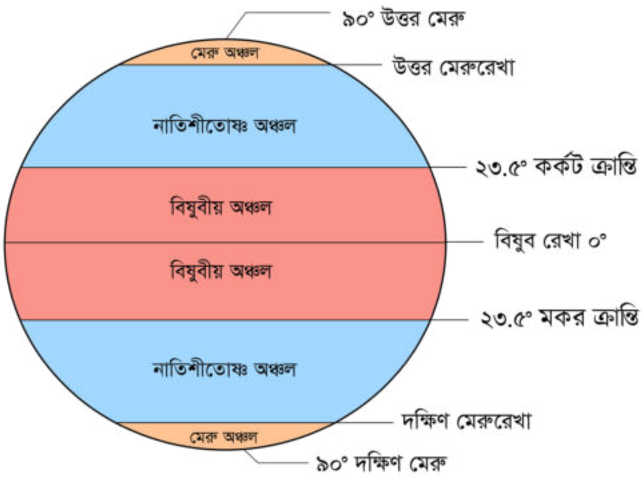

অক্ষাংশের ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চল সমূহ।

প্রশ্ন: তুমি কি কখনো কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করেছ? কর্কটক্রান্তির উপরে থাকলে 21শে জুন দুপুর বারোটায় তোমার কোনো ছায়া পড়বে না, কথাটির অর্থ কী?

প্রশ্ন : তোমার স্কুলটি কি বিষুবীয় অঞ্চলে ,নাকি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে?

প্রশ্ন : তুমি কি জানো যে দৈর্ঘ্যের একক মিটারকে (m) এমনভাবে নির্ধারিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল যেন পৃথিবীপৃষ্ঠে তুমি যদি উত্তরে কিংবা দক্ষিণে ঠিক একশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম কর তাহলে তোমার অক্ষাংশ 1 ডিগ্রি পরিবর্তন হবে? হিসাব করে দেখাও সেটি সত্যি। (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6 হাজার কিলোমিটার)

11.4 দ্রাঘিমাংশ (Longitude)

পৃথিবীর কোনো স্থান একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গরেখা থেকে কতটা পূর্ব বা পশ্চিমে তা দ্রাঘিমাংশ দ্বারা দেখানো হয়। যে রেখা দ্রাঘিমাংশ নির্দেশ করে তাকে দ্রাঘিমা রেখা (Meridian) বলে। যে রেখার সাপেক্ষে পূর্ব

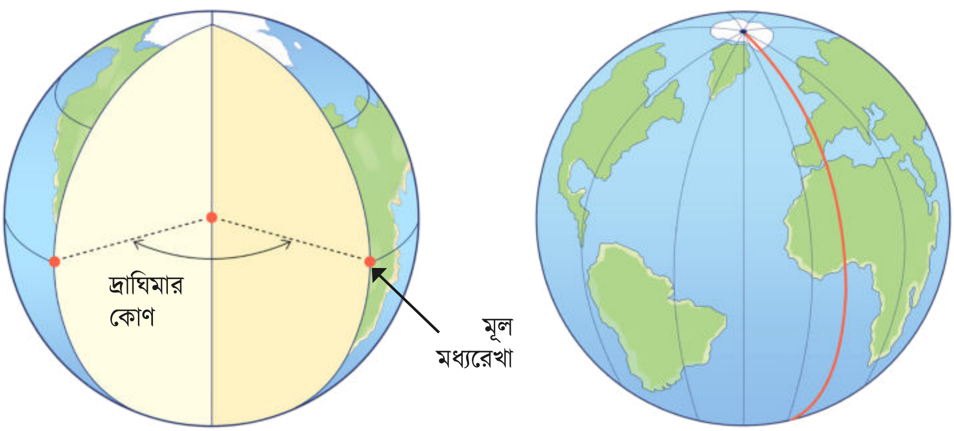

(ক) দ্রাঘিমাংশ মূল মধ্যরেখার সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়। মূল মধ্যরেখা একটি কাল্পনিক দ্রাঘিমারেখা যেটি অর্ধবৃত্ত এবং ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে উত্তর দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (খ) দ্রাঘিমাংশ বা দ্রাঘিমার কোণও পৃথিবীর কেন্দ্রে মাপা হয় হয়। এক্ষেত্রে বিষুবরেখার উপর মূল মধ্যরেখার ছেদবিন্দু এবং সেই দ্রাঘিমা রেখার ছেদবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর যোগ করলে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ পাওয়া যায় সেটিই হচ্ছে দ্রাঘিমাংশ বা দ্রাঘিমার কোণ।

বা পশ্চিমে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হয় তাকে প্রসঙ্গ রেখা বা মূল মধ্যরেখা (Prime meridian) বলে। এটি ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে গিয়েছে। প্রতিটি দ্রাঘিমারেখা একটি অর্ধবৃত্ত এবং সেগুলোর দৈর্ঘ্য সমান। দ্রাঘিমারেখা এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সকল দ্রাঘিমারেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিটি দ্রাঘি মারেখা বিষুবরেখাকে লম্বভাবে অতিক্রম করে। দ্রাঘিমার মান 0° (মূল মধ্যরেখা) থেকে 180° পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিমে বিস্তৃত। তোমরা কি জান মূল 0° মধ্যরেখা এবং পূর্ব 180° দ্রাঘিমা রেখার ঠিক মধ্যবর্তী পূর্ব 90° দ্রাঘিমা রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে? যেহেতু একটি দ্রাঘিমা রেখায় উত্তর কিংবা দক্ষিণের যে কোনো বিন্দুতেই দ্রাঘিমাংশের মান সমান তাই পৃথিবীর কোনো অবস্থানের দ্রাঘিমার মান বের করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে বিষুব রেখায় সেই মানটি বের করা। বিষুব রেখার উপর মূল মধ্যরেখার ছেদবিন্দু এবং একটি দ্রাঘিমা রেখার ছেদবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণটি তৈরি করে সেটিই হচ্ছে সেই দ্রাঘিমার কোণ। কয়েকটি দ্রাঘিমা রেখা বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—মূল মধ্যরেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।

11.৭.1 মূল মধ্যরেখা

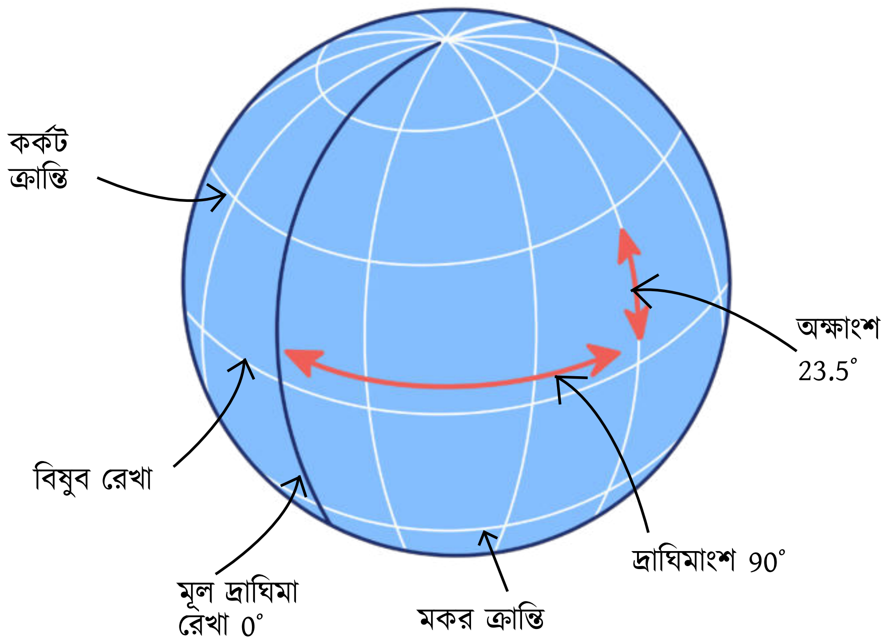

কর্কট ক্রান্তি রেখা এবং 90 ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার ছেদ বিন্দু বাংলাদেশে পড়েছে, সে কারণে বলা যায় বাংলাদেশের অবস্থান অক্ষাংশ 23.5° উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ 90° পশ্চিম।

লন্ডনের কাছাকাছি অবস্থিত গ্রিনিচের (Greenwich) রয়াল অবজারভেটরির উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখার অবস্থান তাকে মূল মধ্যরেখা বলে এবং এর মান 0°। এখানে লক্ষণীয় যে মূল মধ্যরেখার কোনো পূর্ব-পশ্চিম নেই, বরং এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব এবং পশ্চিম দুটি গোলার্ধে বিভক্ত করে।

11.৫.2 আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

আমরা জেনেছি যে প্রতিটি দ্রাঘিমা রেখা এক একটি অর্ধবৃত্ত। সেক্ষেত্রে মূল মধ্যরেখার একেবারে বিপরীত দিকের যে দ্রাঘিমা রেখা আছে তার মান হবে 180°। এক্ষেত্রেও শুধু মান 180° লেখা হয়, এই দ্রাঘিমাংশের কোনো পূর্ব বা পশ্চিম থাকে না। এই দ্রাঘিমা রেখার নাম আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। পৃথিবীতে দিনতারিখ গণনার জন্য এই রেখাটির উদ্ভব। এই রেখার দুই পাশে দুইটি ভিন্ন তারিখ ধরে নেওয়া হয়। বিষয়টা একটু বিচিত্র মনে হলেও খুবই প্রয়োজনীয়। এই রেখাকে মাঝে রেখে কেউ যদি পূর্ব গোলার্ধের দিকে যায় তবে সে পরের তারিখে চলে যাবে। আবার পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধের দিকে গেলে হবে উল্টোটা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই সময়ে বিভিন্ন রকমভাবে সূর্যের আলো পৌঁছায়। কোথাও দিন, কোথাও রাত। তাই কেউ যখন এক দেশে থেকে বলে তার ওখানে এখন বিকেল 4টা আসলে সেটা অন্য গোলার্ধের দিকে যারা আছে তাদের জন্য ঠিক কয়টা তা হিসাব করতেই এই রেখাটি গুরুত্বপূর্ণ।

এই দ্রাঘিমার আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তোমরা সংযুক্ত পৃথিবীর মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছ এই রেখা অর্ধবৃত্ত (গ্লোবের ক্ষেত্রে) বা সরল রেখা (মানচিত্রের ক্ষেত্রে) না হয়ে কিছু কিছু স্থানে আঁকাবাঁকা হয়ে স্থলভাগ এড়িয়ে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে গেছে যেন একই দেশের বা এলাকার দুইদিকে দুইরকম তারিখ না হয়ে যায়।

11.৫.3 ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে দ্রাঘিমা রেখার ব্যবহার

আমরা জানি অক্ষাংশ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কোনো স্থান বা বিন্দু ঠিক কোথায় আছে সেটি জানিয়ে দেয়, কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম বরাবর সেই স্থান বা বিন্দু ঠিক কোথায় আছে কোথায় আছে সেটি দ্রাঘিমাংশ নির্দিষ্ট করে দেয়। যে কোনো স্থানের প্রকৃত অবস্থান জানার জন্য তাই অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ একত্রে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অক্ষ রেখা এবং দ্রাঘিমা রেখা মিলে পৃথিবী পৃষ্ঠে অথবা গ্লোবের (পৃথিবীর ছোট মডেল) উপর ছক কাগজের ন্যায় একটি কাঠামো তৈরি করে যাকে বলা হয় গ্র্যাটিকুল (Graticule)। এই ছকে কোনো স্থানের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ জানা থাকলে ঠিক ছক কাগজের ন্যায় আমরা সেই স্থানের অবস্থান বের করতে পারি। এছাড়া কোনো স্থানের সময় এবং তারিখ নির্ধারণের জন্যও দ্রাঘিমাংশের মান গুরুত্বপূর্ণ।

11.৫.৫ সময় ও তারিখ নির্ণয়

মূল মধ্যরেখা (0° দ্রাঘিমা) যেহেতু গ্রিনিচের উপর দিয়ে গেছে তাই পৃথিবীর যে কোনো স্থানের সময় গ্রিনিচের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে নির্ণয় করা যায়। যে কোনো রেখার চারদিক ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করে যদি আমরা আবার শুরুর বিন্দুতে ফিরে আসি তাহলে আমরা জানি মোট কোণের পরিমাণ হবে 180°+180°= 360°। দ্রাঘিমার ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিমে 180° করে মোট কোণ হয় 360°। একদিনে

যেহেতু মোট 24 ঘণ্টা তাই প্রতি (360 ÷ 24 =) 15° দ্রাঘিমা অতিক্রম করলে ঘড়ির সময়ের 1 ঘণ্টা করে পরিবর্তন হয়। মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বদিকে গেলে ঘড়ির সময় বাড়তে থাকে এবং পশ্চিমে গেলে ঘড়ির সময় কমতে থাকে। মূল মধ্যরেখার পূর্বপাশের এলাকার ঘড়ির সময়কে তাই ধনাত্বক (+) চিহ্ন দিয়ে এবং পশ্চিমে ঋণাত্মক (-) চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। দ্রাঘিমা রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীকে বেশ কয়েকটি সময় জোনে (Time Zone) বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশের দ্রাঘিমাংশ 90° হওয়ার কারণে গ্রিনিচের ঘড়ির সময় থেকে 6 ঘণ্টা এগিয়ে আছে, অর্থাৎ গ্রিনিচে যখন দুপুর 12টা তখন বাংলাদেশে সময় হবে সন্ধ্যা 6টা।

গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার মাঝে পার্থক্য 180°। তাই এই দুই স্থানের মাঝে সময়ের পার্থক্য হবে 12 ঘণ্টা। এখন যদি মূল মধ্যরেখা থেকে একই দিনের একই সময়ে দুইজন মানুষের একজন পূর্বদিকে এবং একজন পশ্চিম দিকে রওয়ানা করে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় পৌঁছায় এবং তা অতিক্রম করে, তাহলে পূর্বদিকে যাত্রাকারীর ঘড়ির সময় 12 ঘণ্টা বেশি হবে আর পশ্চিমদিকে যাত্রাকারীর ক্ষেত্রে সময় 12 ঘণ্টা কম হবে। দুজনের সময়ের পার্থক্য 24 ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার কারণে

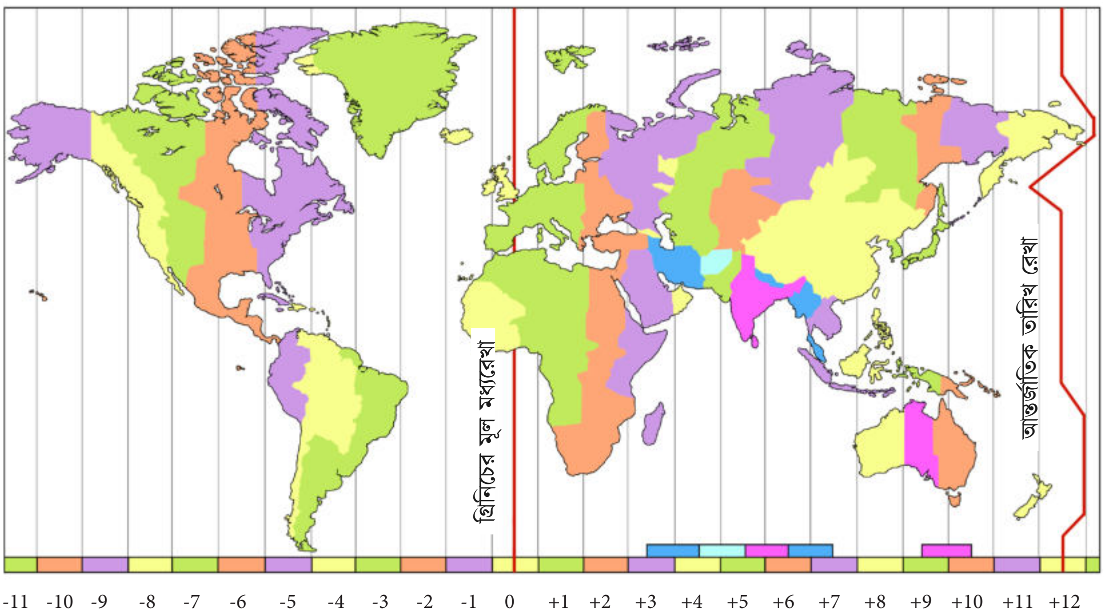

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও বিভিন্ন সময় জোন। বাংলাদেশের সময় জোন GMT+6।

তারিখের হিসাব পার্থক্য হয়ে যাবে। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য কেউ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে পূর্বদিকে এলে তাকে ঘড়িতে 1 দিন পিছিয়ে দিতে হয়। একইভাবে কেউ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে পশ্চিমে গেলে তার ঘড়িতে 1 দিন এগিয়ে দিতে হবে। যেমন—মনে করো এখন তুমি কোনো দ্রুতগতির যানে করে পূর্বদিকে গিয়ে 180° দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করে গেলে, সেক্ষেত্রে আজ যে তারিখ আছে তোমার ঘড়িতে তা একদিন পিছিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ আজ 21শে ফেব্রুয়ারি

হলে তোমার ঘড়ির তারিখ হয়ে যাবে 20শে ফেব্রুয়ারি। ঠিক একইভাবে তুমি যদি পশ্চিম দিকে গিয়ে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম কর তাহলে আজ 21শে ফেব্রুয়ারি হলে তোমার ঘড়ির তারিখ হয়ে যাবে 22শে ফেব্রুয়ারি।

11.5 বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অঞ্চল

আমরা পূর্বে জেনেছি যে অক্ষাংশের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু, জীব এমনকি ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হয়। এখন আমরা দেখব এই ভিন্নতা কি রকম হতে পারে।

11.5.1 মেরু অঞ্চল

পৃথিবীর ভৌগোলিক দুই মেরুর কাছাকাছি চারপাশের এলাকা মেরু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার অক্ষাংশ মেরুর কাছাকাছি হওয়ায় সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে, তাই তাপমাত্রা খুব কম। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রচণ্ড শীতল তাপমাত্রা, পুরু বরফের স্তর এবং অল্পসংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি। এই এলাকা প্রধানত উত্তর মেরু আর্কটিক মহাসাগরে অবস্থিত এবং গ্রিনল্যান্ড,

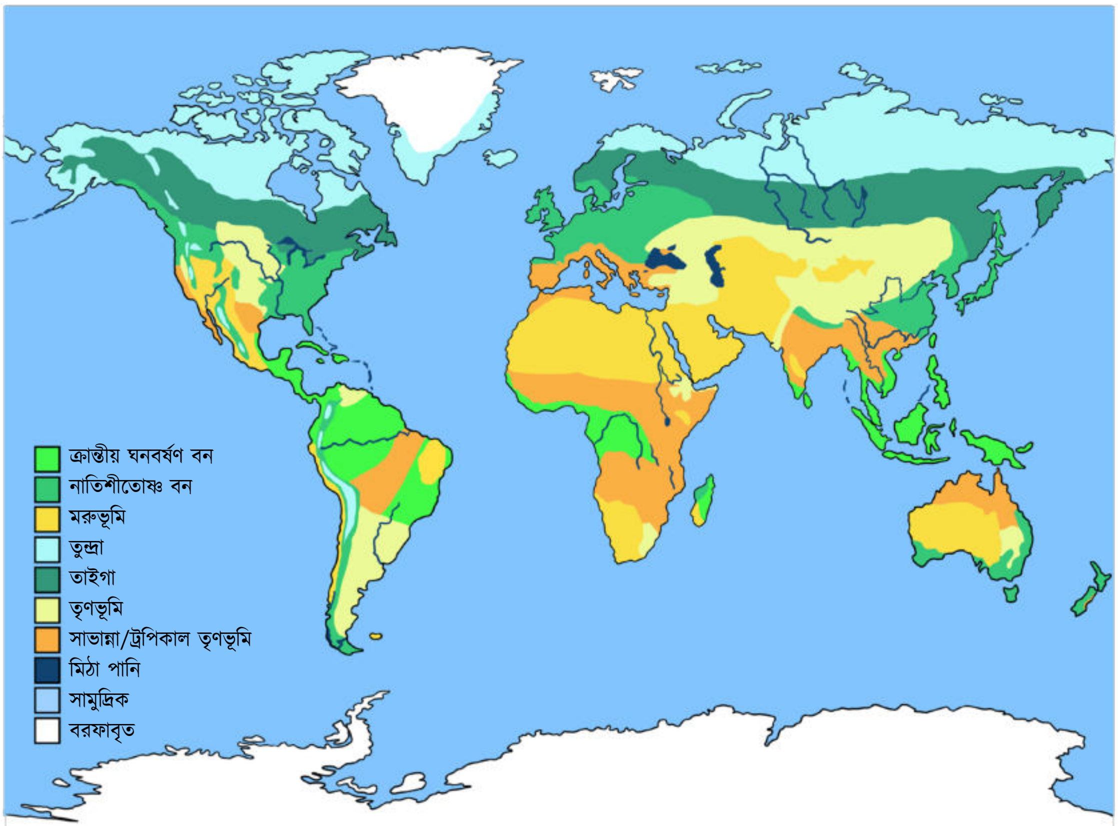

পৃথিবীর বিভিন্ন ধরণের ভৌগোলিক অঞ্চল

কানাডা, রাশিয়া ও আলাস্কার উত্তরাঞ্চল দিয়ে বেষ্টিত। অপরদিকে দক্ষিণ মেরু এন্টার্কটিকা মহাদেশে অবস্থিত। উভয় মেরু অঞ্চল গ্রীষ্মকালে লম্বা সময়ব্যাপী দিনের আলো এবং শীতকালে রাতের অন্ধকারে ঢেকে থাকে। প্রতিকূল অবস্থার কারণে মেরু অঞ্চলের সীমিত উদ্ভিদের মাঝে রয়েছে শ্যাওলা, লাইকেন এবং ঝোপঝাড় (Shrubs)। প্রাণীদের মাঝে রয়েছে মেরু ভালুক, পেঙ্গুইন, আর্কটিক শিয়াল, ওয়ালরাস, সীল এবং কয়েক প্রজাতির তিমি। এখানকার ভূমির অধিকাংশই বরফ দিয়ে ঢাকা এবং ভূমিরূপের পরিবর্তন হিমবাহের বরফ দিয়ে পরিচালিত হয়।

অক্ষাংশের প্রভাবে গঠিত ভৌগোলিক অঞ্চল : (উপরে) মেরু অঞ্চল ও তুন্দ্রা অঞ্চল (নিচে) মরুভূমি ও চির হরিৎ বন।

11.5.2 তুন্দ্রা অঞ্চল

তুন্দ্রা অঞ্চল হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে, বিশেষ করে আর্কটিক এলাকায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রধানত আলাস্কা, কানাডা, রাশিয়া, গ্রিনল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু স্থানে এমন অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে উঁচু পর্বতের চূড়ার কাছাকাছিও এ ধরনের এলাকার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রা, ঠান্ডায় জমে থাকা মাটি এই এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেড়ে ওঠার জন্য সময়টাও বেশ সীমিত তাই এখানে প্রধানত ঠান্ডায় সহনশীল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। বৃষ্টির স্বল্পতার (প্রধানত তুষারপাত) কারণে এই অঞ্চলকে শীতল মরুভূমি হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও এখানে বেশ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের গুল্ম, ঘাস এবং শ্যাওলা। প্রাণীদের মাঝে রয়েছে ক্যারিবু, রেইনডিয়ার, কস্তুরী বলদ, আর্কটিক শিয়াল এবং তুষার পেঁচা এবং পিটারমিগান জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

11.5.3 মরুভূমি

মরুভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতিমাত্রায় শুষ্কতা, এই অঞ্চলে বছরে 250 মিলিমিটারেরও কম বৃষ্টিপাত হয়। এমনও কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে কয়েক বছরের মাঝে কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি। মরুভূমিগুলো প্রধানত উপক্রান্তীয় অঞ্চল অর্থাৎ কর্কটক্রান্তীয় এবং মকরক্রান্তীয় এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। মরুভূমি এলাকায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুষ্ক ও প্রতিকূল জলবায়ু যেখানে দিনে এবং রাতে তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। পানি এবং গাছপালার অভাবে এই অঞ্চল দিনে অত্যন্ত উষ্ণ এবং রাতে অত্যন্ত শীতল। পানির স্বল্পতার কারণে খুব কম সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে বেঁচে থাকতে পারে। উদ্ভিদগুলোর বাইরের আবরণে মোমের মতো আস্তরণ থাকে যা পানি শুকিয়ে যাওয়া রোধ করে এবং এদের লম্বা শিকড় অনেক গভীর থেকে পানি উত্তোলন করতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত প্রতিকূল পরিবেশে বিপাকীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এসব উদ্ভিদ টিকে থাকতে পারে। ক্যাকটাস, সাকুলেন্ট বা রসালো উদ্ভিদ, ক্রেওসোট বুশ, জোশুয়া, মরুভূমি আয়রনউড প্রভৃতি মরুভূমির প্রধান উদ্ভিদ। এখানকার প্রাণীগুলো বিশেষভাবে অভিযোজিত হয়ে মরুভূমিতে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে। যেমন—নিশাচর বৈশিষ্ট্য, গর্ত করে থাকার প্রবণতা, শরীরে পানি জমা রাখা এবং অল্প পানি পান করে বেঁচে থাকার সক্ষমতা ইত্যাদি। মরুভূমির প্রধান প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে উট, র‍্যাটল স্নেক, স্কিংটিলা, কাঁকড়াবিছা, ফেনেক শিয়াল ইত্যাদি।

11.5.৪ চিরহরিৎ বন

চিরহরিৎ বন হচ্ছে ঘন বনাঞ্চল যেগুলো সারা বছর—এমনকি শুষ্ক আবহাওয়াতেও সবুজ থাকে। যে সকল এলাকায় তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত তুলনামূলকভাবে বেশি সেসব অঞ্চলে, বিশেষ করে বিষুবীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে এমন বন দেখতে পাওয়া যায়। এই বনাঞ্চলে গাছপালার ঘনত্ব এত বেশি থাকে যে খুব সামান্য সূর্যালোক বনের মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সাধারণত এই বনের উদ্ভিদের পাতাগুলো সবুজ এবং বড়ো আকারের হয় যেগুলো প্রচুর সূর্যালোক শোষণ করতে পারে। এছাড়া এসব উদ্ভিদের মূল মাটি থেকে পানির সঙ্গে প্রচুর পুষ্টিও (neutrient) শোষণ করতে পারে। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে চিরহরিৎ বনে সবচাইতে বেশি ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি বসবাস করে। ইন্দোনেশিয়ার বনাঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো বনাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন ইত্যাদি হচ্ছে চিরহরিৎ বন। অনেক সবুজ গাছপালা থাকার কারণে এই বনগুলো বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন প্রকার বানর, স্লথ, জাগুয়ার, সাপ, পাখি প্রভৃতি এই বনে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মাঝে রয়েছে ফার্ন, এপিফাইট, লোহিত সিডার, সাইকাড, নীল স্প্রুস ইত্যাদি।

11.5.5 পার্বত্য অঞ্চল

উপরে উল্লেখিত অঞ্চলসমূহের উপর অক্ষাংশের প্রভাব রয়েছে, তবে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত হয় মূলত টেকটোনিক প্লেটের ধাক্কার ফলে সৃষ্ট পর্বতের কারণে। পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়

এবং প্রতিকূল। উচ্চতা এবং ঢালের সাথে এখানে মাটি ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। অত্যধিক উচ্চতা এবং খাড়া ঢাল থাকার কারণে এ অঞ্চলে বিভিন্ন ছোট ছোট জলবায়ু (Microclimate) অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ধরনের বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের সহায়ক। এখানকার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা পাথুরে মাটিতে জন্মাতে পারে, তাপমাত্রার প্রকট তারতম্য সহ্য করতে পারে, এবং উদ্ভিদের দেহে পানি সংরক্ষণ করতে পারে। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে উঁচু ঢাল হয়ে ওঠা সক্ষমতা ঠান্ডায় গরম থাকার জন্য পুরু পশম, ঠান্ডা মাসগুলোতে শীতনিদ্রায় যাবার প্রবণতা ইত্যাদি।

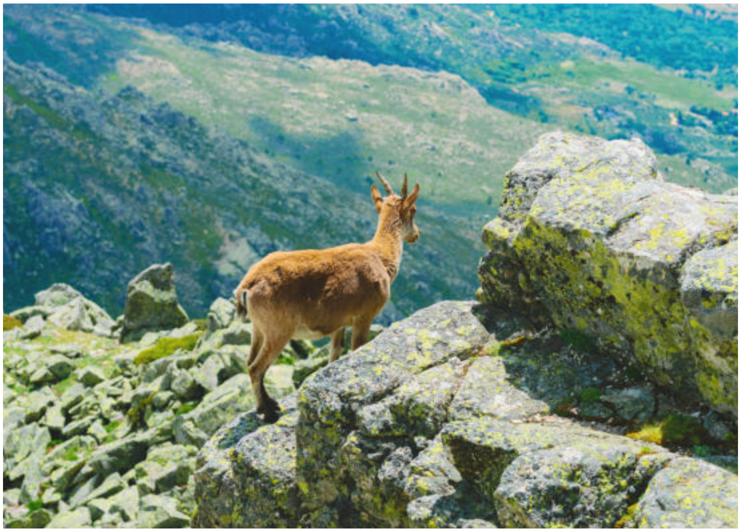

অক্ষাংশের প্রভাবের পরিবর্তে টেকটোনিক প্লেটের ধাক্কায় গঠিত পার্বত্য অঞ্চল

11.6 ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিবেশগত বিষয় ও মানুষের ভূমিকা

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যার বিষয়গুলো (issue) বিভিন্ন রকমের হয় এবং সেখানে এসব সমস্যা তৈরি এবং সমাধান উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মেরু অঞ্চল এবং তুন্দ্রা অঞ্চলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ছে। এসব অঞ্চলে বরফ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এবং মেরুভল্লুক, রেইনডিয়ার প্রভৃতি পশুর আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। এই সকল অঞ্চলে বন নিধন রোধ করে, টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মরুভূমিতে অতিরিক্ত পশুচারণ এবং তেল উত্তোলনের ফলে মাটি ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা এবং সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

চিরহরিৎ বনগুলোতে অতিমাত্রায় বন নিধন জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। বনজ সম্পদ আহরণ কমানো, সংরক্ষণ এবং টেকসই বনব্যবস্থাপনা চর্চার মাধ্যমে মানুষ এই বনগুলো রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পার্বত্য অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন খনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বন নিধন প্রভৃতির কারণে মাটি ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। বনায়ন কর্মসূচি এবং টেকসই পর্যটন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ

অঞ্চলসমূহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

মোটকথা, টেকসই উন্নয়ন অনুশীলন এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ভূমিকা রয়েছে। আমাদের উচিত পরিবেশের উপর মানুষের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব শনাক্ত করে সেগুলো সমাধানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করা।

অধ্যায় ১২

চুম্বক

অধ্যায় ১২ চুম্বক

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ স্থায়ী চুম্বক
- ☑ বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া
- ☑ বৈদ্যুতিক চুম্বক
- ☑ বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় আবেশ
- ☑ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র

আমরা প্রতিদিন নানাভাবে চুম্বক ব্যবহার করি। আমাদের টেলিফোনে কথা বলতে হয়, টেলিফোনের স্পিকারে চুম্বক রয়েছে, সেখানে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে স্পিকারে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। শুধু টেলিফোনের স্পিকার নয় রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এরকম সবকিছুর স্পিকারে চুম্বক থাকে। আমরা যখন গরমের দিনে ফ্যান ব্যবহার করি তখন ফ্যানের মোটর ঘোরানোর জন্য চুম্বক ব্যবহার করতে হয়। শুধু ফ্যানে নয়, এসি, ফ্রিজ গাড়ি এরকম যত যন্ত্রপাতিতে যখনই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কোনো কিছু ঘোরাতে হয় তখনই চুম্বক ব্যবহার করতে হয়। আমরা প্রতিদিন যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি বৈদ্যুতিক জেনারেটরে তৈরি করা হয়, সেখানে বিশাল চুম্বককে তারের কুণ্ডলীর মাঝে প্রবল বেগে ঘোরাতে হয়।

পৃথিবী একটা বিশাল চুম্বক এবং এই চুম্বকটির চৌম্বক ক্ষেত্র সূর্য থেকে প্রবল বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসা চার্জ কণাগুলোকে পৃথিবীতে আঘাত করতে না দিয়ে প্রাণিজগতকে রক্ষা করে যাচ্ছে। অনুমান করা হয় যদি পৃথিবী এই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীকে রক্ষা না করত তাহলে পৃথিবীতে হয়তো প্রাণের উদ্ভবই হতে পারত না। পৃথিবী হতো প্রাণহীন রুক্ষ পাথুরে একটা গ্রহ।

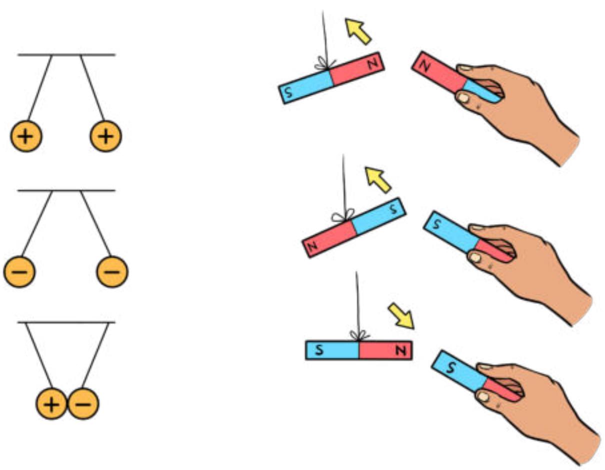

চার্জের বেলায় যেমন একই ধরনের চার্জে বিকর্ষণ এবং বিপরীত চার্জে আকর্ষণ হয়, চুম্বকের বেলাতেও সেরকম সমমেরুতে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ হয়।

12.1 স্থায়ী চুম্বক

আমরা যারা সাধারণভাবে চুম্বক ব্যবহার করি তারা দুই ধরনের চুম্বক দেখে থাকি, এক ধরনের চুম্বক হচ্ছে স্থায়ী চুম্বক অর্থাৎ সেটি সব সময় চুম্বক, সব সময় লোহাকে আকর্ষণ করে। অন্য এক ধরনের চুম্বক হচ্ছে বৈদ্যুতিক চুম্বক এবং নাম দেখে বুঝতে পারছ বিদ্যুৎ প্রবাহ করে এই চুম্বক তৈরি করা হয়। তাই বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে এই ধরনের চুম্বকের চৌম্বকত্ব সরিয়ে ফেলা যায়। চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে আমাদের দৈনিন্দন ব্যবহারের প্রযুক্তিতে বৈদ্যুতিক চুম্বকের ব্যবহার অনেক বেশি।

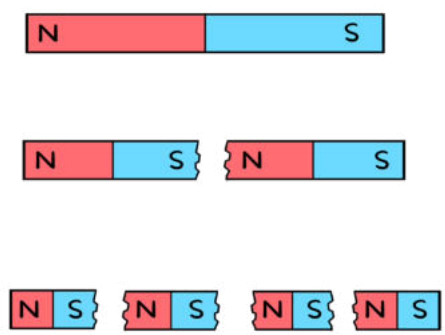

চুবককে ভেঙ্গে কখনোই তার একটা মেরুকে আলাদা করা যায় নয়া।

তোমরা যখন পরমাণুর গঠন নিয়ে পড়েছ তখন তোমরা জেনেছ যে পরমাণু তৈরি হয় ইলেকট্রন এবং প্রোটন দিয়ে, ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ এবং প্রোটনের চার্জ পজিটিভ। শুধু তাই নয় বিপরীত চার্জ একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং একই ধরনের চার্জ একে অপরকে বিকর্ষণ করে। তোমাদের ভেতর যারা দুটি চুম্বক নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেয়েছ নিশ্চিতভাবেই তারা লক্ষ করেছে যে চুম্বকের দুই পাশে দুটি মেরু, একটি উত্তর মেরু অন্যটি দক্ষিণ মেরু। উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু একে অপরকে আকর্ষণ করে আবার উত্তর মেরু অপর উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু অপর দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করে। দেখতেই পাচ্ছ চার্জের সঙ্গে চুম্বকের মেরুর একটি মিল রয়েছে।

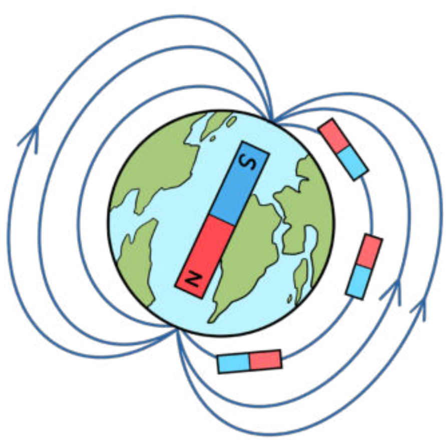

পৃথিবীটাকে একটা বিশাল চুম্বক হিসেবে কল্পনা করা যায়, যেটির উত্তর মেরু হচ্ছে দক্ষিণ দিকে আর দক্ষিণ মেরু হচ্ছে উত্তর দিকে।

চুম্বকের মেরুগুলোকে পূর্ব-পশ্চিম নাম না দিয়ে উত্তর দক্ষিণ নাম দেওয়ার পিছনে একটি কারণ রয়েছে। একটু আগেই তোমাদের বলা হয়েছে পৃথিবী আসলে একটা বিশাল চুম্বক হিসেবে কাজ করে, সেজন্য কোনো চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলেই পৃথিবীর এই বিশাল চুম্বকের আকর্ষণ সেটা উত্তর দক্ষিণ বরাবর ঝুলে থাকে। চুম্বকের যে দিকটি উত্তর দিকে মুখ করে থাকে সেটাকে আমরা বলি উত্তর মেরু এবং যে দিকটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে সেটাকে বলেই দক্ষিণ মেরু। যেহেতু আমরা জানি চুম্বকের আকর্ষণ হয় বিপরীতে মেরুতে তাই

আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর ভেতরকার চুম্বকটির দক্ষিণ মেরু হচ্ছে উত্তর দিকে এবং চুম্বকটির উত্তর মেরুটি হচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

চুম্বকের সঙ্গে চুম্বকের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের সঙ্গে চার্জের সঙ্গে চার্জের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের একটা মিল আছে সত্যি কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারে কিন্তু অনেক বড়ো একটা পার্থক্য রয়েছে। চার্জের বেলায় আমরা শুধু পজিটিভ চার্জ কিংবা নেগেটিভ চার্জের একটি গোলক, দণ্ড বা অন্য কিছু ঝুলিয়ে রাখতে পারি। চুম্বকের বেলায় কিন্তু আমরা কখনোই শুধু উত্তর মেরু কিংবা শুধু দক্ষিণ মেরুর একটি চুম্বক তৈরি করে ঝুলিয়ে দিতে পারব না। তোমরা যদি মনে করো একটা দণ্ড চুম্বকের মাঝখানে ভেঙে দুটি চুম্বক তৈরি করবে যার একটি হবে উত্তর মেরু অন্যটি দক্ষিণ মেরু—তাহলে তোমরা অবাক হয়ে দেখবে আসলে সেটি না ঘটে দুটি পূর্ণ চুম্বক তৈরি হয়েছে, দুটোরই উত্তর ও দক্ষিণ মেরু রয়েছে। সেগুলো যদি আবার ভাঙ্গা হয় তাহলে দেখবে আবার সবকটি ভাঙা অংশই একটি করে পূর্নাঙ্গ চুম্বকে পরিণত হয়েছে যার এক মাথা হচ্ছে উত্তর মেরু আর অন্য মাথা হচ্ছে দক্ষিণ মেরু। এভাবে একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা করে ফেললেও প্রত্যেকটি কণাই হবে একটি ছোট পূর্ণাঙ্গ চুম্বক যার একমাথা হবে উত্তর মেরু অন্য মাথা হবে দক্ষিণ মেরু। চুম্বকের বেলায় কখনোই একটা মেরুকে আলাদা করে পাওয়া সম্ভব নয়।

নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হয়। মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকে প্রকৃতিতে পাওয়া এক ধরনের স্থায়ী চুম্বক দেখে এসেছে যেটাকে লোডস্টোন বলা হয়। এগুলো লোহার এক ধরনের আকরিক। অনুমান করা হয় এই আকরিকের উপর বজ্রপাতের কারণে এগুলো চৌম্বকায়িত হয়েছে—বজ্রপাতের সময় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তোমরা শুনে অবাক হয়ে যাবে যে একটি বজ্রপাতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি বের হয় সেটি দিয়ে ঢাকা শহরের মতো কয়েকটি শহরকে কয়েক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেটা একটু পরেই তোমরা জানতে পারবে।

প্রাচীনকালে মানুষেরা আবিষ্কার করেছিল যে চুম্বককে ঝুলিয়ে রাখা হলে সেটা উত্তর-দক্ষিণে ঝুলে থাকে। এই তথ্যটি ব্যবহার করে চীন দেশের নাবিকেরা প্রথম কম্পাস তৈরি করে দিক নির্ধারণ করা শুরু করেছিল প্রায় হাজার বছর আগে।

তোমরা যারা চুম্বক নাড়াচাড়া করেছ তারা সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ একটি চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। লোহা ছাড়াও চুম্বক নিকেল এবং কোবাল্টকে আকর্ষণ করে কিন্তু তামা, প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামকে আকর্ষণ করে না। চুম্বক যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে তাদের একটা বিশেষত্ব আছে এবং এরকম পদার্থকে চৌম্বকীয় পদার্থ বলে। তোমাদের কাছে যদি একটা মোটামুটি শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করে তুমি ইচ্ছা করলে অন্য একটা লোহা বা ইস্পাতের টুকরাকে একটা চুম্বকে পরিণত

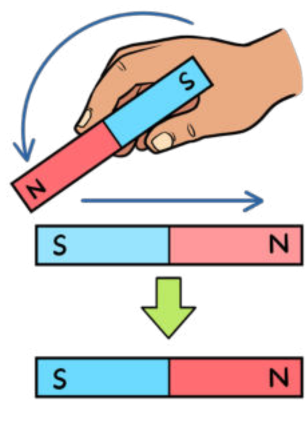

একটা লোহার দণ্ডকে একটা শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক দিয়ে একই দিকে ঘর্ষণ করলে লোহার দণ্ডটি আরেকটি স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হবে।

করতে পারবে। সেটা করার জন্য লোহা বা ইস্পাতের টুকরার এক মাথায় স্থায়ী চুম্বকের এক মাথা স্পর্শ করে টেনে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। তারপর স্থায়ী চুম্বকটি উপরে তুলে আবার আগের জায়গায় স্পর্শ করে টেনে নিতে হবে, অর্থাৎ ঘর্ষণটি সব সময়ই হতে হবে একমুখী। এভাবে কমপক্ষে বিশবার একই দিকে চুম্বকের একই মাথা ব্যবহার করে ঘর্ষণ করতে পারলে মোটামুটি একটা কাজ চালানোর মতো স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে নিতে পারবে।

12.2 বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া

আগের পরিচ্ছেদগুলোতে চুম্বক নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে কিন্তু এখনো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। সেটি হচ্ছে কেন বিশেষ কোনো কোনো পদার্থের চৌম্বক ধর্ম আছে অর্থাৎ সেগুলো চুম্বক দিয়ে আকর্ষিত হয় এবং তাদেরকে দিয়ে চুম্বক তৈরি করা যায়, যেমন—লোহা, কোবাল্ট বা নিকেল। আবার কেন কোনো কোনো পদার্থের চুম্বক ধর্ম নেই, যেমন—কাগজ, কাঠ বা প্লাস্টিক।

আগের পরিচ্ছেদে আসলে কারণটির একটুখানি আভাস দেওয়া হয়েছে—বলা হয়েছে বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে চুম্বকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই অধ্যায়ে সেটাই ব্যাখ্যা করা হবে।

আমাদের মনে হতে পারে বিদ্যুৎ প্রবাহ আর চৌম্বকত্ব বুঝি পুরোপুরি আলাদা দুটি বিষয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে আমরা আলো জ্বালাই, ফ্যান ঘোরাই, চুম্বক দিয়ে লোহাকে আকর্ষণ করি কাজেই দুটিকে আমাদের আলাদা বিষয় মনে হতেই পারে। কিন্তু জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল নামে একজন বিজ্ঞানী 1865 সালে দেখেছিলেন দুটি আসলে একই বিষয় এবং সেই থেকে বিদ্যুৎ আর চুম্বক আর আলাদা বিষয় নয়। সেটা নাম হয়েছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুৎ চৌম্বকত্ব। কারণটি খুব সহজ, বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে সেটি তার পাশে একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে। একটি স্থির চার্জ যেভাবে তার চারপাশে বিদ্যুৎক্ষেত্র তৈরি করে বিদ্যুৎ প্রবাহও ঠিক সেভাবে তার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, অর্থাৎ চৌম্বকত্ব বলে আলাদা কিছু নেই, বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য চৌম্বকত্ব তৈরি হয়। আর বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে চার্জের প্রবাহ—তোমরা সবাই জানো আমাদের পরিচিত বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় সেখানে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয়।

তোমাদের মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণেই চৌম্বকত্ব তৈরি হয় তাহলে স্থায়ী চুম্বক দণ্ডের ভেতর চৌম্বকত্ব কোথা থেকে আসে? তার ভেতরে তো কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে না! তোমরা জেনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে, পরমাণুর গঠনের সময় তোমরা যখন পড়েছ, পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে সেই ঘূর্ণন হচ্ছে এক ধরনের চার্জের প্রবাহ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ—সেখান থেকেই চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। শুধু তাই নয় পরমাণুর প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকেও একটা অতি ক্ষুদ্র চুম্বক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। কাজেই সহজ করে বলা যেতে পারে প্রত্যেকটা পরমাণুর জন্য তার ইলেকট্রনগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ সবগুলো পরমাণু একটি করে অতি ক্ষুদ্র চুম্বক। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকগুলো মিলে যখন একটা শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে আমরা সেটাকে বলি স্থায়ী চুম্বক।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি এসেছে, যদি প্রত্যেকটা পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘূর্ণনই চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে তাহলে তো সব পদার্থেরই চুম্বক হওয়ার কথা কারণ সবকিছুই তো পরমাণু দিয়ে তৈরি। এটি খুবই যৌক্তিক একটা প্রশ্ন। তোমরা যখন পরমাণুর গঠন নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে পড়বে তখন জানতে পারবে পরমাণু গঠনের সময় ইলেকট্রনগুলো দুটো দুটো করে এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে নিজেদের সাজিয়ে নেয় যে প্রায় সব সময় একটি ইলেকট্রনের চৌম্বক ক্ষেত্র অন্যটির বিপরীত দিকে থাকে এবং দুটো কাটাকাটি করে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না। মাত্র অল্প কিছু পদার্থের বেলায় সেটি পুরোপুরি ঘটে না এবং সেগুলোরই শুধু স্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্র দেখা যায়, লোহা, নিকেল বা কোবাল্ট হচ্ছে সেরকম কিছু পদার্থ।

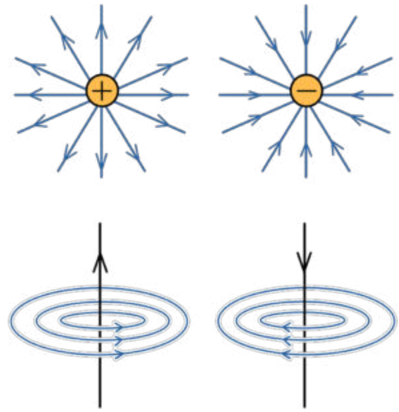

চার্জ যেভাবে তার চারপাশে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে বিদ্যুৎ প্রবাহ থিক সেভাবে তার চারপাশে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে।

বিদ্যুতের প্রবাহের কারণে যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় সেটি পরীক্ষা করেও দেখানো সম্ভব। একটি ড্রিংকিং স্ট্রয়ের টুকরার উপরে প্লাস্টিক আবৃত বৈদ্যুতিক তার পেঁচিয়ে নাও। শুধু এক পাক তারে চৌম্বক ক্ষেত্র বেশি হয় না বলে বেশ কয়েকবার পেঁচিয়ে নিতে হয়। এবারে একটা কম্পাসের কাছে প্যাঁচানো তারটি রাখ, স্বাভাবিকভাবে কম্পাসের কাটাটি শুরুতে উত্তর দিকে মুখ করে থাকবে। এবারে কুন্ডলীর তারের দুই মাথায় যদি একটি ব্যাটারির দুইমাথা স্পর্শ করা হয় তাহলে দেখবে কম্পাসটি সঙ্গে সঙ্গে কুন্ডলি দিকে ঘুরে যাবে। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং সেই চৌম্বক ক্ষেত্রটি কম্পাসের কাটাটিকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। যদি ব্যাটারিটি ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকে পাল্টে দেওয়া যায় তাহলে দেখবে কম্পাসটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাবে! কোন দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে কোনদিকে চুম্বক ক্ষেত্রের দিক ঠিক হবে সেটি ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা সহজ! আঙুলের ডগার দিকে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় তাহলে বুড়ো আঙুলের দিকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

ডান হাতের সূত্র ব্যবহার করে কোন দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে কোন দিকে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে সেটি বের করা যায়।

একটি তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যায়—অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলেই চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারি ,আবার ইচ্ছা করলে সেটা অদৃশ্য করে দিতে পারি। শুধু তা-ই নয়, বিদ্যুতের প্রবাহ বাড়িয়ে-কমিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রও বাড়াতে বা কমাতে পারি। তবে শুধু তারের কুণ্ডলী দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র খুব

বেশি শক্তিশালী করা যায় না বলে এরকম বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরি করতে হলে সব সময় কুণ্ডলীর ভেতরে একটা লোহা জাতীয় চৌম্বকীয় পদার্থ ঢুকিয়ে দিতে হয়। একটা সাধারণ লোহার দণ্ড চুম্বক নয়, কারণ তার ভেতরে যে ছোটোছোটোচুম্বকের কণা আছে সেগুলো সাধারণত এলোমেলোভাবে থাকে কাজেই কোনো সম্মিলিত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় না। যদি এই লোহার দণ্ডটি ঘিরে একটা বৈদ্যুতিক তার পেঁচিয়ে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয় তখন বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে এলোমেলো চুম্বক কণাগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র বরাবর নিজেদের সাজিয়ে নেয়। তখন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় তার সাথে সাথে লোহার দন্ডটির ভেতরকার চৌম্বক ক্ষেত্র যুক্ত হয়ে অনেক শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়।

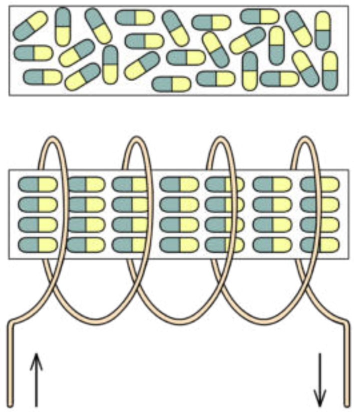

সাধারণ লোহার টুকরায় ছোট ছোট চুম্বকের কণাগুলো এলোমেলো ভাবে থাকে। তাকে ঘিরে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হলে এলোমেলো কণাগুলো সারিবদ্ধ হয়ে অনেক শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

12.3 বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় আবেশ

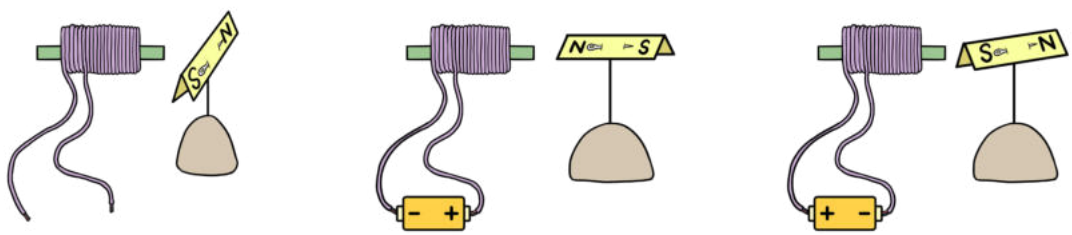

একটি ছোট কাগজকে ভাঁজ করে তার দুই পাশে দুটি চুম্বকায়ীত সুঁচ গেঁথে কম্পাস তৈরি করা যায়। প্লাস্টিক-আবৃত তারের কুণ্ডলির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে সেখানে যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে সেটি কম্পাসকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পালটে দিলে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকও পালটে যাবে।

আমাদের চারপাশে যে অসংখ্য যন্ত্রপাতি আছে তাদের কোনো কিছুকে ঘোরানোর জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা হয় এবং সব মোটরেই চুম্বক থাকতে হয়। কাজেই সেখান থেকে তোমাদের ধারণা হতে পারে যে চুম্বকের সত্যিকারের ব্যবহার বুঝি রয়েছে বৈদ্যুতিক মোটরের ভেতর। কিন্তু আসলে মোটরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কোনো অর্থে মোটর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয় বৈদ্যুতিক জেনারেটরে,

এখানে চুম্বক ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। বিজ্ঞানী ওয়রস্টেড প্রথমে দেখিয়েছিলেন যে একটা তারের কুণ্ডলীর মাঝে যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করানো যায় তাহলে সেই তারের কুণ্ডলীর ভেতর বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি হয়।

যদি একটা বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলীর দুই প্রান্তে একটি এমিটার লাগানো হয় (যেটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ মাপতে পারে) তাহলে আমরা দেখব যদি আমরা একটা চুম্বক বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলীটির ভেতর প্রবেশ করাই তাহলে এমিটারের কাঁটা একদিকে নড়ে উঠে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখাবে। আবার যখনই চুম্বকটি বের করা হবে তখন এমিটারের কাঁটা অন্য দিক দিয়ে নড়ে উঠে উল্টোদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখাবে। চুম্বকটি যদি নাড়ানো না হয় তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না বলে তখন কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে না। যদি চুম্বকটির মেরু পরিবর্তন করে আমরা আবার এই পরীক্ষাটি করি তাহলে আমরা বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখতে পাব।

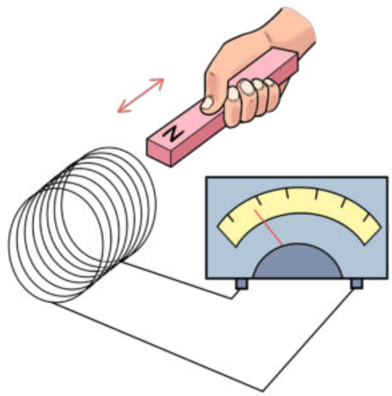

তারের কুণ্ডুলির ভেতর চুম্বক নাড়া চাড়া করে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়।

চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে তারের কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করাকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ বলে। এই আবেশ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক জেনারেটরে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়।

ভাবনার খোরাক : দণ্ড চুম্বকটি বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলীর ভেতরে দ্রুত কিংবা ধীরে আনা-নেয়া করা হলে আমরা এমিটারে কী পরিবর্তন দেখব?

12.৭ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র

তোমরা আগের শ্রেণিতে পৃথিবীর গঠন পড়ার সময় জেনেছ যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনকে মূল তিন ভাগে ভাগ করা যায়, একেবারে বাইরের ভূত্বক, কেন্দ্রের মজ্জা বা কোর এবং তার মাঝখানে সুবিস্তৃত তরল ম্যান্টেল। পৃথিবী গঠনের সময় তার মাধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণের কারণে তুলনামূলকভাবে ভারী ধাতব মৌলগুলো—অর্থাৎ লোহা, নিকেল ইত্যাদি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে জমা হয়েছিল। কেন্দ্রের মজ্জাটিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, কেন্দ্রের ভেতরের দিকের কঠিন অন্তঃস্থ মজ্জা এবং বাইরের দিকে তরল বহিঃস্থ মজ্জা। এই তরল বহিঃস্থ মজ্জা তার তাপ পরিবহন করার জন্য পৃথিবীর ভেতরে পরিচলন (convection) পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয়। যেহেতু এই পরিবহন হয় মূলত তরল ধাতব পদার্থের, এবং ধাতব পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে সেগুলো চার্জড অবস্থায় থাকে তাই এর পরিবহন এক ধরনের বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। আমরা এর মাঝে জেনে গেছি যে বিদ্যুৎ প্রবাহ

চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে তাই ধাতব মৌল দিয়ে তৈরি এই বিদ্যুৎ প্রবাহ পৃথিবীর ভেতরে এক ধরনের চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এটাকেই আমরা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে দেখি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেক জটিল গঠনের কারণে বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াটির অনেক খুঁটিনাটি এখনো নিখুঁতভাবে বের করতে পারেননি এবং সে জন্য তারা নানভাবে গবেষণা করে যাচ্ছেন। যেহেতু পরিচলন পদ্ধতিতে তরলের আবর্তন খুব সুনির্দিষ্ট নয়, তাই মাঝে মাঝেই এর কম বেশি পরিবর্তন হয়, সেজন্য বিদ্যুৎ প্রবাহেরও পরিবর্তন বা স্থানান্তর হয়। সেজন্য পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটিও স্থান পরিবর্তন করে। চুম্বকের এই মেরুগুলো পৃথিবীর প্রকৃত ভৌগলিক উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত নয়। এই মুহূর্তে এটি আলাস্কার কাছাকাছি এবং প্রতি বছর প্রায় 6 কিলোমিটার হিসেবে সাইবেরিয়ার দিকে সরে যাচ্ছে।

পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্রটি যে শুধু ভৌগলিক মেরুতে সুনির্দিষ্ট না থেকে আশপাশে স্থান পরিবর্তন করে তা নয়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছরে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে পৃথিবী সৃষ্টির পর এখন পর্যন্ত শতাধিক বার পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র তার দিক পরিবর্তন করেছে!

পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে থাকে। এই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ মেরু থেকে শুরু হয়ে সারা পৃথিবীকে ঘিরে থাকে এবং পৃথিবীর উপরে হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। চুম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি এই অঞ্চলকে ম্যাগনোস্ফিয়ার বলে থাকে। সূর্য থেকে আমরা যে আলো এবং তাপ পেয়ে থাকি তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকর অতিবেগুণী রশ্মি এবং কখনো কখনো আয়নিত চার্জ এসে উপস্থিত হয়। বাতাসের উপরে ওজোন স্তর আমাদের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করে এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি ম্যাগনোস্ফিয়ার আমাদেরকে এই আয়োনিত চার্জ থেকে রক্ষা করে। সূর্য থেকে নির্গত চার্জড কণার চাপের কারণে ম্যাগনেস্ফিয়ারের গঠনটি একটু বিচিত্র। পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তার উচ্চতা কমে যায়, আবার উল্টোদিকে ম্যাগনোস্ফিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সূর্য থেকে যে চার্জ কণাগুলো প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলো এই চৌম্বক ক্ষেত্র আঘাত করে দিক পরিবর্তন করে সরে যায়। মাঝে মাঝে কিছু কণা চৌম্বক ক্ষেত্রে আটকে পড়ে ঘুরতে থাকে এবং সেগুলো বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি এলে ঘর্ষণের কারণে উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে। পৃথিবীর উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি চৌম্বক ক্ষেত্র সবচেয়ে শক্তিশালী বলে এ ধরনের আলোর বিকিরণ মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি হয়ে

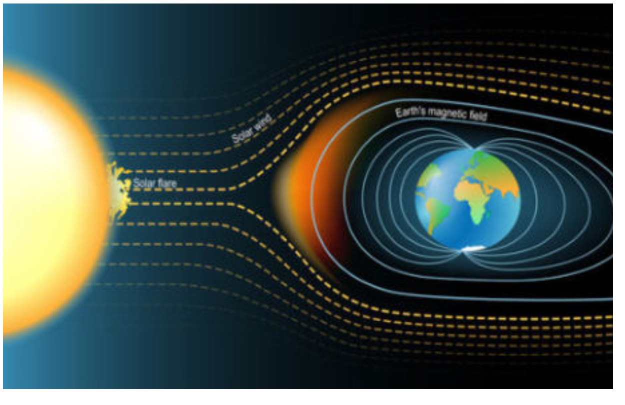

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি ম্যাগ্নেটস্ফিয়ার আমাদের সুর্য থেকে ছুটে আসা আয়োনিত চার্জড কণা থেকে রক্ষা করে।

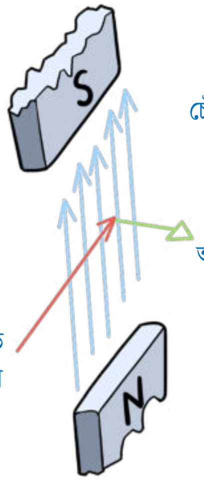

ধাবমান চার্জড কণা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে একটি বল অনুভব করে।

থাকে, এগুলোকে মেরুপ্রভা (Aurora) বলা হয়।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সূর্য থেকে আগত চার্জ কণাগুলো কেন চৌম্বক ক্ষেত্র ভেদ করে যেতে পারে না? এর পেছনের কারণটি বুঝতে হলে তোমাদের চৌম্বক ক্ষেত্রের আরেকটি ধর্ম জানতে হবে। সেটি হচ্ছে একটি চার্জ কণা যদি সরাসরি চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে যায় তাহলে সেটি কোনো বল অনুভব করে না, কিন্তু যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে লম্ব ভাবে যায় তাহলে সেটি পাশের দিকে লম্বভাবে একটি বল অনুভব করে। এই বলটি চার্জকে সরাসরি সামনে যেতে না দিয়ে তাকে পাশে সরিয়ে দেয়। সেজন্য সূর্য থেকে আসা চার্জ কণাগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র ভেদ করতে পারে না, পাশে সরে যায়। যদি চৌম্বক ক্ষেত্র যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তাহলে পাশের দিকে ঠেলে দেওয়া বলটিও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, এবং চার্জ কণাগুলোকে প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের চারপাশে ঘোরাতে থাকে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করার জন্য যে এক্সেলেটর তৈরি করেন সেখানে ইলেকট্রন, প্রোটন বা চার্জড আয়নকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে তার টার্গেটকে আঘাত করেন। সেই চার্জ কণাগুলোর গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য এভাবে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়।

কবুতর কিংবা পাখিদের চুম্বক ক্ষেত্র অনুভব করার ক্ষমতা আছে বলে অনুমান করা হয়। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে এই পাখিগুলো সঠিক দিকে উড়ে যেতে পারে।

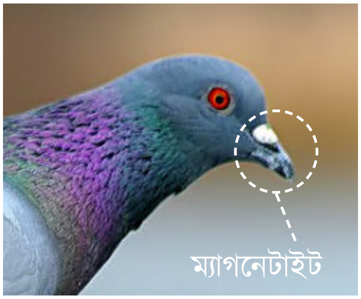

কবুতরের ঠোঁটে চৌম্বক ক্ষেত্র অনুভবের বিশেষ ব্যবস্থা আছে বলে অনুমান করা হয়।

অধ্যায় ১৩

মানবদেহের অঙ্গ ও তন্ত্র

অধ্যায় ১৩ মানবদেহের অঙ্গ ও তন্ত্র

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ ত্বকতন্ত্র
- ☑ শ্বসনতন্ত্র
- ☑ রেচনতন্ত্র

এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ বলে। দেহের অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বলে। অবস্থানভেদে মানবদেহে দুধরনের অঙ্গ আছে। চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা, এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক অঙ্গ। পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় এগুলো হচ্ছে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। শরীরের বাইরের অঙ্গগুলো নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে বহিঃ অঙ্গসংস্থান আর ভিতরের অঙ্গগুলো নিয়ে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে অন্তঃ অঙ্গসংস্থান বলে।

তোমরা জানো পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের মানবদেহের এরকম দশটি তন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল। ইতোমধ্যে আগের শ্রেণিতে তোমাদের বেশ কয়েকটি তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে তোমাদের ত্বকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র এবং রেচনতন্ত্রের কথা বলা হবে।

13.1 ত্বকতন্ত্র (Integumentary system)

আমাদের শরীরের একেবারে বাইরের আবরণটি হচ্ছে ত্বক। এই ত্বক আমাদের শরীরকে রোদ-তাপ, জীবাণুর আক্রমণ কিংবা আঘাত ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। এটি শরীরের ভেতরকার জলীয় বাষ্পকে শরীরের ভেতরে সংরক্ষণ করে এবং আমাদের শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ত্বক আমাদের স্পর্শের অনুভূতি দেয় এবং আমরা উষ্ণ কিংবা শীতল তাপমাত্রার অনুভূতিও এই ত্বকের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

আমাদের শরীরের বাইরের আবরণ রয়েছে ত্বক, নখ, চুল, গ্রন্থি, ত্বকের ভেতরকার স্নায়ু এবং রক্তনালি; এবং এইসব মিলিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের ত্বকতন্ত্র। মানবদেহের সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র হচ্ছে এই ত্বকতন্ত্র এবং নিচে এই তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গাণুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

13.1.1 ত্বক (skin)

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহ-ত্বকের ওজন প্রায় তিন কেজির কাছাকাছি। এটি প্রায় 2 মিলিমিটার পুরু; প্রয়োজনে কোথাও কম পুরু (যেমন চোখের পাতা) এবং কোথাও বেশ পুরু (যেমন—পায়ের তলা)।

মানুষের ত্বক বা চামড়া তিন স্তরে বিভক্ত :

ক) এপিডার্মিস : এটি একেবারে উপরের স্তর। ত্বকের এই স্তরটিকে আমরা দেখতে পাই এবং স্পর্শ করতে পারি। এটি আমাদের গায়ের রং নির্ধারণ করে এবং শরীরের পানি প্রতিরোধক একটি আবরণ হিসেবে কাজ করে।

খ) ডার্মিস : এটি এপিডার্মিসের পরবর্তী স্তর। এই স্তরটি সবচেয়ে পুরু এবং এর মাঝে লোমের গোড়া, ঘাম ও তেলগ্রন্থি অবস্থিত।

গ) হাইপোডার্মিস : এটি হচ্ছে ত্বকের সবচেয়ে নিচের স্তর। এটি মূলত চর্বি দিয়ে গঠিত এবং এই স্তর আমাদের তাপমাত্রার তারতম্য থেকে রক্ষা করে।

13.1.2 নখ

নখ আমাদের হাত ও পায়ের আঙুলকে সুরক্ষা দেয়। এটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

ক) নেল প্লেট : নখের শক্ত অংশটুকু যেটা আমরা দেখতে পাই তাকে নেল প্লেট বলে।

খ) নেল বেড : নখের নিচে চামড়ার আবরণটি হচ্ছে নেল বেড।

গ) কিউটিকল : নখের গোড়ার পাতলা চামড়াটিকে কিউটিকল বলা হয়।

ঘ) ম্যাট্রিক্স : নখের গোড়া যেটি নখের বৃদ্ধি ঘটায় সেটি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স।

ঙ) লুনুলা : নখের সাদা অগ্রভাগকে লুনুলা বলা হয়।

13.1.3 চুল

চুল আমাদের মাথার তাপমাত্রা সংরক্ষণে সহায়তা করে। চোখের ভুরু এবং পাতা চোখকে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে। চুল কেরাটিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এটি তিন ভাগে বিভক্ত :

ক) হেয়ার শ্যাফট : চুলের এই অংশটুকু আমরা দেখতে পাই।

খ) হেয়ার ফলিকন : এটি হচ্ছে ত্বকে ক্ষুদ্র টিউবের মতো একটি গঠন, যেখানে চুলটি থাকে।

গ) হেয়ার বাল্ব: চামড়ার নিচে চুলের যে অংশ চুলকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে তাকে হেয়ার বাল্ব বলে।

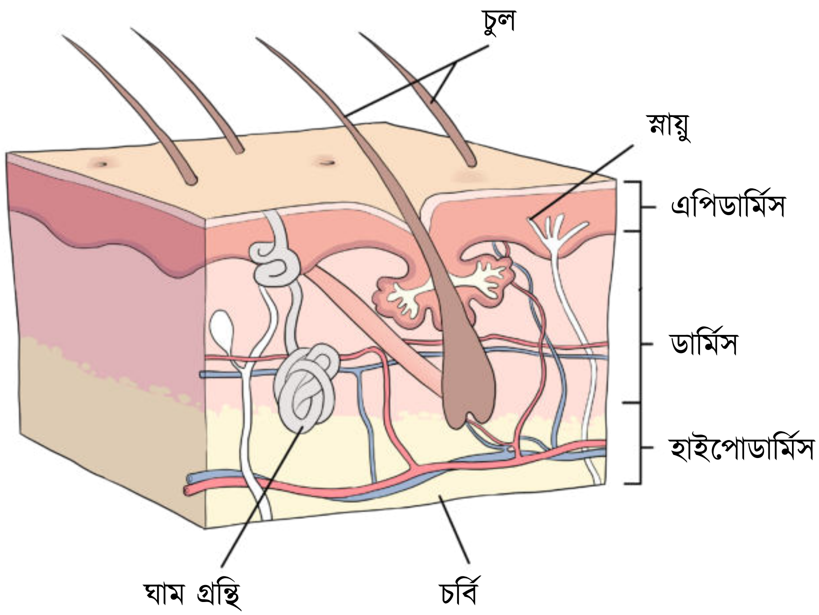

ত্বকের তিনটি স্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো

13.1.৭ গ্রন্থি

ত্বকের সর্বত্র নানারকম গ্রন্থি রয়েছে যেগুলো থেকে জলীয়, তৈলাক্ত কিংবা লবণাক্ত দ্রব্য চামড়ার ভেতর থেকে চামড়ার ওপর নির্গত হয়। ত্বকতন্ত্র নিচের গ্রন্থিগুলো দিয়ে গঠিত :

ক) সুডোরিফেরাস গ্রন্থি : এগুলো আমাদের শরীর থেকে ঘাম নির্গত করে।

খ) সেরাকিউস গ্রন্থি : এগুলো শরীর থেকে তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত করে।

গ) সেরামিউনাস গ্রন্থি : এগুলো আমাদের কানে ইয়ার ওয়াক্স নির্গত করে।

ঘ) ম্যামারি গ্রন্থি : এগুলো মানুষের বুকে থাকে এবং মায়ের বুকের দুধ এই গ্রন্থি থেকে নির্গত হয়।

13.1.5 ত্বকতন্ত্রের কাজ

ত্বক আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তন্ত্র। ত্বককে অনেক সময় বাইরের বৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে শরীরের প্রথম প্রতিরোধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ত্বকতন্ত্র আমাদের জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, আঘাত কিংবা ক্ষতস্থানের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে এবং আঘাত নিরাময় করে। এটি সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকেও শরীরকে রক্ষা করে।

আমরা ত্বকের মাধ্যমে চাপ তাপ ইত্যাদি অনুভূতি অনুভব করি এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নিয়ে শরীরকে নিরাপদ রাখতে পারি। ত্বক ঘামের ভেতর দিয়ে শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশন করে এবং একই সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে শীতল রাখে। আমাদের ত্বক চর্বি, পানি, গ্লুকোজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে এবং ভিটামিন ডি প্রস্তুত করে যা আমাদের শরীরের হাড়ের গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শরীর প্রকৃতপক্ষে একটি অত্যন্ত জটিল সিস্টেম এবং এখানে সবকটি তন্ত্র একে অন্যকে সাহায্য করে মানব দেহকে সচল রাখে।

13.2 শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রাণী অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় বাতাসের সঙ্গে আমাদের ফুসফুসে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের সব অঙ্গের সব কোষে পৌঁছায়। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা এই অক্সিজেনের সাহায্যে মানুষের দেহকোষে সঞ্চিত খাদ্য জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে, যে শক্তি আমাদের শরীরের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে থাকে।

মানুষের শ্বসনতন্ত্রকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়।

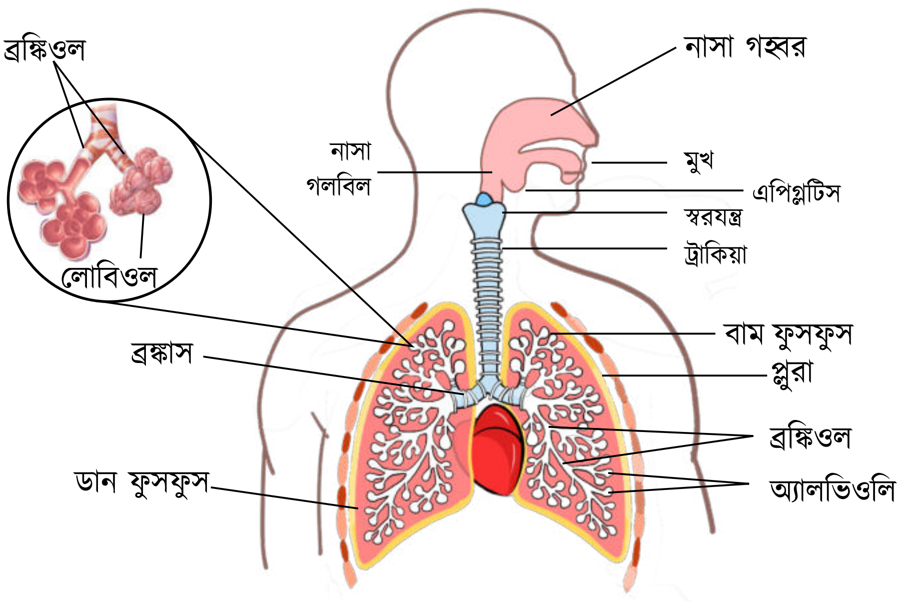

মানুষের শ্বসনতন্ত্র

13.2.1 বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল (Air intake and discharge zone)

সম্মুখ নাসারন্ধ্র (Anterior nostrils) : নাকের সামনে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে সম্মুখ নাসারন্ধ্র বলে। এই নাসারন্ধ্র দুটি সবসময় খোলা থাকে এবং এই পথেই দেহের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করে থাকে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ভেস্টিবিউল (Vestibule): নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভিতরের অংশটির নাম ভেস্টিবিউল। ভেস্টিবিউল দুইটির প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। এই অংশ আর্দ্র ও লোমগুলো ছাঁকনির মতো হওয়ায় গৃহীত বাতাসের ধূলাবালি ও রোগজীবাণুও আটকে যায়।

নাসাগহ্বর (Nasal cavity): ভেস্টিবিউলের পরের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে নাসাগহ্বর। নাসাগহ্বরের প্রাচীরে সূক্ষ্ম ছোট ছোট লোমের মত সিলিয়াযুক্ত, মিউকাস ক্ষরণকারী এবং ঘ্রাণ উদ্দীপক অলফ্যাক্টরী (Olfactory) কোষ থাকে। এটি প্রশ্বাসের সাথে আগত বায়ুকে কিছুটা সিক্ত করে দেয়। সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষগুলো ধুলাবালি এবং রোগজীবাণুও আটকে দেয় এবং অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ অনুভব করার প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

নাসাগলবিল (Nasopharynx): নাসা গহ্বরদুটি পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র নামে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় যেখানে বাতাস বাহিত হয়ে থাকে। নাসা গলবিলের পরে রয়েছে মুখ গলবিল (Oropharynx) যেখানে বাতাস এবং খাদ্য দুটিই বাহিত হয়। ল্যারিঞ্জোফেরিঙ্কস নামে গলবিলের শেষ অংশে খাদ্যনালি ও শ্বাসনালিতে প্রবেশ করার জন্য খাদ্য এবং বাতাস বিভক্ত হয়ে যায়।

স্বরযন্ত্র (Larynx): এটি গলবিলের একেবারে নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকের অংশ। স্বরযন্ত্র কয়েকটি তরুণাস্থি টুকরা দিয়ে গঠিত। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড়ো এবং এটি পুরুষের গলার সামনে উঁচু হয়ে থাকে, হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকেও দেখা যায়, যেটি Adam's Apple নামে পরিচিত। স্বরযন্ত্রে অনেক পেশি যুক্ত থাকে। এর অভ্যন্তরভাগে থাকে মিউকাস আবরণী ও স্বররজ্জু (vocal cord)। টানটান অবস্থায় বাতাসের সাহায্যে স্বররজ্জু কম্পিত হয়ে শব্দ সৃষ্টি করে।

স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে এপিগ্লটিস (epiglottis) নামে ঢাকনার আকৃতির একটি ছোটো তরুণাস্থি। এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয় যেন খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে, যখন এর বিচ্যুতি ঘটে আমরা তখন বিষম খাই। অন্যসময় এটি শ্বসনের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

13.2.2 বায়ু পরিবহণ অঞ্চল (Air transport zone)

শ্বাসনালি (Windpipe/Trachea): স্বরযন্ত্রের পর প্রায় 12 সেমি. দীর্ঘ ও 2 সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নলাকার অংশকে শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া বলে। ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে। এর আন্তঃপ্রাচীরের অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম লোমের মতো সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তুকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

ব্রঙ্কাস (Bronchus): বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়, এদের নাম ব্রঙ্কাস (বহুবচন ব্রঙ্কাই, bronchi)। ডান ব্রঙ্কাসটি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্রঙ্কাস পুনঃপুন বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ব্রঙ্কিওল (bronchiole) নামে অসংখ্য সূক্ষ্ম নালি গঠন করে।

13.2.3 শ্বসন অঞ্চল (Respiratory zone):

ফুসফুস (Lungs):

ফুসফুস সংখ্যায় দুটি এবং এগুলো হালকা গোলাপি রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোটো, এটি দুই লোববিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুস আকারে বড়ো, এটি তিন লোববিশিষ্ট। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের লোব দুটি সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়। এর ভিতরের অংশ পিচ্ছিল। বিভাজিত ব্রঙ্কিওল নালিগুলো ফুসফুসের কার্যকরী একক ক্ষুদ্রকায় লোবিওল (lobule) এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। লোবিওলগুলোর আকৃতি একগুচ্ছ অতিক্ষুদ্র বেলুনের মত যেখানে প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করা অক্সিজেন এবং শরীরে সৃষ্ট হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে থাকে। অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং বর্জ্য হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে বের হয়ে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়।

তোমরা দেখতে পাচ্ছ শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে আমাদের শরীরে শক্তি সৃষ্টি করার জন্য অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা থাকে। মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য শ্বসনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। কাজেই শ্বসনতন্ত্রকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের সবারই সচেষ্ট থাকা দরকার। ধূমপান না করা, বায়ুদূষণ থেকে দূরে থাকা এবং খেলাধুলা ও নিয়মিত ব্যায়াম করে ফুসফুসকে সতেজ রেখে আমরা আমাদের শ্বসনতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে পারি।

13.3 রেচনতন্ত্র (Excretory system)

রেচনতন্ত্র

তোমরা এই অধ্যায়ে ত্বকতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্র সম্পর্কে যখন জেনেছ তখন নিশ্চয় বুঝেছ যে তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য অপসারিত হয়। ত্বকের গ্রন্থি ঘামের মাধ্যমে বর্জ অপসারণে ভূমিকা রাখে। আর ফুসফুসের অন্যতম কাজ হচ্ছে বায়বীয় বর্জ্য হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিস্কাশন করা। তার মানে এই অঙ্গগুলো রেচনতন্ত্রের অংশ। আমার এই অধ্যায়ে দেখব যে কিডনিও শরীরের এক ধরনের বর্জ অপসারণে কাজ করে, তবে এই ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের অঙ্গগুলো একসঙ্গে কাজ করে না, প্রতিটি অঙ্গ অন্য অঙ্গ থেকে কম-বেশি স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করে। আমাদের শরীর থেকে সম্পূর্ণ এবং সফল ভাবে সব ধরণের বর্জ্য সরানোর জন্য সবারই প্রয়োজন।

আমাদের শরীরের সকল অংশের বিভিন্ন ধরনের কোষে অনেক কাজ হয়, এইসব কাজ করতে গিয়ে কোষের ভেতরে নানা ধরনের নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ রক্তে পরিবাহিত হয়, এবং সাধারণত শরীরের জন্য ক্ষতিকর তাই শরীর থেকে বের করে দেয়ার প্রয়োজন হয়। শরীর থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়ার জন্য কিডনি দিয়ে যে রেচনতন্ত্র

গঠিত সেখানে রয়েছে এক জোড়া বৃক্ক বা কিডনি, এক জোড়া রেচন নালি, একটি মূত্রথলি ও একটি মূত্রনালি।

রেচনতন্ত্রের গঠন

বৃক্ক (Kidney) : বুকের পাঁজরের ঠিক নিচে, পেটের পেছনের দিকের অংশে, মেরুদণ্ডের দুপাশে দুটি বৃক্ক বা কিডনি থাকে। আগের শ্রেণিতে পরিপাকতন্ত্র পড়ার সময় তোমরা যকৃতের কথা জেনেছ। যকৃতের আকার বেশ বড়ো, এটি পেটের ভেতর ডানপাশে থাকে বলে আমাদের ডান বৃক্কটি বাম বৃক্কের তুলনায় সামান্য নিচে অবস্থান করে। বৃক্ক যেহেতু এই রেচনতন্ত্রের মূল অঙ্গ তাই নিচে তার গঠন এবং কার্য পদ্ধতি নিচে আরেকটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

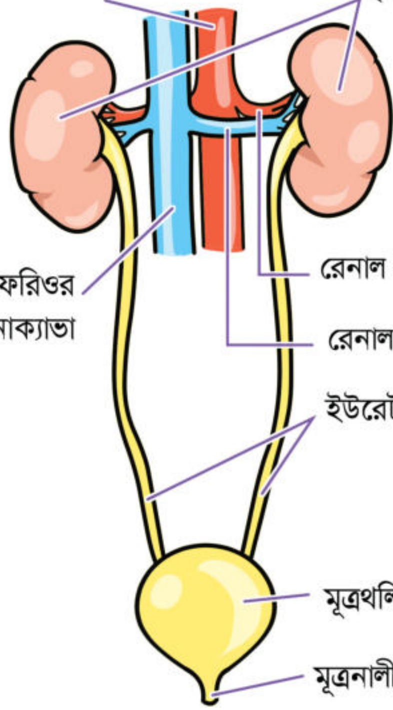

রেচনতন্ত্রের অঙ্গসমূহ

রেচন নালি বা ইউরেটার (Ureter) : যে দুইটি সরু নালি বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে মূত্র পরিবহন করে তাদেরকে রেচন নালি বা ইউরেটার বলে। প্রত্যেকটি রেচন নালি দৈর্ঘ্যে প্রায় 25 সেন্টিমিটার।

মূত্রথলি (Urinary Bladder) : মূত্রথলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং এক ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি একটি ত্রিকোণাকৃতির থলি। এটি প্রয়োজনে সংকোচন কিংবা প্রসারণ করতে পারে। সুবিধাজনক সময়ে নিষ্কাশন করার জন্য সাময়িকভাবে মূত্র জমিয়ে রাখা হচ্ছে মূত্রথলির কাজ। মূত্রথলি প্রায় 700750- মিলিলিটার মূত্র জমা রাখতে পারে।

মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : মূত্রথলি থেকে মূত্র যে নালির ভেতর দিয়ে লিঙ্গের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয় তাকে মূত্রনালি বলে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে এ নালির দৈর্ঘ্য 1819- সেন্টিমিটার। নারীদের দেহে মূত্রনালির দৈর্ঘ্য মাত্র 34- সেন্টিমিটার।

বৃক্ক বা কিডনির গঠন ও কার্যপদ্ধতি :

বাহ্যিক গঠন: প্রতিটি বৃক্ক বা কিডনি নিরেট, চাপা এবং এর বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল অর্থাৎ এটি দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো। তবে এটি শিম বীজের মত ক্ষুদ্রাকায় নয়, পরিণত বৃক্ক বা কিডনির দৈর্ঘ্য 1012- সেন্টিমিটার, প্রস্থ 56- সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্ব প্রায় 3 সেন্টিমিটার। এটি কালচে লাল রঙের। কিডনির অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাম বলে। হাইলামের মধ্য দিয়ে রেনাল ধমনি কিডনিতে প্রবেশ করে এবং রেনাল শিরা ও ইউরেটার দিয়ে বের হয়। পুরো বৃক্ক বা কিডনিটি ক্যাপসুল নামের তন্তুময় যোজক টিস্যু দিয়ে সুদৃঢ় একটি আবরণে ঢাকা থাকে।

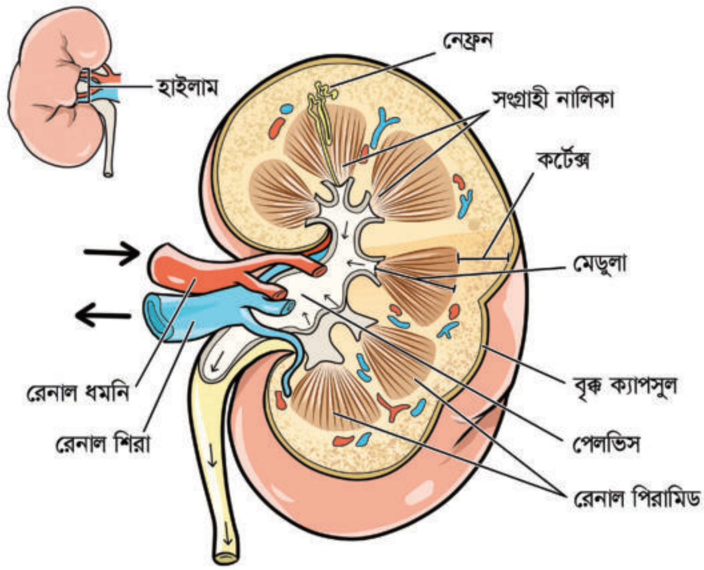

কিডনির গঠন

অন্তর্গঠন: কিডনিকে লম্বচ্ছেদ করা হলে কর্টেক্স, মেডুলা এবং পেলভিস নামে তিনটি অংশ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাইরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত গাঢ় অঞ্চলটি কর্টেক্স। কর্টেক্সের নিচে রয়েছে হালকা লাল রঙের মেডুলা, মেডুলা মূলত 818-টি পিরামিড আকৃতির অংশ নিয়ে গঠিত, এগুলোকে বলে রেনাল পিরামিড। বৃক্কের ভেতরে ইউরেটারের সাদাটে অংশটি উপর দিকে ফানেলের মতো প্রসারিত হয় যেটাকে রেনাল পেলভিস বলে।

বৃক্ক বা কিডনিতে রক্ত পরিশুদ্ধ করার কার্যকর এককটির নাম নেফ্রন (Nephron), প্রতিটি বৃক্ক বা কিডনিতে প্রায় দশ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। রেনাল ধমনি কিডনিতে প্রবেশ করে বারবার বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্ম রক্তনালিকা হিসেবে নেফ্রনের ভেতর প্রবেশ করে। নেফ্রনের ভেতর যে সূক্ষ্ম রক্তজালিকা রক্তকে ছেঁকে তার থেকে বর্জ্য ও তরলকে আলাদা করে সেই অংশটির নাম গ্লমেরুলাস (glomerulus)। রক্ত থেকে পরিস্রুত এই তরল রেনাল টিউব্যুল নামে একটি বৃক্কনালিকার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আর কয়েকবার শোষণ ও নিঃসরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়, পরিশেষে পাশাপাশি থাকা রক্ত নালিকার ভেতরে গ্লুকোজ, খনিজ লবণ, পানি ফিরিয়ে দিয়ে শুধু বর্জ্য পদার্থকে মূত্র হিসেবে অপসারণ করে।

কিডনিতে মূত্র তৈরি হবার পর রেনাল পেলভিস অতিক্রম করে ইউরেটার বা মূত্রনালিতে প্রবাহিত হয়। পেলভিস ও ইউরেটারের প্রাচীরে থাকা সংকোচন ও প্রসারণ করতে সক্ষম অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে মূত্র মূত্রথলির দিকে প্রবাহিত হয়।

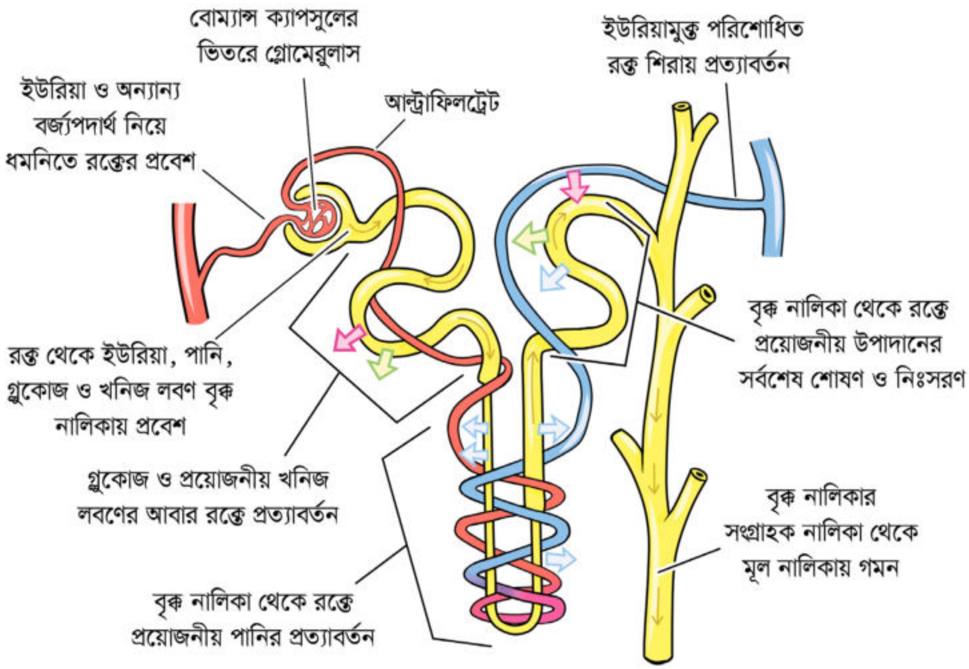

কিডনির রক্ত পরিশোধনের ধাপসমূহ

অন্যদিকে পরিশুদ্ধ রক্ত রেনাল শিরা দিয়ে শরীরে ফিরে যায়। প্রতি মিনিটে কিডনি প্রায় অর্ধেক কাপ রক্ত পরিশুদ্ধ করে, সে হিসেবে সারা দিন শরীরের পুরো রক্ত বেশ অনেকবার কিডনির ভেতর দিয়ে গিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে।

বৃক্ক বা কিডনির কাজ :

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কিডনি আমাদের শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা কিডনির কাজগুলোকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করতে পারি।

- শরীরের বিভিন্ন কোষে প্রোটিন বিপাকের ফলে তৈরি হওয়া নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ অপসারণ করে।
- খাবার ও অন্যান্য মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করা বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয়।
- দেহ এবং রক্তে পানির ভারসাম্য, রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য এবং শরীরে বিভিন্ন আয়নের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমোন এবং এনজাইম বা উৎসেচক ক্ষরণ করে।

রক্তে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন খনিজ উপাদানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

অধ্যায় ১৪

দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের ব্যবহার

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ১৪ দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের ব্যবহার

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ গৃহস্থালির রসায়ন
- ☑ খাবার লবণ, বেকিং পাউডার, ভিনেগার
- ☑ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রসায়ন
- ☑ সাবান ও ডিটারজেন্টের পরিষ্কার করার কৌশল,
- ☑ কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রসায়ন,
- ☑ কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণে রসায়ন,
- ☑ কৃষিদ্রব্য ও খাদ্য সংরক্ষণে রসায়ন
- ☑ শিল্পবর্জ্য ও পরিবেশ দূষণ

তোমরা আগের কয়েকটি অধ্যায়ে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা রসায়নের প্রাথমিক একটি ধারণা পেয়েছ। তোমরা যখন রসায়ন সম্পর্কে আর জানবে তখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর গুরুত্ব দেখে বিস্মিত হবে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, আমরা খাবারকে ঠিক রাখার জন্য ফুড প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করি। অন্যদিকে, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সামগ্রী অনেক সময় খাবারকে অনিরাপদ করে তোলে। এছাড়া নিরাপদ পানীয়, বিভিন্ন পরিষ্কারক প্রসাধন সামগ্রীসহ আরও অনেক কিছুতে রসায়নের অনেক প্রয়োগ রয়েছে। তোমরা জানো যে, মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সার ব্যবহার করে থাকি। এই সারও নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা তৈরি। আবার শিল্প কারখানা থেকে যে সকল বর্জ্য তৈরি হয়, তা অনেক সময় পরিবেশকে দূষিত করে। এই শিল্প বর্জ্যও রাসায়নিক পদার্থ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ভূমিকা রয়েছে। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ কীভাবে প্রস্তুত করা হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার কী এবং সেগুলো আমাদের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে এই অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

14.1 গৃহস্থালির রসায়ন

রসায়ন তোমার দৈনন্দিন জীবনের একটি বড়ো অংশ। যেমন—খাবার, বাতাস, পানি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, পরিষ্কার করার রাসায়নিক এবং যা কিছু আমরা দেখতে বা স্পর্শ করতে পারি, এমন প্রতিটি বস্তুতে রসায়ন বা রসায়নের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা যদি খাবারের কথা বলি তাহলে দেখবে

সেখানেও রসায়নের অনেক বড়ো ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এই অধ্যায়ে খাবার লবণ, বেকিং সোডা ও ভিনেগার এই তিনটি খাদ্য সামগ্রীর রসায়ন নিয়ে আলোচিনা করা হবে।

14.1.1 খাদ্য সামগ্রীর রসায়ন (Food Chemistry)

(ক) খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)

আমরা জানি যে সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে খাবার লবণ (NaCl) থাকে, সঙ্গে খুবই সামান্য পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$), ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$)সহ অন্যান্য কিছু লবণ থাকে। আমাদের দেশে আমরা সমুদ্রের পানি থেকে খাবার লবণ সংগ্রহ করে থাকি। কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সমুদ্র উপকূলের লবণচাষিরা বিভিন্ন আকৃতির জমির চারপাশে বাঁধ তৈরি করে একপাশ খানিকটা খুলে রাখে। সমুদ্রের জোয়ারের সময় যখন পানি ঐ জায়গায় প্রবেশ করে, তখন পানি প্রবেশের মুখ বন্ধ করে জোয়ারের পানি আটকে রাখা হয়। সূর্যের তাপে ঐ জায়গার পানি বাষ্পীভূত হয়ে গেলে লবণ দেখতে পাওয়া যায়। লবণ চাষের মাধ্যমে পাওয়া লবণকে শিল্প কারখানায় পরিশোধিত করে খাওয়ার উপযোগী লবণে পরিণত করা হয়।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন আয়ন, যেমন—সোডিয়াম আয়ন (Na^+), পটাসিয়াম আয়ন (K^+), ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। শরীরে কোনো কারণে সোডিয়াম আয়নের ঘাটতি হলে তখন এই খাবার লবণ তার ঘাটতি পূরণে ভূমিকা রাখে।

সমুদ্র উপকূলে লবণ চাষ

সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) ব্যবহার: সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণের খাদ্য সংক্রান্ত ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানবিধ ব্যবহার রয়েছে। নিচে লবণের কিছু ব্যবহারের কথা বলা হলো :

1) লবণ দীর্ঘদিন ধরে খাবারের স্বাদ বের করে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়।

2) খাবার সংরক্ষণের কাজে লবণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমন—নোনা ইলিশ।

3) রান্না করার সময় পানির তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য লবণ ব্যবহার করা হয়।

4) ডায়রিয়া হলে মানুষের শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি হয়। এই পানিশূন্যতা দূর করার জন্য খাবার স্যালাইন খাওয়ানো হয়। আর খাবার স্যালাইন বানানোর অন্যতম উপাদান হচ্ছে লবণ।

5) শীতপ্রধান দেশে রাস্তায় জমে থাকা বরফ গলিয়ে ফেলার জন্য লবণ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

6) ট্যানারি শিল্পে সংগৃহীত পশুর চামড়া প্রাথমিকভাবে রক্ষা করার জন্য লবণ ব্যবহার করা হয়।

7) লবণ ব্লিচিং, মৃৎপাত্র, সাবান এবং ক্লোরিন উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) যৌগ প্রস্তুত করার জন্য লবণ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, অন্যান্য শিল্প কারখানায়ও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

(খ) বেকিং সোডা

বেকিং সোডা হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ($NaHCO_3$) যা অনেক সময় খাবার সোডা নামে পরিচিত। বেকিং পাউডার বেকিং সোডা থেকে একটু ভিন্ন কারণ তাতে বেকিং সোডার সঙ্গে অল্প পরিমাণ টারটারিক অ্যাসিডের পাউডার মেশানো থাকে।

বেকিং সোডার ব্যবহার: বেকিং সোডার নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। নিচে কিছু ব্যবহার উল্লেখ্য করা হলো:

1) সাধারণত কেক এবং বিস্কিট প্রস্তুত করার সময় বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। বেকিং পাউডারকে যখন পানি এবং ময়দার সাথে মিশানো হয় তখন CO_2 উৎপন্ন হয়, এই CO_2 বুদবুদ তৈরি করে, যার ফলে কেকের মিশ্রণটি ফুলে উঠে বা প্রসারিত হয়। বেকিং পাউডারে থাকা বেকিং সোডা ($NaHCO_3$) টারটারিক অ্যাসিডের ($C_4H_6O_6$) সঙ্গে বিক্রিয়া করে CO_2, এবং H_2O উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো:

$$aHCO_3 + C_4H_6O_6 \longrightarrow C_4H_4Na_2O_6 + 2CO_2 + 2H_2O$$

বেকিং পাউডারের পরিবর্তে বেকিং সোডা ব্যবহার করা হলে কেক ফুলিয়ে তোলার জন্য আলাদাভাবে অ্যাসিড জাতীয় কোনো উপাদান মেশাতে হয়।

2) বেকিং সোডা পেটে অ্যাসিডিটি কমাতে সহায়তা করে। এটি অ্যান্টাসিড হিসেবে কাজ করতে পারে যা পেট খারাপ এবং বদহজমের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

3) পোকার কামড়ের ব্যথা নিরাময়ে বেকিং সোডা ব্যবহার করা যায়।

4) গৃহস্থালি কাজে পরিষ্কার করার জন্য এবং দুর্গন্ধ দূর করার জন্য বেকিং সোডা ব্যবহার করা হয়।

5) বেকিং সোডা কীটনাশক হিসেবেও কাজ করতে পারে।

4) এটি কানের ড্রপ, টুথপেস্ট, মাউথওয়াশ ও শ্যাম্পুতে ব্যবহৃত হয়।

5) সাবানের ফেনা তৈরি করতে পারে বলে এটি অগ্নি-নির্বাপক কাজে ব্যবহৃত হয়।

(গ) ভিনেগার

ভিনেগার হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH)এর একটি জলীয় দ্রবণ। ভিনেগারে 5-10% অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকে। বিভিন্ন ফলের রস থেকে ভিনেগার তৈরি করা হয়, তাই বাজারে নানা ধরনের ভিনেগার পাওয়া যায়। খাদ্য সামগ্রী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং গৃহস্থালি কাজে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়।

ভিনেগারের ব্যবহার:

1। খাদ্য সংরক্ষণে ভিনেগারের ভূমিকা রয়েছে। আচার ঠিক রাখতে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়। যদি আচার তৈরিতে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাতে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারে না। ভিনেগারের অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) যখন আচারে দেওয়া হয়, তখন সেখান থেকে ত্যাগকৃত H^+ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ফলে খাবার দীর্ঘদিন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

2। খাবারের স্বাদ এবং ঘ্রাণ বাড়ানোর কাজে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়।

3। আয়না, কাচ কিংবা টেবিল পরিষ্কার করতে, রান্নাঘর কিংবা বাথরুম দুর্গন্ধমুক্ত করতে এবং গৃহস্থালি কাপড়, কার্পেট কিংবা সোফায় দাগ দূর করতে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়।

4) চুল, ত্বক কিংবা পরিশ্রান্ত পায়ের পাতা সতেজ করতে ভিনেগারের দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

5) বাগানের আগাছা দূর করার জন্যও ভিনেগার ব্যবহার করা যায়।

14.1.2 পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রসায়ন

আমাদের সুস্থ থাকতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই। আমাদের শরীর এবং চারপাশের সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও ভালো থাকে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারক ব্যবহার করে থাকি। আমাদের শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রসাধনী সাবান ব্যবহার করি। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার জন্য কাপড় কাচা সাবান বা সোডা ব্যবহার করি। জীবাণুনাশক

হিসেবে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া 80-95% ইথানল বা আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল করোনাভাইরাসের মতো অতি সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ঘরের জানালার কাচ বা অন্যান্য কাচদ্রব্য পরিষ্কারের কাজে গ্লাস ক্লিনার ব্যবহার করা হয়। টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করা হয়। এগুলো সবই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়, অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য রসায়নের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি সামগ্রী সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

(ক) কাপড় কাচা সোডা

সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) হচ্ছে সোডা অ্যাস, এই সোডা অ্যাসের একটি অণুর সঙ্গে দশ অণু পানি (H_2O) রাসায়নিকভাবে যুক্ত হলে তাকে কাপড় কাচা সোডা বা ওয়াশিং সোডা বলা হয়। সেজন্য কাপড় কাচা সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেট ডেকা হাইড্রেট ($Na_2CO_3.10H_2O$)। কাপড় কাচা সোডা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ দূর করতে, দাগ সরাতে এবং পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয়।

সোডা অ্যাস বা কাপড় কাচা সোডা

(খ) টয়লেট ক্লিনার

টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH)। এর সঙ্গে কিছু পরিমাণ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (NaOCl) মিশ্রিত থাকে। টয়লেট, বেসিন এবং কমোডে চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, বিভিন্ন রঙ জাতীয় জৈব ও অজৈব পদার্থ এবং বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থাকে। বেসিন, কমোড ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য এই টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করা হয়।

টয়লেট ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করার কৌশল: টয়লেট ক্লিনারে বিদ্যমান সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (NaOCl) পানির সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড (HOCl) এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) উৎপন্ন করে।

$$NaOCl + H_2O \quad NaOH + HOCl$$

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষারধর্মী হওয়ার কারণে চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড (HOCl) ভেঙে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ও জায়মান অক্সিজেন [O] উৎপন্ন করে। (তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখে [O] জায়মান অক্সিজেনকে বোঝানো হয়)

$$HOCl + H_2O \quad HCl + [O]$$

এই জায়মান অক্সিজেন রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে এবং জীবাণুকেও ধ্বংস করে। এভাবে টয়লেট ক্লিনার রঙিন জাতীয় পদার্থকে বর্ণহীন করে ও জীবাণু ধংস করে টয়লেট পরিষ্কারে কাজ করে থাকে।

গ) সাবান

সোডিয়াম স্টিয়ারেট বা পটাসিয়াম স্টিয়ারেট হচ্ছে সাবানের রাসায়নিক নাম। সোডিয়াম স্টিয়ারেটের সংকেত $C_{17}H_{35}COONa$ এবং পটাসিয়াম স্টিয়ারেটের সংকেত $C_{17}H_{35}COOK$। তেল বা চর্বির সঙ্গে NaOH বা KOH বিক্রিয়া করে সাবান তৈরি করা হয়। সাবান তৈরির এই প্রক্রিয়াকে সাবানায়ন (saponification) বলে।

ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সাবানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রসাধনী সাবান ও লন্ড্রি সাবান। গোসল করা, হাত-মুখ ধোয়া বা ত্বক পরিষ্কার করার জন্য প্রসাধনী সাবান ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে কাপড় কাচা বা পরিষ্কার করার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করি তাদেরকে কাপড় কাচা সাবান বা লন্ড্রি সাবান বলে।

(ঘ) ডিটারজেন্ট

প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে সাবান তৈরি করা হয়, অন্যদিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে ডিটাজেন্ট তৈরি করা হয়। সোডিয়াম লরাইল সালফেট ($C_{12}H_{25}SO_4Na$) হচ্ছে ডিটারজেন্টের অন্যতম প্রধান

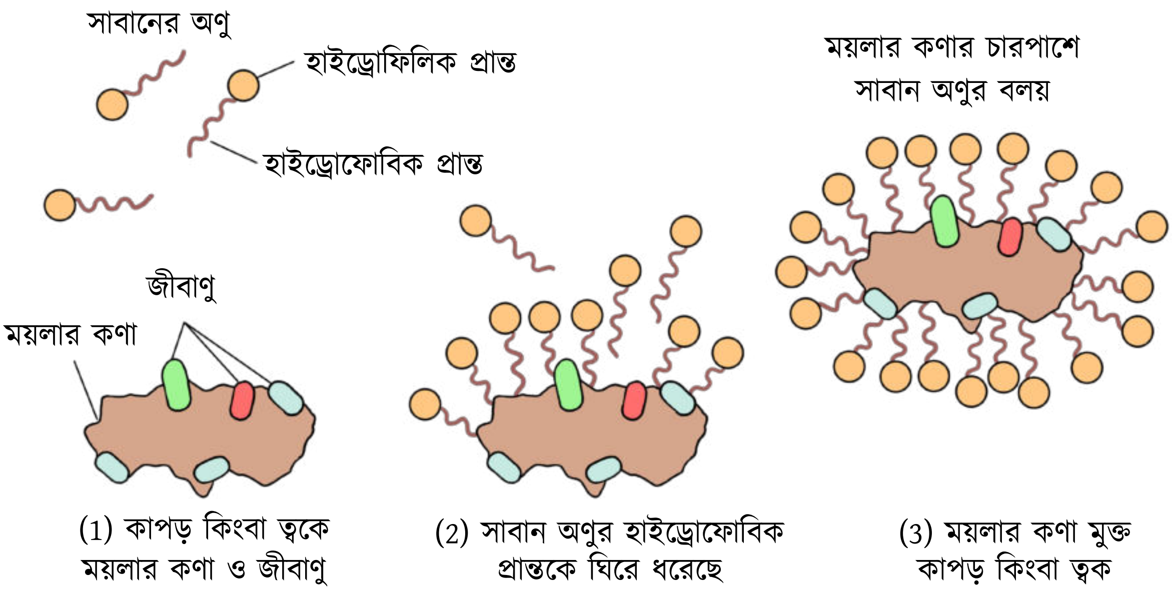

সাবান ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করার কৌশল

রাসায়নিক উপাদান। ডিটারজেন্ট সাবানের মতোই পরিষ্কারক রাসায়নিক দ্রব্য, এটি তরল ও পাউডার দুভাবেই বাজারে পাওয়া যায়। ডিটারজেন্টকে ব্যবহারউপযোগী করার জন্য এতে বিভিন্ন পদার্থ যোগ করা হয়, কাজেই ডিটারজেন্ট পরিষ্কারক হিসেবে অনেক কার্যকর হলেও পরিবেশের প্রতি সাবানের মতো নমনীয় নয়।

সাবান দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করার কৌশল (Cleansing mechanism of soap) : কাপড়ে কিংবা আমাদের ত্বকে যে সমস্ত ময়লা লেগে থাকে অনেক সময়েই তা জৈব জাতীয় পদার্থ এবং পানিতে অদ্রবণীয়। কাজেই শুধু

পানি দিয়ে ধুয়ে এই ময়লা পরিষ্কার করা যায় না। সাবান ($C_{17}H_{35}COONa$) একটি দীর্ঘ কার্বন শিকল বিশিষ্ট অণু। পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় এরা ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট $C_{17}H_{35}COO^-$ আয়ন এবং ধনাত্মক চার্জযুক্ত Na^+ এ ভাগ হয়ে যায়। ঋণাত্মক চার্জযুক্ত প্রান্ত পানিকে আকর্ষণ করে বলে এই প্রান্তকে হাইড্রোফিলিক বা পানিআকর্ষী বলে। ধনাত্মক চার্জযুক্ত অন্য প্রান্ত তেল বা গ্রিজে দ্রবীভূত হয় এবং এই প্রান্তকে হাইড্রোফোবিক বা পানিবিকর্ষী বলা হয়। পানির উপস্থিতিতে সাবান যখন তেল বা গ্রিজ জাতীয় ময়লাযুক্ত কাপড়ের সংস্পর্শে আসে, তখন হাইড্রোফোবিক প্রান্ত তেল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থের দিকে আকর্ষিত হয়ে এতে দ্রবীভূত হয়। অন্যদিকে, হাইড্রোফিলিক প্রান্ত পানির দিকে আকর্ষিত হয় এবং তেলজাতীয় ময়লার কণা সাবান বা ডিটারজেন্টের চার্জযুক্ত আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ময়লার কণার চারপাশে একটি বলয় তৈরি করে। এই অবস্থায় কাপড়কে ধোয়ার উদ্দেশ্যে ঘষা দিলে বা মোচড়ানো হলে ময়লার কণাটি মুক্ত হয়ে সরে আসে। এভাবেই সাবান কিংবা ডিটারজেন্ট কাপড় কিংবা ত্বকের ময়লা অথবা জীবাণু পরিষ্কার করে থাকে।

অতিরিক্ত সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহারে সতর্কতা : সাবান প্রস্তুতের সময় সাবানের মধ্যে কিছু পরিমাণ ক্ষার থেকে যায়। ফলে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করলে হাতের ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। আবার অনেক সময় পুকুর, জলাশয় বা নদীর তীরে সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে সাবান ও ডিটারজেন্ট থেকে নির্গত ফেনা পুকুর, জলাশয় বা নদীর পানিতে মিশে যায়; এই ফেনা পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফলে পানির মধ্যে থাকা জলজ উদ্ভিদ ও মাছ মারা যায়। এভাবেই অতিরিক্ত সাবান ও ডিটারজেন্ট ব্যবহারে পানি দূষিত হয়।

প্রসাধনী ব্যবহারে সতর্কতা : আমরা ত্বক পরিষ্কার রাখতে, ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায়, চুল পরিষ্কার করতে এবং বিভিন্ন কাজে সাবান, শ্যাম্পু, ক্রিম এধরনের প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি। আমাদের ত্বক অম্লীয় প্রকৃতির হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জীবাণুর আক্রমণ বা সংক্রমণ থেকে ত্বক রক্ষা পেয়ে থাকে। প্রসাধনীতে ক্ষারীয় উপাদান বেশি থাকলে তা ত্বকের স্বাভাবিক অম্লত্ব কমিয়ে দিতে পারে, ফলে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে।

(ঙ) ব্লিচিং পাউডার

ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড ($Ca(OCl)_2$)। কাপড়ে বলপেনের কালি বা অন্য কোনো রং লাগলে যা সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলেও পরিষ্কার হয় না, সেক্ষেত্রে ব্লিচিং

পাউডার দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করা যায়। এছাড়া, মেঝে, বেসিন ও অন্যান্য জায়গায় জীবাণু ধ্বংস করার কাজেও ব্লিচিং পাউডার ববহার করা হয়। সুইমিং পুলের পানি জীবাণুমুক্ত করার জন্য কিংবা পানীয় জলকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহৃত হয়।

14.2 কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে রসায়ন

কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে রসায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উভয় ক্ষেত্রেই রসায়ন নতুন নতুন উদ্ভাবন করে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ফসল উৎপাদনে একটি অনেক বড়ো ভূমিকা রেখেছে। এই সার ফসলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং তাদের ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি করে। সারের পাশাপাশি রাসায়নিক কীটনাশক ফসলকে কীটপতঙ্গ, রোগ এবং আগাছা থেকে রক্ষা করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটিকে বিশ্লেষণ করে কোন মাটিতে কোন ফসল ফলানো সম্ভব এবং তার জন্য কোন ধরনের সার কতটুকু প্রয়োগ করতে হবে সে ব্যাপারে কৃষকদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। রসায়নের সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন কৃষিজাত ফসল ও ফলমূল সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় এবং খাবারের রসায়ন দিয়ে কৃষিজাত খাদ্যের পুষ্টিগুণ নির্ণয় করা হয়।

বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানায় নানা ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এই রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য রাসায়নিক শিল্প রসায়নের উপরেই নির্ভর করে। এই শিল্প অন্য শিল্পের জন্য কাঁচামাল, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্লাস্টিক এবং আরও অনেক কিছু উৎপাদন করে থাকে। নতুন পদার্থ উদ্ভাবনে রসায়ন একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে, যেটি বিভিন্ন পলিমার, কম্পোজিট কিংবা ন্যানোম্যাটেরিয়ালের মতো উন্নত পদার্থ বের করে যাচ্ছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তির উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ব্যাটারি, ফুয়েল সেল ইত্যাদির উপর নির্ভরতা অনেক বেড়ে গেছে এবং এই শিল্পগুলো প্রায় এককভাবেই রসায়ন শিল্পের উপর নির্ভর করে। রসায়নের উপর নির্ভরশীল যে শিল্পটির কথা আলাদাভাবে বলা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল বা ওষুধ শিল্প। এই শিল্প মানুষের রোগের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নতুন ওষুধ ও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে যাচ্ছে।

কাজেই এক কথায় বলা যায়, কৃষি এবং শিল্পের বিকাশে রসায়নের অবদানের কোনো তুলনা নেই।

কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্য :

যে প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে কোনো কৃষিজাত দ্রব্য (যেমন—ফলমূল, শাকসবজি, মাছ, ইত্যাদি) দীর্ঘদিন ভালো রাখা যায় বা পচন রোধ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াকে কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ বলে। কৃষিদ্রব্য যাতে দুর্গন্ধ না হয় এবং এগুলোতে যেন পচন না ধরে সেজন্য বরফ, খাবার লবণ, ভিনেগার, ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায় আমরা মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফ ব্যবহার করি, কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণ করি। ঠিক সেরকম টম্যাটো, কাঁচা আম, ইত্যাদি কোনো

পাত্রে দীর্ঘদিন রাখার জন্য ভিনেগার ব্যবহার করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ফরমালিন দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা উচিত নয়। ফরমালিন মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনকি আমাদের শরীরে ফরমালিন প্রবেশ করে মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

ফুড প্রিজারভেটিভ (Food preservative) :

খাদ্যদ্রব্যে অনেক সময় কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশানো হয় যাতে খাবারে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে, খাবার দুর্গন্ধযুক্ত না হয় এবং পচন না ধরে। এই রাসায়নিক দ্রব্যকে ফুড প্রিজারভেটিভ বলে। কিছু ফুড প্রিজারভেটিভ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) কর্তৃক অনুমোদিত। যে সব ফুড প্রিজারভেটিভ আমাদের শরীরে গেলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না এবং যেগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে, তাদেরকে অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ বলে। যেমন, সোডিয়াম বেনজোয়েট, ভিনেগার, লবণের দ্রবণ, ইত্যাদি অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ। অন্যদিকে যেগুলো আমাদের শরীরে গেলে আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, সেগুলোকে অননুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ বলা হয়। যেমন—ফরমালডিহাইড বা ফরমালিন।

15.3 শিল্প বর্জ্য ও পরিবেশ দূষণ:

শিল্প কলকারখানা থেকে নানা ধরনের বর্জ্য নিষ্কাশিত হয়। যদি এই বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রক্রিয়া না করেই সরাসরি পরিবেশে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে সেটি পরিবেশকে দূষিত করে তুলতে পারে।

শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যগুলো কঠিন, তরল বা বায়বীয় তিন ধরনেরই হতে পারে। কঠিন বর্জ্যের মাঝে রয়েছে ধাতব কণা, প্লাস্টিক, কাগজ, পরিত্যক্ত ইলেকট্রিক সার্কিট বোর্ড, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি। তরল বর্জ্যের মাঝে আছে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, ধাতব দ্রবণ, অ্যাসিড, ক্ষার ইত্যাদি। বায়বীয় বর্জ্যের মাঝে আছে বিভিন্ন অ্যাসিড গ্যাস, গ্রিন হাউজ গ্যাস, উদ্বায়ী জৈব পদার্থ, ধুঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি। এ ছাড়াও সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে মেডিক্যাল বর্জ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য কিংবা জৈব বর্জ্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

শিল্প কলকারখানার বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হলে সেটি একটি বিশাল ভৌগোলিক এলাকার মাটি, পানি বা বায়ু দূষণের কারণ হতে পারে। বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে মাটি দূষিত হয়ে গেলে সেটি সেই এলাকার ফসলের উপর প্রভাব ফেলে এবং পর্যায়ক্রমে মানুষের খাবারের ভেতর দিয়ে তাদের দেহে স্থান করে নেয়। পানি দূষণের কারণে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে মানুষ এই দূষণের শিকার হয়। বায়ু দূষণের কারণে সারা পৃথিবীর মানুষ নানারকম

বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ যে শুধু একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, সামগ্রিক ভাবে এটি জলবায়ুর উপরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাজেই শিল্প কলকারখানার বর্জ্য অব্যবস্থাপনার উপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ থাকা খুবই প্রয়োজন। এ জন্য জন সচেতেনতা এবং টেকসই সমাধানের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের দেশে চামড়া শিল্প, রং শিল্প, কীটনাশক শিল্প ইত্যাদি থেকে বর্জ্য হিসেবে, ক্রোমিয়াম (Cr), লেড (Pb), মার্কারি (Hg), ক্যাডমিয়াম (Cd) ইত্যাদি ভারী ধাতু নির্গত হয়। সঠিকভাবে প্রক্রিয়া না করার কারণে অনেক জায়গাতেই এইসব বর্জ্য পদার্থ মাটি এবং পানিতে প্রবেশ করেছে। এইসব মাটিতে চাষাবাদ করলে বা উদ্ভিদের জন্ম হলে সেসব উদ্ভিদেও এইসব ভারী ধাতু প্রবেশ করে। এইসব উদ্ভিদের ফলমূল খেলে আমাদের শরীরেও এইসব ধাতু ঢুকে কিডনি বা লিভারের ক্ষতি করে, এমনকি অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

একইভাবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পলিথিন ও প্লাস্টিক সামগ্রী ফেলে রাখি। এগুলো পুকুর, নদী, বিভিন্ন জলাশয়, এমনকি সমুদ্রের পানিতে মিশে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এইসব ক্ষুদ্র কণাকে মাইক্রোপ্লাস্টিক (microplastic) বলে। পুকুর, নদী, বিভিন্ন জলাশয় এবং সমুদ্রের পানিতে যে সমস্ত মাছ থাকে তাদের মধ্যেও এই মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রবেশ করে। আমরা আবার এই মাছ খাই, ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের শরীরেও প্রবেশ করে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা তৈরি করতে পারে।

কাজেই পরিবেশ দূষণ থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করা এখন আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায় ১৫

নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ

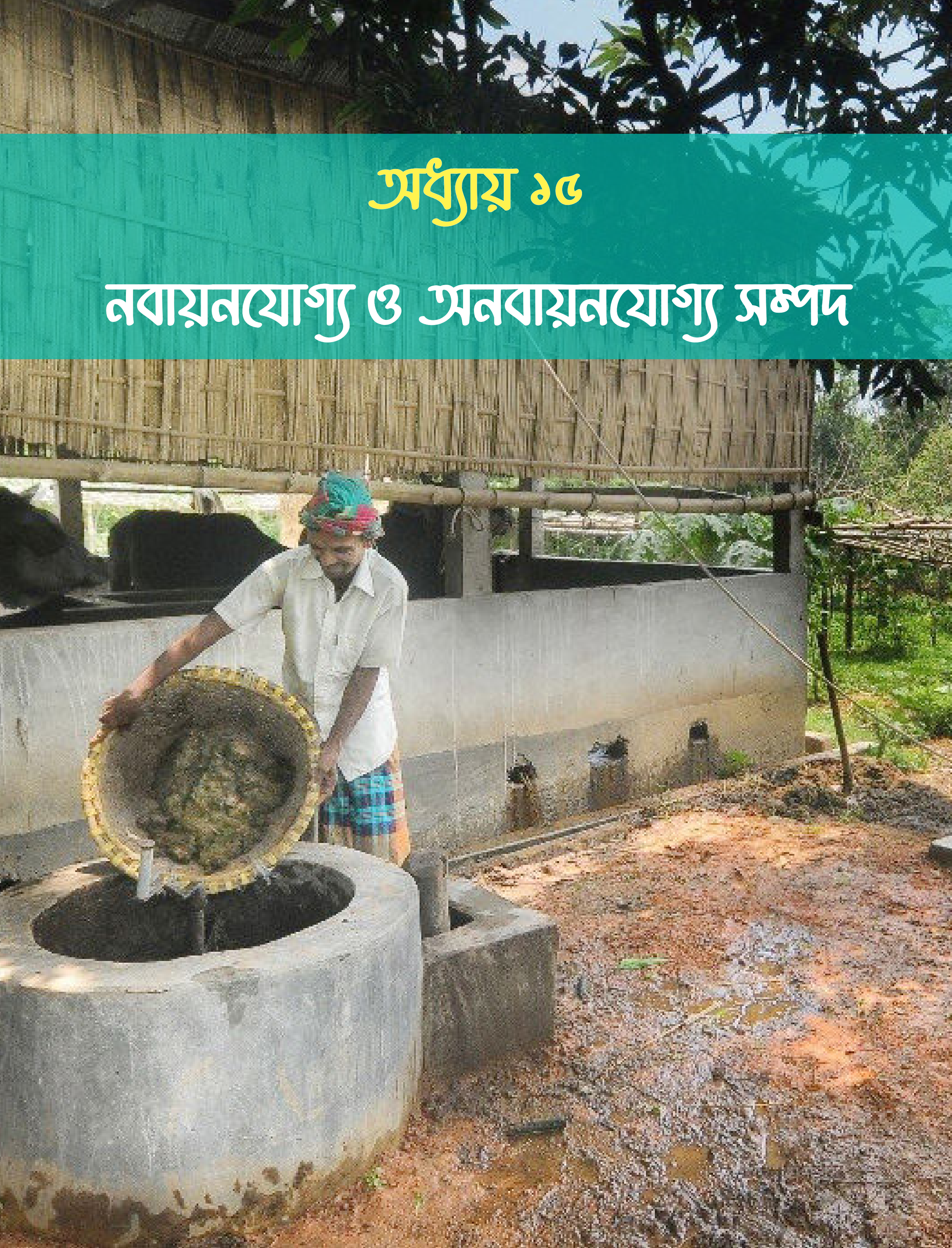

অধ্যায় ১৫ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ সম্পদ
- ☑ সাধারণ ধারণা
- ☑ বিভিন্ন ভিত্তিতে সম্পদের ধরন,
- ☑ নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পার্থক্য;
- ☑ নবায়নযোগ্য ও অনবায়ন যোগ্য সম্পদের সৃষ্টির প্রক্রিয়া, সময়সীমা ও প্রাপ্যতা;
- ☑ সম্পদের উৎস ও ব্যবহারঃ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ
- ☑ পানি ব্যবস্থাপনাঃ ব্যবহারযোগ্য পানির ধরন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার, পানির প্রাপ্যতা

15.1 সম্পদ

সম্পদ বলতে আমরা কী বোঝাই? প্রাণ ধারণ থেকে শুরু করে উন্নত জীবন যাপনের জন্য যা কিছু মানুষের প্রয়োজন তার সবই সম্পদ। সে কারণে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, দক্ষতা-অভিজ্ঞতা সেগুলোও সম্পদ, সেজন্য দক্ষ মানুষকে আমরা মানব সম্পদ বলি। তবে এই অধ্যায়ে আমরা মানব সম্পদ নয়, শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব।

লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর মতো পানি, বায়ু, সূর্যের আলো, মাটি সব আমরা প্রকৃতি থেকে পাই, তাই এই সবই প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা শক্তির উৎস হিসেবে কাঠ, গ্যাস, কয়লা এরকম বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। আবার বিভিন্ন বস্তু তৈরিতেও নানান সম্পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন— বিভিন্ন প্রকার গাড়ির কাঠামো এবং যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করতে যে ধাতু লাগে তা খনি থেকে সংগ্রহ করা আকরিক থেকে নিষ্কাশন করে পাওয়া যায়। গাড়ির চাকা যে রাবার থেকে তৈরি হয় তা আসে রাবার গাছ থেকে সংগ্রহ করা আঠা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে। যে পেন্সিল দিয়ে আমরা লিখি বা আঁকি তার কাঠ আসে সিডার বা পপলার গাছ থেকে। পেন্সিলের শিস তৈরির অন্যতম উপাদান গ্রাফাইট (যা এক ধরনের কার্বন) সংগ্রহ করা হয় খনি থেকে। যে পানিতে আমরা কাপড় পরিষ্কার করি এবং যে সূর্যের আলো ও বাতাসে শুকাতে দেই সেগুলোও সম্পদ। এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ কারণ এগুলোর উৎস প্রাকৃতিক এবং মানুষের জীবনে এগুলোর চাহিদা রয়েছে।

একটি সম্পদ ব্যবহার করে ফেলার পর সেটি আবার প্রাকৃতিকভাবে পূরণ করা যায় কি না সেটি

সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর ভিত্তিতে সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—নবায়নযোগ্য সম্পদ এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদ।

15.2 নবায়নযোগ্য সম্পদ

নবায়নযোগ্য সম্পদ হলো সেইসব সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে পূরণ করা যায় কিংবা মানুষের জীবদ্দশার মাঝেই আবার উৎপাদন করে ফেলা যায়। সেজন্য নবায়নযোগ্য সম্পদকে সব সময় অনবায়নযোগ্য সম্পদের টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

15.2.1 নবায়নযোগ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য

নবায়নযোগ্য সম্পদের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—প্রাচুর্য, পুনরায় উৎপাদনের ক্ষমতা এবং পরিবেশে কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলা।

প্রাচুর্য : নবায়নযোগ্য সম্পদসমূহের প্রাচুর্য রয়েছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যেমন, যতদিন সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করবে ততদিন আমরা সৌরশক্তি পাব, লক্ষ কোটি বছরের মধ্যেও তা শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা : নবায়নযোগ্য সম্পদ অনেক সময় পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। যেমন—কোনো গাছের ডাল ছেঁটে জ্বালানি সংগ্রহ করলে সে গাছে আবার নতুন ডালপালা গজায়। বনও পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা রাখে, বন থেকে সীমিতভাবে সম্পদ সংগ্রহ করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি আবার পূরণ হয়ে যায়। 2007 সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে সুন্দরবনের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে জনগণকে ভেঙে পড়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত গাছ বন থেকে সংগ্রহ থেকে বিরত রাখা হয়। ফলে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় বছরের মাঝে সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলো পুনরায় আগের রূপে ফিরে এসেছিল।

পরিবেশে ন্যূনতম বিরূপ প্রভাব : নবায়নযোগ্য সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেগুলো পরিবেশের উপর খুব কম বিরূপ প্রভাব ফেলে—অনেক সময় কোনো বিরূপ প্রভাবই ফেলে না। যেমন—সূর্যের আলো, তাপ অথবা বায়ুশক্তি ব্যবহার করলে তা পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না।

15.2.2 নবায়নযোগ্য সম্পদের উদাহরণ

পৃথিবীতে নানা ধরনের নবায়নযোগ্য সম্পদ আছে, তার মধ্যে কিছু সম্পদ আমাদের শক্তি চাহিদা পূরণ করে আর কিছু সম্পদ আমাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নবায়নযোগ্য সম্পদের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :

সৌরশক্তি: সূর্যের অভ্যন্তরে ফিউশন নামের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হয়। সূর্য থেকে নির্গত সেই সৌরশক্তি তাপ এবং আলো হিসেবে পৃথিবীতে আসে। তাপের উৎস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌরশক্তির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তোমরা সবাই ফটোভোল্টাইক প্যানেল বা সৌর প্যানেল দিয়ে সূর্যের আলোকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে দেখেছ। বড়ো সোলার কনসেন্ট্রেটর দিয়ে বাষ্প উৎপাদন করে সেগুলোও নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। শীতপ্রধান দেশে পানি গরম করা এবং ঘর গরম রাখার জন্যও সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(ক) সৌর প্যানেল। (খ) স্পেনে অবস্থিত সৌরশক্তি টাওয়ার বা সোলার কনসেনট্রেটর। এখানে বাঁকানো আয়না ব্যবহার করে সূর্যের তাপশক্তি ঘনীভূত করে কাজে লাগানো হয়।

বায়ুশক্তি : প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বায়ুশক্তি ব্যবহার করে এসেছে, কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে নদীতে পালতোলা নৌকা একটি খুবই পরিচিত দৃশ্য ছিল যেগুলো কোনো জ্বালানি বা মানুষের শ্রম ব্যবহার না করে বিপুল পরিমাণ পণ্যকে স্থানান্তর করতে পারত। বাতাসের শক্তি কাজে লাগিয়ে উইন্ড টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। ডেনমার্ক, উরুগুয়ে, চীন, লিথুয়ানিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশ বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে কক্সবাজার এবং কুতুবদিয়ায় বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা শুরু হয়েছে। বায়ুশক্তি থেকে কোনো দূষিত পদার্থ পরিবেশে ছড়ায় না, এজন্য এটি পরিচ্ছন্ন শক্তি। এছাড়াও বায়ুশক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

পালতোলা নৌকা

পানিশক্তি : জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অতিকায় জলাধারের পানির চাপকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে যেটি দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বড়ো ভূমিকা পালন করে। সৌর বা বায়ুশক্তির মতো অসীম সময়ব্যাপী না হলেও একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র অনেক বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

বায়োমাস : বায়োমাস বলতে বিভিন্ন জৈব পদার্থকে বোঝায়। যেমন—হাঁস মুরগির খামারের বর্জ্য, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট, গবাদি পশুর খামারের বর্জ্য, অন্যান্য কৃষিবর্জ্য, কাঠ ইত্যাদি। এসব বর্জ্যের অনেকগুলো পচনের মাধ্যমে এবং কিছু সরাসরি ব্যবহার করে তাপ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহার করে তা থেকে জ্বালানি গ্যাস এবং তার পাশাপাশি উর্বর জৈব সার পাওয়া যায় যেগুলো পরবর্তী সময়ে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা যায়। জৈব সার পরিবেশবান্ধব, রাসায়নিক সারের মতো পরিবেশ দূষণ করে না। মানুষ এবং অন্যান্য পশুপাখি ক্রমাগত জৈব বর্জ্য উৎপাদন করে, তাই বায়োমাসকে নবায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বনাঞ্চল : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণে নানা ধরনের বনের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ এবং জীবজগতের সকল প্রাণীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের একটি বড়ো অংশ এই বনাঞ্চল সরবরাহ করে। মানুষের প্রয়োজনের অনেক বস্তুও বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। যথাযথ নিয়ম মেনে বনজসম্পদ সংগ্রহ করা হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে বন সেগুলো পূরণ করে ফেলে।

ভূতাপীয় শক্তি : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত গভীরে যাওয়া যায় সেখানে তাপমাত্রা তত বেশি হতে থাকে। এই তাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। এটি করার জন্য পাইপ ব্যবহার করে ভূগর্ভে পানি প্রবেশ করানো হয়, সেখানে পানি ভূগর্ভস্থ তাপের কারণে উত্তপ্ত বাষ্পে পরিণত হয়, তখন অন্য আরেকটি পাইপ দিয়ে বাষ্প বের করে এনে সেটি কাজে লাগানো হয়। যে সকল দেশে আগ্নেয়গিরি রয়েছে বা ভূপৃষ্ঠ থেকে স্বল্প গভীরতাতেই তাপ রয়েছে সেসব দেশে ভূতাপীয় শক্তি কাজে লাগানোর ভালো সুযোগ রয়েছে।

নেদারল্যান্ডের একটি গ্রামে ব্যবহৃত উইন্ডমিল বা বায়ুকল

আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ইতালি ইত্যাদি দেশগুলো ভূতাপীয় শক্তি কাজে লাগানোর উপযোগী। আইসল্যান্ডে তাপের চাহিদার 90% ভূতাপীয় শক্তি থেকে সরবরাহ করা করা হয়। ভূতাপীয় শক্তির উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ ঘটে না, তাছাড়া এই শক্তিও প্রায় অসীম।

15.2.3 নবায়নযোগ্য সম্পদের সুবিধা ও অসুবিধা:

নবায়নযোগ্য সম্পদগুলো সাধারণত কম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে, এবং করলেও তা খুবই সামান্য। এর ফলে নবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না। যেহেতু এগুলো প্রাকৃতিকভাবে বা মানুষের প্রযুক্তির সাহায্যে পুনরায় পূরণ করে ফেলা যায় তাই এই সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যতা নিশ্চিত রয়েছে। বিভিন্ন নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করে একটিমাত্র শক্তির উৎসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব। যেমন—যেখানে সৌরশক্তি অথবা পানিশক্তি সহজে পাওয়া যায় সেখানে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজন কম অথবা অনেক ক্ষেত্রে নেই।

আমাজনে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বনভূমি।

তবে নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তি সব সময় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, মেঘলা দিনে অথবা রাতের বেলা সৌরশক্তি পাওয়া যায় না। এজন্য সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করতে হয় কিন্তু বিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যাটারির প্রযুক্তি

যশোরে অবস্থিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টে বায়োগ্যাস, জৈবসার এবং বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

যথেষ্ট জটিল এবং খরচ সাপেক্ষ। এ ছাড়া এখন যে অবকাঠামোগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কাজেই নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারের জন্য নতুন অবকাঠামো তৈরি একটু সময়সাপেক্ষ, এবং এর ব্যবহারও কিছুটা কঠিন এমনকি অনেক সময় সেজন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হয়। নবায়নযোগ্য শক্তি অবকাঠামো বসানোর জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে বেশি, যদিও সময়ের সাথে সাথে সেই খরচ ধীরে ধীরে কমে আসবে। এছাড়া সকল ধরনের নবায়নযোগ্য সম্পদের মাঝে সমন্বয় রাখা জরুরি যেন প্রয়োজনে একটির অভাব আরেকটি পূরণ করতে পারে।

ফিলিপাইনে অবস্থিত ভূতাপীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

15.3 অনবায়নযোগ্য সম্পদ

অনবায়নযোগ্য সম্পদ পরিমাণে সীমিত এবং এগুলো ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছরে গঠিত হয়েছে। একবার ব্যবহৃত হয়ে গেলে সেগুলো মানুষের জীবদ্দশার মাঝে আর পুনরায় পূরণ করা সম্ভব হয় না। অনবায়নযোগ্য সম্পদের মাঝে রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানি, খনিজ পদার্থ, পারমাণবিক জ্বালানি ইত্যাদি। বিভিন্ন মূল্যবান বস্তুও অনবায়নযোগ্য সম্পদের মাঝে পড়ে।

15.3.1 অনবায়নযোগ্য সম্পদের উদাহরণ

নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনবায়নযোগ্য সম্পদের কথা বলা হলো।

জীবাশ্ম জ্বালানি: জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে আমরা কয়লা, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে বুঝিয়ে থাকি এবং এগুলো হলো বৈশ্বিক শক্তির প্রাথমিক উৎস। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ লক্ষ কোটি বছর ধরে মাটি ও পাথরের নিচে চাপা পড়ে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানিতে রূপান্তরিত হয়। এই জীবাশ্ম জ্বালানি গত কয়েক শতাব্দী থেকে শিল্পায়ন ও পরিবহণকে চালিত করেছে। আমরা যে সিএনজি চালিত অটোরিকশায় যাতায়াত করি সেই সিএনজি আসলে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রস্তুত করা হয়। আবার যে বাস বা ট্রেনে আমরা যাতায়াত করি তা মূলত ডিজেলের চলে। যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আমরা বিদ্যুৎ পাই তার অনেকগুলোই কয়লা দিয়ে চালানো হয়। এসবই হচ্ছে অনবায়নযোগ্য।

খনিজ এবং ধাতু: লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু বিভিন্ন ধরনের খনিজ আকরিক থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া সোনা, রুপা, প্লাটিনাম, হীরা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যও খনি থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং এগুলো অনবায়নযোগ্য। এগুলোর মজুদ সীমিত এবং একবার সংগ্রহ হয়ে গেলে তা আর পূরণ করা

যায় না।

পারমাণবিক জ্বালানি: পারমাণবিক জ্বালানি, বিশেষ করে ইউরেনিয়াম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইউরেনিয়ামকে বিভাজন করে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করা হয়, যেগুলো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। তবে এই পারমাণবিক জ্বালানি নিষ্কাশন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কয়েকটি আকরিক (যেমন—পিচব্লেন্ড) থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে।

15.3.2. অনবায়নযোগ্য সম্পদের সুবিধা এবং অসুবিধা

অনবায়নযোগ্য সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এই সম্পদ ব্যবহারের একটি বড়ো সুবিধা হচ্ছে এর বিশাল শক্তি ঘনত্ব, অর্থাৎ অল্প পরিমাণ সম্পদে অনেক শক্তি সঞ্চিত থাকে, এবং সেটি উৎপাদন বা পরিবহণ করা সুবিধাজনক। এছাড়া চলমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে অনবায়নযোগ্য সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহার করা যায়, সে কারণেই বেশির ভাগ সময়ে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

খনি থেকে উত্তোলিত লোহার আকরিক (যা একটি অনবায়নযোগ্য সম্পদ) ইস্পাত তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে অনবায়নযোগ্য সম্পদের নিষ্কাশন, প্রক্রিয়াকরণ এবং দহন পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। পরিবেশের অবক্ষয়, বায়ুদূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে অনবায়নযোগ্য সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের অনেক বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও অনবায়নযোগ্য সম্পদ সীমিত কাজেই তার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এসব সম্পদের অভাব দেখা দিতে পারে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদ উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন সম্ভব তখন নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার এবং অপারগ হলে দায়িত্বশীলভাবে অনবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব।

15.4 সম্পদ ও বর্জ্য

সম্পদ ব্যবহারের একটি বড়ো সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সেগুলো বর্জ্য উৎপাদন করে, তবে সেগুলো মূলত অনবায়নযোগ্য সম্পদ থেকে সৃষ্টি হয়। যেমন কাচবালি থেকে কাচ উৎপন্ন হয় যা থেকে আমাদের

নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু কাচের দ্রব্য ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি একটি অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যে পরিণত হয়। হাইড্রোকার্বন থেকে প্লাস্টিকের বোতল এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করা হয়, কিন্তু তার ব্যবহার শেষ হয়ে গেলে তা বর্জ্যে পরিণত হয়, প্লাস্টিকের পানির বোতল এর উদাহরণ। আবার আমরা যে পুরনো কাগজ, কাপড় ইত্যাদি ফেলে দেই সেগুলোও বর্জ্য। রান্নাঘরে যে আবর্জনা তৈরি হয় সেগুলো পচনশীল, এগুলো দ্রুত ঠিকভাবে সরিয়ে না নিলে পরিবেশকে দূষিত কর।

বর্জ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তবে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে একই সাথে কম সম্পদ ব্যবহার করা যায় এবং বর্জ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলা যায়। এক্ষেত্রে তিনটি R মেনে চলা হয় (RRR)। এই RRR এর অর্থ হলো ব্যবহার কমানো (Reduce), পুনরায় ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার (Reuse) এবং পুনর্ব্যবহার উপযোগী করা (Recycle)। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে আমরা অপচয় রোধ করতে পারি এবং ব্যবহার কমাতে পারি। মূল কাজ শেষ হওয়ার পর কাচ বা প্লাস্টিকের বোতল আমরা অন্য কাজেও ব্যবহার করতে পারি। অপরদিকে কাগজ, ভাঙা কাচ, ধাতু কিংবা প্লাস্টিকের মতো যে সকল বস্তু প্রক্রিয়াজাত করে আবার ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে নতুন করে তৈরি করার জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার বা রিসাইকেল করা যায়।

প্রশ্ন : ইংরেজি RRR-এর অনুরূপ তোমরা কি বাংলা কোনো শব্দ তৈরি করতে পারবে, যেটি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বহন করবে?

15.5 পানি ব্যবস্থাপনা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগই সমুদ্র, তারপরেও পৃথিবীর মোট পানির এক শতাংশেরও কম আমাদের ব্যবহারোপযোগী। এই এক শতাংশ ব্যবহার উপযোগী পানির প্রায় 70% কৃষিকাজে, 20% শিল্পে এবং বাকি 10% গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হয়। পানি একটি নবায়নযোগ্য সম্পদ, কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহার, অপচয় কিংবা দূষিতকরণের কারণে এটি অনবায়নযোগ্য হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীতে এর বিশাল চাহিদার কারণে পানি ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক।

15.5.1 ব্যবহারযোগ্য পানির ধরন

পৃথিবীর পানির 97% রয়েছে সমুদ্রে এবং মহাসমুদ্রে, এই পানি লবণাক্ত। লবণাক্ত পানির তুলনায় মিঠা পানি মাত্র 3%। এই মিঠা পানির মাত্র 1% রয়েছে ভূপৃষ্ঠে নদী, হ্রদ কিংবা জলাশয়ে। বাকিটুকু রয়েছে মাটির নিচে, গ্লেসিয়ারে কিংবা পাহাড়ের বরফ চূড়ায়। মিঠা পানির উৎস, যেমন —নদী, হ্রদ, বিভিন্ন জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ জলরাশিতে লবণের পরিমাণ খুব কম থাকে তাই সেগুলো মানুষের ব্যবহার ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয়। ভূপৃষ্ঠের নিচে সঞ্চিত ভূগর্ভস্থ পানি কৃষি এবং পানীয় জলের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। গভীর ও অগভীর কূপ, নলকূপ ইত্যাদি ভূগর্ভস্থ পানি সংগ্রহ করতে ব্যবহার করা

হয়। নদী, হ্রদ এবং জলাধারের উপরিভাগের পানি সেচ, মৎস্য চাষ, পরিবহন, শিল্প প্রক্রিয়া এবং বিনোদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে সাগরের পানি লবণাক্ত এবং এই লবণাক্ত পানিকে ব্যবহার বা অন্যান্য ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য তা থেকে লবণ অপসারণ করা প্রয়োজন। তবে প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল।

15.5.2 বিভিন্ন ক্ষেত্র বা উদ্দেশ্যে পানির ব্যবহার

কৃষি : কৃষি জমিতে সেচ, পশুপালন এবং মাছ চাষের জন্য পানি অপরিহার্য যেটি আমাদের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে এবং আমাদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে।

ঘরোয়া ব্যবহারঃ পান করা, রান্নার কাজে, পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুস্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য পানি অপরিহার্য।

শিল্প : শিল্পখাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি শীতলীকরণ ব্যবস্থা এবং শক্তি উৎপাদনের জন্য পানির প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

শক্তি উৎপাদন : জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিংবা পারমাণবিক চুল্লিতে শীতলীকরণ ব্যবস্থায় পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র : পানি বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণির আবাসস্থল এবং পরিবেশগত কাজকর্মে সাহায্য করে, পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা নিশ্চিত করে।

15.5.3 পানির প্রাপ্যতা এবং সীমাবদ্ধতা

পৃথিবীর সব জায়গায় পানি সমানভাবে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের উপর দিয়ে শত শত নদী প্রবাহিত হয়ে গেলেও পৃথিবীতে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেটি মরুভূমি এবং যেখানে পানির প্রাপ্যতা খুবই কম। আবার অনেক জায়গায় যথেষ্ট পানি থাকলেও ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমাণ খুব কম। কোনো কোনো এলাকায় পানির সরবরাহ থেকে চাহিদা বেশি হওয়ার কারণে সেখানে পানির ঘাটতি হয়। যখন কোনো এলাকায় পানির চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হয় তখন সেখানে পানি সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয় যার ফলে সেখানকার মানুষ ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব পড়ে। সে কারণে অনেক সময় সামাজিক উত্তেজনা এমনকি রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

কোনো স্থানে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি তোলা হলে সেখানকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। তখন আগের কূপ বা টিউবওয়েল থেকে আর পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপকূলীয় এলাকায় অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি তোলা হলে সমুদ্র থেকে লোনা পানি ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করে সেটিকে লবণাক্ত করে ফেলতে পারে, লবণাক্ত পানি বেশিরভাগ সময় সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত নগরায়ণ পানি সম্পদে চাপ সৃষ্টি করে, এজন্য শহরাঞ্চলে কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনার

প্রয়োজন খুব বেশি।

সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবর্তিত বৃষ্টিপাতের ধরন, বেশি সময়ব্যাপী খরা, এবং পানিচক্রের পরিবর্তন পানির অভাবকে বাড়িয়ে তুলে পানির প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। এটি আমাদের সমাজ জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নতুন চাপ সৃষ্টি করেছে।

15.5.৫ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল

টেকসইভাবে পানি ব্যবহারের জন্য কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পানি সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা পানির অপচয় কমাতে সাহায্য করে। তার জন্য প্রয়োজন একদিকে দক্ষ সেচ ব্যবস্থা, পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি অন্যদিকে জনসচেতনতামূলক প্রচারনা। দূষিত পানিকে পরিশোধনের মাধ্যমে সেগুলো কৃষিকাজ, কলকারখানা এবং পরিবেশগত উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে বিশুদ্ধ পানির উপর চাপ কমানো যেতে পারে। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করলে সেটি পানির একটি অতিরিক্ত উৎস হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে সীমিত পানি সম্পদ আছে এরকম অঞ্চলে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর।

সবশেষে বলা যায়, টেকসই পানি ব্যবহার এবং নিরাপদ পানির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পানির ধরন, ব্যবহার এবং প্রাপ্যতা বিবেচনা করে একটি কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা খুবই প্রয়োজন।

পৃথিবীর পানির 97% রয়েছে সমুদ্রে-মহাসমুদ্রে, 2% গ্লেসিয়ারে, পাহাড়ের বরফ চূড়ায় কিংবা মাটির নিচে বাকি মাত্র 1% রয়েছে নদী, হ্রদ কিংবা জলাশয়ে।

অধ্যায় ১৬

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

অধ্যায় ১৬ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ: সংজ্ঞা, ধরন,
- ☑ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ
- ☑ আকরিক খনিজ সম্পদ
- ☑ জ্বালানি খনিজ সম্পদ
- ☑ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব
- ☑ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা
- ☑ নবায়নযোগ্যতা
- ☑ সম্পদের প্রাপ্যতার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত একটি ছোট ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ ব্যবস্থা এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে এর ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশের উর্বর জমি, নদী, বন এবং খনিজসহ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতার অন্যতম কারণ। দেশটি তার উর্বর কৃষি জমির জন্য পরিচিত, যা এর অধিকাংশ জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের প্রাথমিক উৎস। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং তেলের মতো খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো মাছ, চিংড়ি এবং কাঁকড়াসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক সম্পদের আবাসস্থল, যা দেশের মৎসশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

16.1 বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ হলো সেই সকল উপাদান বা পদার্থ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় এবং যার একটি অর্থনৈতিক মূল্য আছে। বায়ু, পানি, মাটি, খনিজ, বন, বন্যপ্রাণী এবং জীবাশ্ম জ্বালানি এগুলো হলো কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ। এই সম্পদগুলো নবায়নযোগ্য কিংবা অ-নবায়নযোগ্য, দুইই হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীতে জীবনকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং খাদ্য উৎপাদন, শক্তি উৎপাদন এবং শিল্প উৎপাদনের মতো মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানান ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায়, তবে তা সর্বত্র সমানভাবে নেই। কোথাও সম্পদ বেশি পাওয়া যায় আবার কোথাও কম পাওয়া যায়। যেসব অঞ্চলে বা দেশের সম্পদ কম রয়েছে সেখানে সম্পদ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তবে তার অনেকগুলোর পরিমাণ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, কাজেই এগুলো আমাদের হিসাব করে ব্যবহার করতে হবে।

বাংলাদেশের যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন— কৃষিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, ভূমি, পানি প্রভৃতি। কৃষিজ সম্পদ খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। মৎস্য সম্পদ দেশের মানুষের আমিষের চাহিদার বড়ো একটি অংশ পূরণ করে। খনিজ সম্পদ থেকে আমরা জ্বালানি এবং কলকারখানায় বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল পেয়ে থাকি। এই অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ ও পানি সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

16.2 বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিকভাবে এক বা একাধিক উপাদান নিয়ে গঠিত হয়ে অথবা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকেই খনিজ পদার্থ বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন পাথর বা শিলার উপাদানগুলো ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে নানারকম খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থগুলোর মাঝে রয়েছে—প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, আকরিক লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, হীরা, টাংস্টেন, চুনাপাথর, কাচবালি, চীনামাটি, তামা, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হলেও এদেশে বেশ কিছু খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কাচবালি, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, চীনামাটি, নুড়িপাথর, ভারী ধাতুর খনিজ সমৃদ্ধ বালু, ইউরেনিয়াম আকরিক, লোহা ইত্যাদি। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: জ্বালানি সম্পদ এবং আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। এই সম্পদগুলোর ভেতর বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সম্পদ নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

16.2.1 জ্বালানি সম্পদ

বাংলাদেশের খনিতে প্রাপ্ত জ্বালানি সম্পদের মধ্যে রয়েছে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তেল। বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানায় শক্তির উৎস হিসেবে এসব খনিজ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা ও গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

কয়লা : বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়লা প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পিট জাতীয়। এর মাঝে বিটুমিনাস

এবং লিগনাইট হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা যেগুলোর মাঝে জ্বালানি কার্বনের পরিমাণ 60% থেকে 50%। অন্যদিকে পিট ঠিক কয়লা নয় তারপরেও এটি পিট কয়লা নামে পরিচিত, এর মাঝে জ্বালানি কার্বনের পরিমাণ মাত্র 3040%-।

দেশে এ পর্যন্ত মোট কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচটি, এর মাঝে প্রথম আবিষ্কৃত কয়লা খনি হচ্ছে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে। মজুতের ভিত্তিতে সবচেয়ে বড়ো কয়লা খনি হওয়ার পরেও ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক গভীরে হওয়ায় এই খনি থেকে এখনো কয়লা আহরণ শুরু হয়নি। তবে দিনাজপুরের বড়োপুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে প্রচুর কয়লা উৎপাদন করা হয় যার অধিকাংশ বড়োপুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অন্য তিনটি কয়লাক্ষেত্র রয়েছে দিনাজপুরের দিঘিপাড়া ও ফুলবাড়ী এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে। এই কয়লাক্ষেত্র ছাড়াও রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস এবং লিগনাইটজাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর এবং খুলনার বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পিট মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রকৃত কয়লা হতে গাছপালা, গুল্মলতার লক্ষ লক্ষ বছর মাটির নিচে তাপ ও চাপে থাকা প্রয়োজন, সে তুলনায় মাত্র কয়েক হাজার বছরেই সেগুলো পিটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত পিটের রং বাদামি থেকে ঘন বাদামি। বাংলাদেশে পিট ক্ষেত্রগুলো ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছে থাকার কারণে সহজেই আহরণ করা যেতে পারে। সাধারণত ইটের ভাটায়, বয়লার এমনকি অনেক সময় বাসাবাড়িতে পিট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস : বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস, এটি মূলত মিথেন, প্রপেন, বিউটেনসহ অন্যান্য হাইড্রোকার্বন গ্যাসের মিশ্রণ। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট 29টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরও গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মাঝে কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন চলছে, কয়েকটি স্থগিত রয়েছে এবং কয়েকটিতে এখনো গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়নি। বাংলাদেশে গ্যাস উৎপাদনের সক্রিয় গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর, হরিপুর ইত্যাদি। তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশালে অবস্থিত সার কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত উন্নত মানের এবং এতে জলীয় বাষ্প কিংবা অপদ্রব্য খুব কম, মিথেনের পরিমাণ অনেক বেশি (96 - 99%)। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় 71% প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। পাইপলাইন বা সিলিন্ডারের মাধ্যমে যে গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় সেগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস শোধন করে উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

খনিজ তেল : 1986 সালে সিলেটের হরিপুরে দেশের একমাত্র খনিজ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এ তেলক্ষেত্রে তেলের মোট মজুতের প্রায় 60% উত্তোলন করা হয়েছে। 1994 সালের শুরুতে তেলের উৎপাদন কমে আসার পর উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিক উপায়ে মূল্যায়নকার্য পরিচালনার পর আবার পূর্ণমাত্রায় তেল উৎপাদন করা যেতে পারে।

16.2.2 আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ এবং চাহিদার তুলনায় এ দেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এজন্য নানান প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ প্রতিবছর অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হয়। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও বেশ কিছু খনিজ পদার্থ এদেশে পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্যতম হলো— চুনাপাথর, সিলিকা বালু, কঠিন শিলা, নুড়ি পাথর, চীনামাটি ইত্যাদি।

(ক) কঠিন শিলা

(খ) চুনাপাথর

চুনাপাথর : মূলত সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গৃহনির্মাণ কাজে, কাঁচ শিল্পে, ইস্পাত, সাবান, ব্লিচিং পাউডার, কাগজ কিংবা রং তৈরিতে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। দেশের প্রথম চুনাপাথরের খনি 1960 এর দশকের শুরুতে সুনামগঞ্জের টেকেরঘাটে আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া সুনামগঞ্জের লালঘাট ও বাগলিবাজার, সিলেটের জাফলং, জকিগঞ্জ, চরগা, নওগাঁ জেলার জাহানপুর ও পরানগর, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

সিলিকা/ কাচবালি: এটি কাঁচ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়া রং ও বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক তৈরিতে এর ব্যবহার আছে। বাংলাদেশে কাচবালির মজুত উল্লেখযোগ্য। কাচবালি হলো সূক্ষ্ম থেকে মাঝারি আকৃতির কোয়ার্টজ এবং সেগুলো হলুদ থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠের উপরে বা ভূ-পৃষ্ঠের অগভীরে বালিজুরী, শাহজিবাজার ও চৌদ্দগ্রামে এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে মধ্যপাড়ায় ও বড়োপুকুরিয়ায় কাচবালির বড়ো মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে।

কঠিন শিলা/পাথর : ঘরবাড়ি, রাস্তা, রেললাইন, নদীর বাঁধ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণে কঠিন শিলার প্রচুর ব্যবহার হয়। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার রানীপুকুর নামক স্থানে 1966 সালে প্রথম কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর পরবর্তী সময়ে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানে কঠিন শিলার মজুত আবিষ্কার করে। এছাড়া নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেটের

ভোলাগঞ্জ এবং পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় কঠিন শিলা পাওয়া যায়।

চীনামাটি : চীনামাটি মূলত কেয়োলিন নামক কাদা খনিজ দিয়ে গঠিত উন্নতমানের কাদাকে বোঝানো হয়ে থাকে। চীনামাটি মূলত সিরামিক শিল্পে বিভিন্ন তৈজসপত্র, স্যানিটারি জিনিসপত্র, বাসন, বৈদ্যুতিক ইন্স্যুলেটর ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিচে নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার ভুরুংগা ও চট্টগ্রাম জেলার হাইটগাঁও, কাঞ্চপুর, এলাহাবাদ এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় চীনামাটির মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে।

নুড়িপাথর : দেশের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর নুড়িপাথর পাওয়া যায়। এগুলো বর্ষাকালে উজান এলাকা থেকে নদী দ্বারা বাহিত হয়ে আসে। নুড়িপাথর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়।

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বালি : বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদনদী প্রবাহিত হয়েছে যা এ দেশকে নদীমাতৃক দেশ বলার অন্যতম কারণ। দেশের বিভিন্ন নদনদীর তলদেশে (River bed) এ ধরনের বালি পাওয়া যায়। মূলত মাঝারি থেকে মোটা দানার কোয়ার্টজ-এর সমন্বয়ে এই বালি গঠিত। অন্যান্য মনিক বা মিনারেলও এই বালিতে মিশ্রিত থাকে। দালান, রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু এ ধরনের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণকার্যে এই বালির প্রচুর ব্যবহার হয়।

সৈকত বালি ভারী মনিক : বাংলাদেশের উপকূলীয় সৈকত এলাকাগুলোতে এ ধরনের খনিজ পাওয়া যায়। মূলত কক্সবাজার থেকে বদর মোকাম ও মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও মাতারবাড়িতে ভারী মনিকের মজুদ রয়েছে। সূক্ষ্ম জরিপকার্য পরিচালনার ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত বরাবর 17টি স্থানে ভারী মনিকের মজুত লক্ষ করা যায় যেগুলোকে প্লেসার মজুত (Placer deposit) বলা হয়। এগুলোর মাঝে 15টি প্লেসার মজুত কক্সবাজার চট্টগ্রাম সমুদ্রসৈকত ও কাছাকাছি উপকূলীয় দ্বীপসমূহে অবস্থিত। ভারী মনিকের মধ্যে অন্যতম হলো জিরকন, রুটাইল, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট, লিউককসেন, কায়ানাইট ইত্যাদি। এসব ভারী মনিক ঢালাই, তাপরোধী বস্তু ও কাচ তৈরিতে এবং জিরকোনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।

16.3 বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশে বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট ভূমি এলাকা 1 লক্ষ 48 হাজার বর্গকিলোমিটার, যার প্রায় 18% ভূমি জুড়ে রয়েছে বনভূমি। প্রাকৃতিক এবং মানুষের বানানো উভয় বন নিয়ে এই বনগুলো গঠিত এবং এগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাংলাদেশে অবস্থিত এবং এটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। সমুদ্রোপকূলে জোয়ার-ভাটার মাঝে টিকে থাকতে সক্ষম বিশেষ ধরনের গাছ এবং ঝোপঝাড়ের বিশেষ বনভূমিকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। এই বনটি প্রায় 4 হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে, এটি উপকূলকে রক্ষা করে এবং এটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, নোনা জলের কুমির

এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আবাসস্থল। সুন্দরবন ছাড়াও বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, শ্রীমঙ্গল এবং মাধবপুরে উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চল রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। শ্রীমঙ্গল এবং মাধবপুর লেক তাদের চা বাগানের জন্য বিখ্যাত।

বন বিভিন্ন পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বনের গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন মুক্ত করে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বন মাটির ক্ষয়রোধ এবং পানিচক্র বজায় রাখতে সাহায্য করে। বনগুলো অসংখ্য ঔষধি গাছের আবাসস্থল, যা ঐতিহ্যগত বা ভেষজ ঔষধের একটি অপরিহার্য উৎস।

তবে বাংলাদেশের বন সম্পদগুলো বন উজাড়, অবক্ষয় এবং খণ্ডিতকরণসহ বেশ কয়েকটি ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার বন রক্ষা এবং তাদের আওতা বাড়াতে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বনজ সম্পদের সুবিধা বজায় রাখতে হলে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

16.4 পানি সম্পদ

পানি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দেশটি নদী, খাল এবং জলাভূমির একটি ঘন নেটওয়ার্ক বা জালিকা। দেশটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এই তিনটি প্রধান নদীর বদ্বীপে অবস্থিত, যেটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ। এই প্রধান নদীগুলো ছাড়াও 700 টিরও বেশি ছোট নদী এবং উপনদী রয়েছে যা দেশকে অতিক্রম করে। এছাড়া বাংলাদেশের হাওড়াঞ্চলসমূহ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সম্পদের বড়ো উৎস। হাওড়াঞ্চলগুলো মূলত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব জেলাগুলো, যেমন—সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার বড়ো অংশ নিয়ে গঠিত। বৃহত্তর সিলেট জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাওড়গুলো হচ্ছে : শনির হাওড়, হাকালুকি হাওড়, ডাকের হাওড়, মাকার হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি। শীতকালে এসব অঞ্চলে পানি কম থাকে এবং কৃষিকাজ করা হয়। তবে বর্ষাকালে হাওরসমূহ প্রমত্ত রূপ ধারণ করে।

দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরও আমাদের আরেকটি বিশাল পানি সম্পদ। দেশের পানি সম্পদ আমাদের কৃষি, পরিবহণ, সেচ, পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং মাছ ধরা সহ অসংখ্য সুবিধা প্রদান করে। এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের গভীরে তেল-গ্যাসের বড়ো উৎস রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের পানি সম্পদ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নদী ড্রেজিং এবং টেকসই পানি ব্যবহার অনুশীলনের প্রচারসহ পানি ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

16.5 প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব

মানব সভ্যতার টিকে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু সেটি অপরিকল্পিতভাবে এবং

সদ্য আবিষ্কৃত ভোলা গ্যাস ফিল্ড

অবিবেচকের মতো করা হলে পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পরিবেশের উপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলোর মধ্যে একটি হলো বাস্তুতন্ত্র এবং বন্যপ্রাণির বাসস্থানের ধ্বংস। এই ধ্বংস প্রায়ই অপরিবর্তনীয় এবং সেগুলো বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, কাঠ সংগ্রহ এবং কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে বন উজাড় বনভূমির বিশাল এলাকা ধ্বংস করেছে। যার ফলে মাটির ক্ষয় হচ্ছে, বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের ক্ষতি হচ্ছে এবং কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে। বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের ক্ষতি হলে তারা খাবার এবং আশ্রয়ের জন্য অনেক সময়ে মানুষের আবাসস্থলে চলে আসে, তখন এই বন্যপ্রাণির দেহ থেকে রোগের জীবাণু মানুষের দেহে সংক্রমণ হতে পারে। সাম্প্রতিক পৃথিবীব্যাপী করোনাভাইরাসের অতিমারির কারণ হিসেবে এই ধরনের ঘটনাকে সন্দেহ করা হয়।

তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির নিষ্কাশনও পরিবেশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। এসব নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং তার পাশাপাশি বায়ু এবং পানি দূষণ হতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখে, যা পরিবেশ এবং মানব সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

খনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন প্রক্রিয়া পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। খনি খননের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাটি এবং শিলা অপসারণ করতে হয়, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরের সবুজ ঘাসের আবরণ এবং মাটির ক্ষয় হয়। তাছাড়াও খননের ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভারী ধাতু বায়ু এবং জলে নির্গত হতে পারে, যেগুলো পরিবেশ এবং মানব-স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

16.6 প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা

আমরা দেখেছি প্রাকৃতিক সম্পদের ধরন এবং তার প্রাপ্যতার মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। খনি থেকে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় তা প্রায় সবই অনবায়নযোগ্য, যেমন—কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, চুনাপাথর কিংবা চীনামাটি প্রভৃতি খনি থেকে তুললে সেগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এছাড়া অতিরিক্ত খনিজ সম্পদ আহরণ করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব সম্পদের ঘাটতির সম্মুখীন হবে। অতিরিক্ত খনন করা হলে ভূপৃষ্ঠের উর্বর জমি নষ্ট হয়, যার কারণে সেগুলো কৃষিকাজ ছাড়াও অন্য কাজেরও উপযোগিতা হারায়।

যে সকল সম্পদ নবায়নযোগ্য সেগুলো ব্যবহার করা নিরাপদ। এগুলো ব্যবহার করলে অদূর ভবিষ্যতেও সম্পদের ঘাটতি হবে না। যেমন—সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, বায়ু শক্তি এগুলো নবায়নযোগ্য সম্পদ এবং অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ভূগর্ভস্থ পানি, বনভূমি, কৃষিজমির মাটি নবায়নযোগ্য সম্পদ হলেও অতি ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর ঘাটতি হতে পারে। এজন্য যেখানে সম্ভব সেখানে নদী বা খাল-বিলের পানি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বন থেকে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং নতুন গাছ লাগাতে হবে।

এই দেশ এবং এই পৃথিবী আমাদেরই আবাসস্থল। একে বসবাসযোগ্য রাখতে হলে আমাদের অবশ্যই এর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে সবাইকে অবিবেচকের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের বিরূপ প্রভাবগুলোর কথা জানতে হবে এবং পরিবেশের ক্ষতি কম করে এ ধরনের টেকসই অনুশীলনের পক্ষ সমর্থন করতে হবে। যেখানে সম্ভব নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলো ব্যবহার করতে হবে, বর্জ্য উৎপাদন এবং সম্পদের ব্যবহার কমাতে হবে। এভাবে ভবিষ্যতৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষার প্রচেষ্টায় সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ডিজিটাল তথ্য সেবা: টেলিমেডিসিন ও কৃষি কল সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০৮ সালে। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রায় সকল সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে সরকার।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সহজে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮টি হাসপাতালে বর্তমানে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে রোগীগণ বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। মোবাইলের মাধ্যমেও রোগীগণ বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। করোনা মহামারির সময়ে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল কৃষি সেবা- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। কৃষি কল সেন্টারটি খামারবাড়ি, ঢাকাতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন দেশের জনগণ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি বিজ্ঞান | অনুসন্ধানী পাঠ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য